কিন্তু তাই বলিয়া পুনর্বিবাহিনী বিধবাদিগকে অশ্রদ্ধা করা যাইতে পারে না, কারণ তাহারা পুনর্বিবাহী পুরুষের তুল্য; না শ্রদ্ধেয়, না অশ্রদ্ধেয়।

অনেকে অন্তঃর্বিবাহের পোষকতা করিয়া থাকেন, কিন্তু সে পোষকতা কথায়েই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না, হইবার আশাও দূরে। তাই বলি, একেবারে গাছের আগায় উঠিতে যাইও না, প্রথমে স্বজাতিদিগের সমন্বয় সাধন কর, রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রভেদ ঘুচাও, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী মিলাও; বিহারের ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সামঞ্জস্য কর, এইরূপে অগ্রসর হইতে পারিলে প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন হইবে। স্থূল রজ্জুর এক একটী তার না ছেদন করিলে ছিন্ন করা অসাধ্য। যদি এইরূপে সমন্বিত জাতিদিগের বিবাহ চালাইতে পার, তাহা হইলে কল্যাণের সূত্রপাত হইবে।

সমাজ সংস্কার ভিন্ন যে ভারতবর্ষের এক পদও অগ্রসর হইবার জো নাই, ইহা একরূপ দেদীপ্যমান, কারণ স্পষ্টই দেখা যায় যে, সহস্র প্রকার বিভাগে জাতীয় বল বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মহাপুরুষেরা, সামাজিক দুর্গতিই আমাদিগের অধঃপতনের মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য আমি বিবেচনা করি, ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় যাইয়া এ পতিত ও পরাভূত জাতির দুঃখ কাহিনী বিবৃত করা বা বাক্‌শক্তির পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা, সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা দেশহিতৈষিতা।

সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি যে বিবাহ প্রথার উপর সংস্থাপিত, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দিলেই যে সমাজ সংস্কার হয়, ইহা অযৌক্তিক উক্তি। সংসার রক্ষার যে গুরুতর ভার নারীদিগের উপর ন্যস্ত আছে, তাহা থাকাই উচিত, উভয়েই অর্থের চেষ্টায় ফিরিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সুশিক্ষা দেও, শ্রমবিভাগে হস্তক্ষেপ করিও না।

ঋষিরা যে যুক্তিতে বর্ত্তমান অবয়বে সমাজ গড়িয়াছিলেন, সে সকল অবস্থা এক্ষণ বিদ্যমান নাই; তখন ভারতবর্ষ চীনের ন্যায় অন্য জাতির সংস্পর্শের বাহির ছিল। যদি ঋষিরা থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কালকার অন্য শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় পূর্ব্ব বিধির পোষকতা করিতেন না, নূতন ব্যবস্থা চালাইতেন। শাস্ত্রীদিগের চৈতন্য হইবে না, সুতরাং আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

পৃথিবীর সমস্ত সমাজ-নিয়ামকের মধ্যে মহম্মদ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে মানব প্রকৃতি বুঝিতেন। তাঁহার সমাজে গুপ্ত প্রণয় নাই, ভ্রূণ হত্যা নাই, বিবাহে পণ নাই। হিন্দুর গৃহ নানা পাপের আশ্রয়, তাহার পুত্র কন্যা নিশাচর, মুসলমানের গৃহ শান্তির নিকেতন। মহম্মদ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় নারীদিগকে স্বাধীনতা দেন নাই, হিন্দুদিগের ন্যায় খাঁচায় পোরেণ নাই, অথচ সকল সুখের অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে সমাজ এরূপ রমণীয় হইয়াছে যে, নম্রতা ও লজ্জাশীলতায় মুসলমান নারী হিন্দু নারী অপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে, পুরুষেরা সকলেই শান্ত, সুস্থ, ও পরিশ্রমী।

শঙ্করাচার্য্য হিন্দু সমাজকে নানা জাতির সহিত সম্মিলিত করিয়া যে রূপ প্রশস্ত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন,

তাহা এক্ষণ কয়জনে বুঝে? কুক্কুট গোমাংস-ভোজী বিধব বিবাহী, ডাক্তভোর্গপরায়ণ জাতিদিগকে তিনি অদ্বৈধচিত্তে বৈদিক জাতির পক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ত্যাগের বিসময হানি ও গ্রহণের মধুময় সুফল তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন; জনসাধারণের রুচি অনুসারে যে সময়ে সময়ে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করান যায় না। বিলাত-প্রত্যাগত মহাপুরুষদিগের প্রত্যাখ্যান করিয়া যত মূর্খ অকর্ম্মণ্য লোক একদিকে হইতেছে, নিষেধ করিলে শুনিবে না। আজ কালকার পণ্ডিতের মধ্যে যদি, শঙ্করাচার্য্যের একটা অপভ্রংস অবতংসও থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় লইয়া আমাদিগকে আজ বিষম সমস্যায় পড়িতে হইত না। যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ বা স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইতে চায়. তুমি কি তাহাকে পণ্ডিত বলিতে পার? গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, শিক্ষার আদ্যক্ষর, ইহা যে না জানে, সেও পণ্ডিত! ধিক দেশের শিক্ষাকে।

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অপরাজিতা।

কেমনে রাখিব স্মৃতি শিশু বালিকার?
সে যে ছিল এক কনা, শত আগুনের কণা,
হাসি কান্না যত ছিল আগুন তাহার।
আগুন আছিল রূপে, প্রতি রোম কূপে কূপে
এমন আগুনে মেয়ে দেখি নাই আর!
যেখানে রাখিতে চাই, পুড়ে করে ভস্ম ছাই,
করেছে পরাণ মন পুড়ে ছারখার!
কে জানে অপরাজিতা, এমন জ্বলন্ত চিতা
আগুনে মিশিয়ে যাবে আগুন তাহার?
এ দগ্ধ হৃদয ভিন্ন, না রহিবে অন্য চিহ্ন
বৃথা এই ঢালি অশ্রু বৃথা হাহাকার!
কেমনে রাখিব স্মৃতি শিশু বালিকার?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

মৃত্যু আবাহন।

(Walt Whitman এর একটি কবিতার অংশবিশেষ অবলম্বনে)

(১)

আয় রমণীয় মৃত্যু প্রাণের আরাম!
চৌদিক তরঙ্গে ভরি, শান্ত পদে অবতরি,
এস এস, ধরাধামে করগো বিশ্রাম!
একদিন আগে পাছে, যাবিতো সবারি কাছে,
দিনে হোক্, রেতে হোক্, যখন তখন;
আয়রে এখনি তবে কোমল মরণ!

(২)

মরিরে অতুল এই সৃষ্টি চরাচর,
কতই জীবন তায়, কতই আনন্দ হায়,
ফুটিতেছে ছুটিতেছে দেখি নিরন্তর!
অদ্ভুত পদার্থ কত, কত জ্ঞান রাশি
কত প্রেম সুধা মাখা, প্রেম মাখা হাসি!
তাইরে জগৎ তোর গাহিবে মহিমা।
কিন্তু কিবা অবিচল, সর্ব্বব্যাপী সুশীতল,
তব আলিঙ্গন মৃত্যু, ও তব গরিমা!

(৩)

তমোময়ি জগদম্বে, মৃদু পাদক্ষেপে,
ভ্রমিছ সতত কাছে; তবু কেহ নাহি যাচে
তোমার করুণা মৃত্যু; মরিরে আক্ষেপে.
কেহ নাহি গায শুনি; তব শুভ আগমনী;
তাই আজি গাই আমি—কি বর্ণিব আর!
বরণীয়ে এ জগতে তুল্য কে তোমার?

(৪)

আজি আমি দিতেছি এ গীত উপহার;
যখন নিশ্চয় করে, আসিবে আমার ঘরে,
হয় যেন পাদক্ষেপ স্থির দুর্ণিবার!

(৫)

এস কাছে মুক্তিদাত্রি, লও উপহার!
আমি গো সঙ্গীত গাই প্রেমেতে তোমার।
তব কৃপা ধরি শিরে, তব প্রেম সিন্ধুনীরে,
আনন্দে মরণ গীতি গাই অনিবার!

(৬)

তারাময়ী নিশিথিনী নিস্তব্ধে চাহিছে;
নিস্তব্ধ সাগর বেলা, মৃদুল ঊর্ম্মির খেলা;
সকলি নিস্তব্ধ হোয়ে, তোরে নেহারিছে;
কানন, প্রান্তর, নদ, ব্যোম, সিন্ধু, জনপদ,
ছাইয়ে ছাইয়ে গাই মহিমা তোমার;
জয় মৃত্যু তব জয়, তুমি দুর্ণিবার!

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

মায়ের কুটীর।

(১)

আয় তোরা বাছাধন,
দেখিনি যে কতক্ষণ,
ভিজিয়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে,
বেশী না তো এক মুঠো
ধর এই দুটো দুটো,
খাও দেখি সবে মিলি বসি মোর কাছে।

(২)

ধূলা মাখা সোণা গায়
মুছায়ে দি কোলে আয়,
মরি, মরি, কচি মুখ গেছে শুকাইয়া,
আমার কপাল পোড়া,
যত দুখ পেলি তোরা
দুখিনী "মায়ের" পেটে জনম পাইয়া।

(৩)

তিনটী এ শিশু ছেলে,
পতি গিয়াছেন ফেলে,
বাছাদের ভাবনায় পরাণ শুকায়,
অবোধ বোঝেনা কথা,
অভাগী কি পাবে কোথা,
সকালে ভাঙিলে ঘুম আগে খেতে চায়।

(৪)

এমনি বিধির বাদ,
এসব সোণার চাঁদ,
দুবেলা না পায় দুটো উদর ভরিয়া!
এ বুকে যে কত আছে
কব তা কাহার কাছে,
আঁধারে কামনা কত, গেল মিলাইয়া!

(৫)

থাকি এই কুঁড়ে ঘরে
তথাপি বাসনা করে,
ভাল মন্দ দেই কিছু বাছাদের মুখে,
ঘুঁটে ভাঙি কাটি ঘাস
তবুও পরাণে আশ,
সে গেলে খেয়ে মেখে, ওরা থাকে সুখে!

(৬)

হায়!
হেন জন নাই ভবে
মিঠে দুটো কথা কবে,
কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার,
পাড়া প্রতিবাসী হায়,
দেখিলে সরিয়া যায়,
আমি তো করি নি কভু কোন ক্ষতি কার?

(৭)

ধনীর দুয়ারে গেলে,
খেলায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেহে, রুখু রুখু চুল,
ক্ষীর সর যাহা পায়
দেখায়ে দেখায়ে খায়,
আমার বাছারা যবে ক্ষুধায় আকুল!

(৮)

হেরি সে ক্ষুধিত মুখ,
শত বাজে ভাঙ্গে বুক!
জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহীন হায়,
কা'র হায় পৌষ মাস
কা'র হায় সর্ব্বনাশ,
তাহারা আমোদ ভরে ওদের কাঁদায়!

(৯)

আমার তো কত সয়
এ পরাণ লোহা ময়,
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর,
কেন তুমি নারায়ণ,
দিলে মোরে হেন ধন,
এ রাক্ষস-পুরে কেন বাছারা আমার?

(১০)

শত উপবাস করি,
কি বা অনাহারে মরি,
সংসার করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা,
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ
কতই মায়ার টান!—
আমি ম'লে বাছাদের কি হবেরে দশা!
না গো না সকলি স'ব
এই সয়ে বেঁচে র'ব,
শুকাব এ অশ্রু জল ওদেরি হাসিতে;
তোমার চরণে হরি,
এই নিবেদন করি,
নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ মুখে দিতে।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। [৩৭শ]

সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া লোকমুখে ঐ বৃত্তান্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকিলনা যে, মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে ঐসব কথা বলিতেছিল। তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্য্যকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌমের ভগিনী পতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ, মুকুন্দের সহিত পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "বা! তুমি এখানে কবে এলে? প্রভু কোথায়"? মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদের লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোক মুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি জগন্নাথ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। এখন অন্য কথা কহিবার অবসর নাই, শীঘ্র তুমি আমাদের ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখাইয়া দাও।" গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে গেলেন, যাইতে যাইতে পথে মুকুন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত গোপীনাথের পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুকদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয়পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তিন প্রহরকাল পরে গৌর সিংহ হরি নাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্র স্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। খাইতে খাইতে গৌরচন্দ্র আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দাও, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপানা ও ছানাবড়াদি দাও।' সার্ব্বভৌম সেকথা না শুনিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময় অনেক কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। গৌর নিতাইকে বলিলেন, "তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম; জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে রাখি, এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম, তাহার পর কি হইয়াছে, জানিনা।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "সৌভাগ্য ক্রমে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সেখানে ছিলেন, তোমাকে মূৰ্চ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন। তাই তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, আর আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না, গোপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইবনা, বাহিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব।" আচমনান্তে গৌরকে বিশ্রামস্থানে উপবিষ্ট করাইলে সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সহিত নিকটে যাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। "গোসাইর পূর্ব্বাশ্রম কোথায়?" সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন "নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র, ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, নাম বিশ্বম্ভর।" ভট্টাচার্য্য গৌরকে বলিলেন "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাঁহার মান্য ছিলেন, যেসম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না, আপনি জগৎ গুরু, বেদান্তাধ্যাপক, মহা পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কত শিখিবার আছে, আজ হইতে আমি আপনকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম, আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

গৌর উত্তর করিলেন, বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন; কিন্তু জগন্নাথ তো আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকিবে, আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয়, কি খাইব কি অধ্যয়ন করিব? এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে।

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে তুমি সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়, ভয় হয় এরূপ করিলে দাসকে অপরাধী হইতে হয়।"

গৌর বলিলেন, তাতো পারিবেনই। তাহা না করিলে মনে করিব আপনি আমাকে ভাল বাসিতেছেন না।

সার্ব্বভৌম।—তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আজ যে ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্য। কি বিষয়, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলুন।

সার্ব্বভৌম।—সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথা মুড়াইয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ; লাভের মধ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই

অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে! সন্ন্যাসী কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেনা, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগনেরও প্রণাম লইতে ভয় করেনা। যদি বল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায় মহা মহা ভক্তগণও তো সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহারা তো কই অহঙ্কৃত হন নাই। তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা জীবনের শেষ ভাগে গ্রামাবস ভোগ করিয়া ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন। তোমার নবীন যৌবন, এ বয়সে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না, বাস্তবিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া সন্ন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সূত্র ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি।• অহঙ্কার বিনাশের জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ। এখন আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিবার বড় সুবিধা হইবে না। আমার মাতৃস্বসার বাড়ী খুব নির্জ্জন স্থান, সেই খানে তোমাদের বাসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না। তাই তিনি গৌরের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন। তিনি কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কালের গতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত জগন্নাথের শয়োত্থান দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য বেদান্ত পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার ছাত্রবৃন্দ মণ্ডলাকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ; সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তুমি সাবহিত বেদান্ত শ্রবণ কর, আর প্রতিদিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে, আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যহ আসিবে।" শ্রীচৈতন্য অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, আমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; চৈতন্যদেব প্রত্যহ নীরবে বেদান্ত শুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন "সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিলে না, কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি না, জানিতে পারিলাম না।"

গৌর উত্তর করিলেন, আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শুনিতেছি;

আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। সুতরাং আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম বলিলেন "যে বুঝিতে পারে না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত? তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না, কি জানি তোমার মনে কি আছে।"

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া কহিলেন "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যের প্রযোজন; যদি সেই ভাষ্যে সূত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে ভাষ্যের প্রয়োজন কি? আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে।"

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে?" গৌর বলিতে লাগিলেন "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্তু; তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পরি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি, শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্টাতীত হইয়া আছে, তাহারই নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম বাধাদিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা, অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত; মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি লীলা; এই হৃদয়-নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক; সৃষ্টি কল্পনা নহে, তবে তাহা নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি, সৃষ্টি জ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কার কল্পনা, সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকর ভূমি বলিবেন?

সা। কখনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হইল, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, এই কল্পনা জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় কি না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাই না হয় হইল। কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টি লীলা বলিতেছ, কে বলিল, তাহা সত্য"?

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলা রূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈত ভাব ও দ্বৈত্যের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জসীভূত একত্ব। বলুন দেখি, ইহাতে কার না প্রাণমন গলিয়া যায়। এহেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্।

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হই-

লেন, কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন?"

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না, শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়া-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোদ্ধৃত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয় স্তম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রোর্ন তরঙ্গে।"

"হে নাথ! ভেদজ্ঞান অবগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকেনা, তথাচ আমি তোমারই রচিত, তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের কখন সমুদ্র হয় না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্ত পদাদি শূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, নাম রূপ উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণ বিহীন, শুদ্ধ সত্ত্বা চৈতন্য ময়, তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ? তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন। সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যায় বান বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্ট্যাতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব, সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গম্ভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই সব করিতেছে, তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার মূলেই তো বিধাতৃত্ব, "যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাহাতে লয় হইয়া যায়," এই যে ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন লয় যিনি করিতেছেন, তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী, ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার চিন্তা

স্রোত কথন আকৃষ্টই হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া, তাঁহার অন্তরে আর এক চিন্তারাজ্য খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়াই মানিলাম, কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি সকলই তো তাঁহার শক্তি, ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ, এ সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায়না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব; শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ, কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসাগেল, প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইলনা। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্ত্বা নির্ব্বিশেষ, আর এ শক্তি নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটাই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখ-সাধ্য হয়। সূর্য্যের একটী একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র; তেমনি ব্রহ্মের এক একটী শক্তিকে ব্রহ্ম বলা অযৌক্তিক, সে সব শক্তিতে ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তাহাতে তবে কোন্ শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত, সৃষ্টি রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্ম তত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত টুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি যে সৎবস্তু অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন, এই শক্তির নাম সন্ধিনী, ইহাতেই দিকদেশকাল সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত। তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ, এই শক্তিকে সম্বিত শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ব্রহ্মের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ আশ্রিত, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ব্রহ্ম স্বরূপে চির প্রকাশিত। আর জীব শক্তি তটস্থা, উহা কেবল সৃষ্টি কালেই ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিতা হইয়া থাকে, সৃষ্ট্যন্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে মায়া শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্ম রূপকে স্পর্শ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে; এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান, আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব

ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে ইহা অবস্তু নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞান মূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, প্রেমের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, যাঁর চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে কত সুখ-তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যিনি মায়া কল্পনার অতীত, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ ময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ কল্পনার বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ-সাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানে নাই বলিয়া তাহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন, আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে যে ভীষণতর নাস্তিকতায় লইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না, ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই, স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যেমন মণি তেমনি অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্র কর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি সত্ত্বেও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তি জ্ঞান মূলক বিবর্ত্তবাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার বিতণ্ডা করিয়াও গৌরের সূক্ষ্ম যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে,ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ, ভক্তি সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়া দেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদ বাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া গৌর বলিলেন "ভট্টাচার্য্য, বিস্মিত হইও না, ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, আত্মারাম মুণিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীংভক্তিমিত্থংভূত গুণোহরিঃ।"

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী; যাঁহাদের সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোক শুনিয়া বলিলেন," এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বড় বাঞ্ছা, কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন্।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, অপনি মহাপণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন্ শুনি, পরে আমি যা জানি, বলিব।

সার্ব্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্য বলে শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে চৈতন্য প্রভু, "আপনার এ ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে"বলিয়া শ্লোকের একাদশ পদের সহিত আত্মারাম শব্দ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটীও ছুইলেন না। গৌরের ব্যাখ্যার

মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি সিদ্ধসাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান; অন্যের কি কথা। তখন ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বে চৈতন্য প্রভুকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্তুতি করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব তখন ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সার্ব্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং নাম, প্রেম ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়া এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্যস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্যের পদ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি; তর্ক শাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহ পিণ্ডের ন্যায় কঠিন ছিল; তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া গলাইয়া দিলে; তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কি অবস্থা করিলে?" গৌর বলিলেন "তুমি ভক্ত; তোমার সঙ্গ গুণে জগন্নাথ দেব ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।"

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পূজারী প্রদত্ত মালা মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া বসাইলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন; ভট্টাচার্য্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দন্ত ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য না হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন "শুষ্কই হউক, আর পর্য্যুসিতই হউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আনীতই হউক; মহাপ্রসাদ পাইলেই ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, অশ্রুতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন।

তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম; আজ আমার নিকট বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ খাইলে; ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে; আজ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায়া বিদূরিত হইল। না হ'বে কেন? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে গেল, শুদ্ধাভক্তির উদয় হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ত্তনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে

তৃণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নাম সাধন করিতে হইবে, নইলে নাম গুণ স্ফুরিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বুদ্ধি, ধন, জন সম্পদ সকলই প্রভুব চরণে অর্পণ করিয়া নাম সাধন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকের শেষ পদে 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেনঃ—

'তত্তেঽনু কম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ;
হৃদ্ বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে
জীবেতয়ো ভক্তিপদে সদায়ভাক্, ॥

হে প্রভো! তোমার কৃপা কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তি পদে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে কেন?

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন ".ভগবদ্ভক্তি বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয়; দণ্ড স্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পাইয়া লীন হইয়া যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত সেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না। ব্রহ্ম সাযুজ্য তাঁর নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সুতরাং এমন হেয় মুক্তিকে দায়াধিকার করিলে ভক্তের প্রতি অন্যায় করা হয় কিনা?

চৈতন্য বলিলেন, মুক্তি পদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহার অবান্তর অর্থ আছে। মুক্তিপদ, বলিলে স্বয়ং ভগবানকে বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস কর না কেন?

সার্ব্বভৌম। তবু ও পাঠ লইতে পারি না। কারণ উহা দ্ব্যর্থ দোষযুক্ত। মুক্তি শব্দটা শুনিতেই ভক্তের ঘৃণা ও ত্রাস জন্মে। ভক্তি শব্দ বলিলে কেমন আনন্দ হয়।"

চৈতন্য দেব এই কথায় আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্য কৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "লোহাকে স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।" সেই হইতে *উৎকল রাজের অভীষ্ট দেব কাশীমিশ্র* ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন "প্রভুকে দিও"। দুই জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া বাসায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মুকুন্দ দত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জগদানন্দের হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠান্তে বাহিরের ভিতের গায়ে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাহারা ভিত্তির লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন, ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটী এই ঃ—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ;
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে।"
"কালান্নষ্টং ভক্তি যোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই কৃপানিধির আমি শরণাপন্ন হই।

কাল দোষে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারী হইয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় রূপে অধিষ্ঠান করুক্।

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানময়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া যিনি ষড়্‌ভুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব করিলেন; তাঁহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দেখিয়া চৈতন্য দেব বিরক্তি সহকারে কেন ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। পত্র ছিঁড়িয়া ফেলার যদি কিছু অর্থ থাকে ত সে এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র আপনাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করেন। কিন্তু যদি তিনি ঘৃণা করিয়া পত্রই ছিঁড়িয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব কথা।

তাইতে মনে হয়, ষড়্‌ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠিক্ সেই সময়ে সার্ব্বভৌমকৃত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা। পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম শতক রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার; ইহাতে সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ইউরোপীয় মহাদেশ। [১]

(Continent)

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। আমরা তিন জন ভারতবাসী বেলা ১টার সময় রেলযোগে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ডোভারাভিমুখে (Dover) যাত্রা করিলাম। অনেক বিখ্যাত পর্য্যটক বলেন, লণ্ডন ও ডোভারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর্ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, অসমতল শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, উদ্যান ও হরিত বর্ণ তৃণাচ্ছাদিত মখমলের ন্যায় কোমল ও পরিষ্কার ভূমিখণ্ড, এরূপ অবিচ্ছিন্ন একটানা ভাবে আর কোথাও দেখি নাই। নিয়মিত সময়ে ডোভরে পঁহুছিয়া তথায় ৭।৮ ঘণ্টা কাল অব-

স্থিতি করত রাত্রি ১০টার পর প্রণালী (Strait of Dover) পার হইবার জন্য জাহাজে উঠি। ডোভর (Dover) ও ক্যালের (Calais) মধ্যে সমুদ্র ২৫ মাইল মাত্র পরিসর। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত সন্তরক ওয়েব সাহেব (Captain Webb) পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ৪ মিনিটের সময় আরম্ভ করিয়া ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই ১২॥ ক্রোশ সাঁতরাইয়া পার হন।

প্রায় ২ ঘণ্টাকাল জাহাজে কাটাইয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর ক্যালে বন্দরে পঁহুছিলাম। ডোভার হইতে ক্যালে উপস্থিত হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বায়ুতে কত খানি প্রভেদ। ঐ টুকু প্রণালী, দুই প্রতিবেশী জাতিকে বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছে। ধীর শান্ত অবিচলিত ইংরেজ সমাজ হইতে ঝুপ করিয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, শিথিল ভাবাপন্ন, কোলাহলময় ফরাসি রাজ্যে উপনীত হইলে, সহজেই তারতম্য উপলব্ধি হইবার কথা। লাটিন জাতি মাত্রে (পোর্ত্তুগিজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়) অনেকটা আমাদের মত উচ্ছ্বাসাধীন (emotionally effusive)। ডোভরে যেমন চুপচাপ, ক্যালেতে তেমনি হট্টগোল। এমন কি, নবাগত জন বুল পর্য্যন্ত মাটীর গুণে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। আট্‌লাণ্টিক সাগরে ভাসমান এই ক্ষুদ্র দ্বীপ টুকুর যে কি মহিমা, প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝা কঠিন।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, দুই কোণে দুই জন ফরাসি ভদ্রলোক চারি জনের জায়গা জুড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে দুই জন মাত্র ইংরেজ, আর কেহ বুঝিতে না পারে, এই জন্য এক জন ঘুমন্ত ফরাসিকে লক্ষ্য করিয়া অপর ব্যক্তিকে হিন্দিতে বলিলেন, "জারা উনকো তো দেখিয়ে যো কি কোণে মে বয়ঠে হাঁয়।" এই কথায় আমরা তিন জনে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলে, সম্বোধিত সাহেব, আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তখন আমরা পাঁচ জন যে এক দেশের লোক, পরস্পরের মধ্যে এই ভাব সংস্থাপিত হইল। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, তিনি ব্রহ্ম দেশে জঙ্গল বিভাগে চাকরি করেন, অন্য জন ভারতে কাজ করেন; বোধ হইল সিবিলিয়ান, কারণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতি, কেবল ফ্রান্সের হাওয়ায় ও আমাদিগেকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া ওরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে পারিসে (Paris) উপস্থিত হইলাম। মাসাধিক পারিসে বাস করিয়া প্রদর্শনী (Universelle Exposition) ও নগরের যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক দূরে থাকুক, কিয়ৎপরিমাণে বর্ণনা করাও আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, যতটুকু পারি, নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরে স্থানীয় দ্রব্য জাতের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর ফ্রান্সে ১২টী প্রদর্শনীর ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠানের পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী প্রথম একত্রিত হয়। ২৩ বৎসর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবৃহৎ ট্রোকাডেয়ারো গোল ঘর (Trocadero) নির্ম্মাণ সহ আর একটী উচ্চ শ্রেণীর প্রদর্শনীর পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এই মহামহা প্রদর্শনী। বিগত শত বৎসরে ফ্রান্স, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্য জগৎ সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপানে কতদূর উঠিয়াছে, ইহা তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া ১৪ই জুলাই তারিখে অদম্য হৃদ্বলের (moral strength) বিপুল তেজের সহিত পারিসের দুর্ভেদ্য খাশ রাজ কারাগার, ভুবন-বিখ্যাত বাস্তীল (Bastille) ধ্বংস পূর্ব্বক, জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়া, ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন দ্বারা নবজীবন সঞ্চারকারী ফরাসি বিপ্লব যথেচ্ছাচার রাজশক্তির মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করে। সেই চিরস্মরনীয় ঘটনার শত বার্ষিক উৎসব এই সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, এবং তাহার স্মরণ চিহ্ন উহার শিরোভূষণ এই বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ 'লা তুর এফেল' (La Tour Eiffel)। ৬ খণ্ডে বিভক্ত সমগ্র প্রদর্শনী ২২টী ফটক সহ ১৭৩ একর জমি ব্যাপিয়া বিরাজমান, উত্তরাংশে এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভ:—ইহার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উত্তুঙ্গ স্তম্ভহর্ম্ম্যাদির তুলনাই হয় না। নিম্নের তালিকার দ্বারা উহার ভয়নাক উচ্চতা কতক উপলব্ধি হইবে।

পারিসের	এফেল স্তম্ভ	(Eiffel Tower)	৬৫৭	হাত উচ্চ।
আমেরিকার	ওয়াশিংটন স্তম্ভ	(Washington Column)	৩৭০	” ”
জর্ম্মণির	কোলোন গির্জ্জা	(Cologne Cathedral)	৩৪৮	” ”
ফ্রান্সের	রোয়েন গির্জ্জা	(Rouen Cathedral)	৩৩২	” ”
মিসরের	প্রধান পিরামিড	(Great Pyramid)	৩১৯	” ”
জর্ম্মণির	ষ্ট্রাসবর্গ গির্জ্জা	(Strasburgh Cathedral)	৩১০	” ”
রোমের	সেণ্ট পিটর	(St Peter's Church)	২৯০	” ”
লণ্ডনের	সেণ্ট পল গির্জ্জা	(St. Paul's Church)	২৬৯	” ”
পারিসের	ইনভালিড্স	(Invalides)	২৩৩	” ”
দিল্লীর	কুতুব মিনার	(Kutub Minar)	১৫৯	” ”
পারিসের	নটর ডাম গির্জ্জা	(Notre-Dame)	১৫০	” ”
”	পান্থিয়ন	(Pantheon)	১১৬	” ”
কলিকাতার	মনুমেণ্ট	(Ochterlony Monument)	১১০	” ”

পারিসের এফেল স্তম্ভ কুতুব মিনার অপেক্ষা চারিগুণ ও কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা ছয়গুণ উচ্চ, কি ভয়ানক ব্যাপার। ইহার নির্ম্মাণে ১৮২০০০ মণ লৌহ, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড অর্থ, বিপুলমস্তিষ্ক মহাত্মা এফেলের অঙ্কবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারি, এবং কত শত লোকের নিয়ত আড়াই বৎসর কাল-ব্যাপী মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভিত্তিস্থাপন হয়, এবং ১লা মে ১৮৮৯ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়)। ভিন্ন মাপ ও গঠনের ১২ হাজার খণ্ড লৌহ ৭০ লক্ষ ছিদ্রে ২৫ লক্ষ পেরেক দ্বারা জোড়া হইয়াছে। পরস্পরের সহিত ঋজু ও পরিমাণ মত ছিদ্র গুলি করিতে এবং ঠিক উহাদের প্রমাণ পেরেক, স্ক্রুপ গজালাদি গড়িতে যে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর কারিগরি ও হিসাব কিতাব আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অব্যবসায়ী দর্শক সহজে বুঝিতে পারেন

না। তার পর, ঝড় বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া গাঁথিয়া তুলিতে হইয়াছে যে, দশ দিকের যে দিক হইতে তুমুল তুফান আসুক না কেন, কোন অংশে একটুও ধাক্কা না লাগাইয়া কেবলমাত্র গায়ে হাত বুলাইয়া চলিয়া যাইবে। যতগুলি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, এক থোকে বিন্যস্ত করিতে পারিলে মাটী হইতে চূড়ায় গিয়া ঠেকে। সুতরাং সব রকমে সুধীবর এফেল মহাত্মা একটী সুবর্ণ স্তম্ভ খাড়া করিয়াছেন।

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৭৯২ ধাপের গোলসিঁড়ি। অনেকে পদ ব্রজে উঠিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ কলের (lift) দ্বারা উন্নীত হইয়া দুই প্রকার আমোদ সম্ভোগ করিতেছেন। তিন থাকে তিনটী কল, সুতরাং তিনবার তিন স্থানে প্রবেশ ও বাহির হইতে হয়। এত ভিড় যে প্রত্যেক স্থানে দেড়, দুই ঘণ্টা উমেদারী না করিলে কলে প্রবেশ করিতে পাওয়া দুষ্কর।

মাটী হইতে ১২২ হাত উচ্চে ১১০ হাত পরিসরের ৪টী প্রকাণ্ড খিলানের উপর প্রথম তালা * স্থাপিত। প্রথম তালা একখানি গণ্ডগ্রাম বলিলে চলে;—৪টী হোটেল (Restaurant), প্রত্যেকটীতে ৪০০ লোক বসিয়া খাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা। ৪টী বাহিরের খণ্ডে (Gallery) এক হাজার করিয়া লোক বেড়াইতে পারে। দুই হোটেলের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক খণ্ডে ৪০০ লোক ধরে। এই হিসাবে প্রথম তালায় অনায়াসে ৬৪০০ লোকের সমাবেশ হইতে পাবে। এতদ্ভিন্ন মল মূত্র ত্যাগের স্থান, অনেক গুলি দোকান এবং ডাকঘর ও তার আপিস এই থাকে স্থাপিত। এখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম, বিশেষ সন্ধ্যার পর দক্ষিণদিকস্থ নীচেকার ভূমি খণ্ডের ছবির নিকট পরীস্থান পরাস্ত মানে;—নানা বর্ণের মনোহর পুষ্পাদি শোভিত, উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ, সুকোমল তৃনাচ্ছাদিত মাটীতে ঘাসের উপর খুব কাছে কাছে সাজান বৈদ্যুতিক আলোক মালা-পরিবেষ্টিত,নবীন শয্যার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছক-কাটা ভূমি; চারিদিকে বহুবিধ বহু সংখ্যক, প্রকাণ্ড, মধ্যম, ছোট পুত্তল সুরুচি অনুযায়ী স্থাপিত, তন্মধ্যে আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সহচর, সহচরী, সাজ সরঞ্জম সহ রমণীরূপে বিরাজমানা; দীপ্তিমান (chemically illuminated) শ্বেত, পীত, লোহিত, সবুজ নানা রঙ্গের জল প্রস্রবনী বিবিধ প্রকারের ফোয়ারার ক্রীড়া; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শ্বেতকায় নরনারীর নিবিড় জনতা ও সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক প্রভাযুক্ত প্রদর্শনী গৃহাদি; এবং ঠিক সম্মুখে যাদুময় ভূমিখণ্ডের অপর প্রান্তে অত্যল্প দূরে, অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থলে তাড়িত আলোকমালা দ্বারা বিশিষ্টরূপে পরিশোভিত কেন্দ্রস্থগৃহ দোম্‌সান্ত্রাল (Dome Centrale); বিপরীতদিকে ৫।৬ রশি তফাতে অগণ্য আলোকিত নৌকা, ষ্টীমার, ভাসমান বিহার-ভবন, হোটেল ও স্নানাগার এবং সেতু সমূহ বক্ষে করিয়া আঁকাবাঁকা সেইন নদী (La Seine) প্রবাহিত; পরপারে ঠিক সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, প্রদর্শনীর অন্তর্গত,

* ইহার গায়ে চারিদিকে বড় বড় উচ্চ অক্ষরে (নীচে দাঁড়াইয়া বেশ পড়া যায়) ব্রোকা (Broca)), ভলটেয়ার (Voltaire), কুবীর (Cuvier), রোসো (Rousseau) প্রভৃতি (৭২ জন) মহামহোপাধ্যায় ফরাসি পণ্ডিতগণের নাম অঙ্কিত। একটীও রাজা, বাদশাহ, উজীর, আমীরের নাম নাই।

ফোয়ারা ঝরণা ও তাড়িত দীপমালা শোভিত ট্রোকাডেয়ারো, গোলঘর বিশাল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান; — উল্লিখিত সমস্ত দৃশ্য বহু আনুষঙ্গিক (যাহার বর্ণনা এ ক্ষুদ্র কলমে বাহির হইল না) সহ এই ১২২ হাত উচ্চ স্থান হইতে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব, অপার্থিব, অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা "বাক্যে নাহি বলা যায়", স্মরণে প্রাণ পাগল হয়। ফরাসিদিগের সতেজ, সুপরিস্ফুট, সৌন্দর্য্যানুভব বৃত্তি (wonderfully developed æsthetic faculty) ও শোভাপ্রিয়তার বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন, সুন্দর জিনিস মনোহর ভাবে সাজাইয়া দর্শকের চিত্ত হরণ করিতে উঁহারা কেমন পটু। ফরাসি হিসাবে সাজাইবার তারিফের কিঞ্চিৎ পরিচয় জুবেযার মহাশয় (M. Joubert) ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের কলিকাতা প্রদর্শনীতে দিয়া আসিয়াছেন। বিদেশীয়ের ব্যাপারে এক জন সাধারণ সাজ-শিল্পী যেরূপ হাত দেখাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা পাঠক মহোদয় কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বহু বড় বড় শিল্পকুশল বিখ্যাত কারিকর দ্বারা নিজের দেশে নিজেদের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারে কতদূর উচ্চশ্রেণীর নিপুণতা ব্যবহার দ্বারা অনুপম শোভা সম্পাদন করত চূড়ান্ত বাহাদুরী প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের হাতে যেমন তেমন জিনিষ কেবল সাজানের গুণে বিলক্ষণ সৌষ্টব প্রকাশ করে; এখানে ত সবই সুন্দর, আবার যথাসাধ্য সুন্দরভাবে সাজান। যে বন্ধুচয় সহ একত্রে এই মহাব্যাপার পরিদর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দুর্ব্বল লেখনী প্রসূত বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারিবেন, ক্ষমতার অভাব হেতু শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সেই অনুপম লাবণ্যের ভাব হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত রহিয়াছে, বাহিরে দেখাইবার শক্তি নাই; কি করিব? কবি কনগ্রিবের (Congrieve) সঙ্গে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়।

"Hard is the task, and hold the advent'rous flight,
"Of him, who dares in praise of beauty write;
"For when to that high theme our thoughts ascend,
"'Tis to detract, too poorly to commend."

আপশোষ এই যে ভারতের শতাধিক লোকও দেখিতে পাইল না। যাঁহারা ইংলণ্ডে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ যান নাই। হায়! হায়! এ জীবনে আর ওরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব না, এই দুঃখ। আমেরিকানেরা ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে টক্কর দিয়া মহামেলা করিবে, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক পারে ফরাসি বাহার কোথায়, এবং ওরূপ সাজাইবে কে? ফরাসিদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "সংসারে একটীমাত্র পারিস," (Il n'y a qu'un Paris dans le monde) দ্বিতীয় অসম্ভব।

—Qun a vis Paris
A ren vis.

অর্থাৎ যে পারিস দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। ইহা পক্ষপাতের কথা নয়, প্রকৃত পক্ষেই তাই। ইংরেজ ও মার্কিন পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন "Paris is the pleasure garden of the world":— পারিস পৃথিবীর প্রমোদ-কানন *। তাই বলি, আবার যদি কখন ফরাসিরা "এক্স্‌পোজিসিওঁ" দেখায়, তবেই জগতের লোক পুনরায় নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া সুখী হইবে।

* ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বহুদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে পারিসে আমোদ করিতে আসেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স প্রত্যেক বৎসর যান।

প্রথম তালা হইতে আর একটী কলে উঠিয়া দ্বিতীয় তালায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় তালা ২৫০ হাত উচ্চে। এখানেও অনেক গুলি পানাহারের ঘর (refreshment bars) ও ফিগারো (figaro) নামক সচিত্র সংবাদ-পত্রের(Illustrated Newspaper)ছাপাখানা, এবং কতকগুলি দোকান। এই স্থানে ১৫০০ লোকের সহাবস্থানের ব্যবস্থা। এখান হইতে চারি দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিন্তু অস্পষ্ট; নীচেকার দৃশ্য অদ্ভুত, অবর্ণনীয়।

ত্রিতল ৫৭৬ হাত উচ্চে। এখানে ৫০০ লোকের স্থান হয়।* ডাকঘর তার আপিস ও কয়খানি দোকান আছে। এখান হইতে চারি দিকে ৪০ ক্রোশ নজর যায়, কিন্তু নিতান্ত অস্ফুট। ইহার উপর ৮১ হাত উচ্চে চূড়া (campanile)। সেথান পর্য্যন্ত উঠিতে গেলে এফেল সাহেবের অনুমতি লইতে হয়। এই ৮১ হাতের মধ্যে ৪র্থ স্তবকে তাঁহার আপিস ও তিনটী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রকোষ্ঠ (laboratory)। একটী জ্যোতিষের (Astronomy); অপরটী চিকিৎসা শাস্ত্র (Physic) ও আকাশতত্ত্ব (Meteorology); তৃতীয়টী জীবতত্ত্ব (Biology) ও বায়ুবিজ্ঞান (Micrografic study of the air) সম্বন্ধীয়। আকাশ ও বায়ু পরীক্ষার এমন উপযোগী স্থান এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এ যাবত যত উচ্চে প্রক্রিয়াদি হইয়াছে, কোথাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায় নাই; মহোচ্চ পর্ব্বত শিখরেও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সমুদ্ভূত বাষ্প সংস্রব দোষ এড়াইতে পারা যায় না।

চূড়াখণ্ড বা কাম্পনিলের শিরোদেশে ও অভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড তাড়িত দীপ। এই আলোক* ২০ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে ৭ মাইল দূরস্থিত সঁজারমাঁ-অঁ-লা (Saint Germain-en-Laye) নগরের রাজপথে সংবাদপত্র পড়িতে পারা যায়। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর বেশ অন্ধকার হইলে ১৫ মিনিটের জন্য সমস্ত স্তম্ভ রক্তবর্ণ বহ্নি (Bengal Lights) দ্বারা প্রজ্জলিত করা হয়।

সর্ব্বোপরি স্তম্ভ শিখরে ফরাসি সাধারণ তন্ত্রের (Republique Francaise) স্বাধীনতা (Liberte), সাম্য (Egalite), ও ভ্রাতৃভাব (Fraternite) ব্যঞ্জক ত্রিবর্ণ (tricolor) পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান। ইহা লক্ষ্য করিয়া ফরাসি বিজ্ঞান সভার (Academie Francaise) সভ্য কবিবর সলি-প্রুধোম (Sully-Prudhomme) বিজ্ঞান সমিতির ভোজের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক ফরাসির গৌরব বোধ করা উচিত যে, পৃথিবীর সকল দেশের পতাকা অপেক্ষা ফরাসি পতাকা বহু উচ্চে উড্ডীয়মান। ইহা দ্বারা আমাদের শৌর্য্য বীর্য্যের না হউক, অদম্য উচ্চাশার পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই।"

এফেল স্তম্ভ হইতে দেশ সম্বন্ধে চর্ম্ম চক্ষুতে যেমন বহুদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ মানসনয়নে পশ্চাতের শতাব্দিব্যাপী ভূত-তমসাবৃত্ত জ্বলন্ত ব্যাপার সকল দৃষ্ট হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তীল

* সুতরাং উঠন্ত মানুষ ও কর্ম্মচারী পরিচারকাদির সংখ্যা (২০০০) শুদ্ধ একত্রে দশ হাজার লোক শূন্যে বিচরণ করেন। একটী ছোট খাট নগর বলিলেই চলে।

"* It represents the transmuted energy of engines of 500 horse power." Stead.

ধ্বংসের সঙ্গে "৮৯র সাম্যনীতির" (Le-principes de'89) অভ্যুত্থান, জাতীয় সভা (L'assemblee National) সংস্থাপন, সকল মনুষ্যের সমান সত্ব সম্বন্ধীয় বিস্তারিত ঘোষণা (Declaration des droits de C'homme); ১৭৯০ :—সমাজের উচ্চ-নীচ বিভাগ নিরসন (Abolition de la noblesse); ১৭৯১ :—রাজপ্রস্থান ও বন্দীভাবে পুনরাগমন; ১৭৯২ :—দাঁতঁ (Danton), মারা (Marat) ও রোব্‌স্পিয়রের (Robespierre) অভ্যুদয় ও প্রাধান্য, রাজপদের প্রত্যাখ্যান (Abolition de la royante), বিখ্যাত সেপ্টেম্বর হত্যা, ১৩০০ সহস্র নর-বলি; ১৭৯৩ :—সিংহাসনচ্যুত রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচার ও প্রাণদণ্ড, নর-রাক্ষস মারাবধ এবং তৎসঙ্গে অনুপম রূপ যৌবন ও সুমহোচ্চ হৃদয়-বিশিষ্টা মারাহন্তা দেবী কুমারী কর্দের (Charlotte Corday) বিচার ও প্রাণদণ্ড, নিরাশ্রয়া বিধবা রাজ-মহিষীর মেম্বর হেবেয়ার (Nebert) কর্ত্তৃক অপমান, অন্যায় বিচার ও প্রাণদণ্ড, প্রকৃত দেশহিতৈষী প্রধান দ্বাবিংশতি *(Girondins) নিধন, অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না, বিদ্যাবতী, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা সাধ্বী রোলাণ্ড-পত্নীর (Madame Roland) প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও প্রাণদণ্ড; ১৭৯৪ :—ভ্রাতৃ-শোণিতপিপাসু দুরাত্মা হেবেয়ার, দাঁতঁ ও রোবস্পিয়রের ক্রমান্বয়ে প্রাণদণ্ড ও বিপ্লবের বলহ্রাস; ১৭৯৫-৯৭ :—নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি :—১৭৯৮, আলী † বোনাপার্টের মিসর লীলা;—১৮০৪ নেপোলিয়ন সম্রাট; ১৮১২ মস্কো (Moscow) বিভ্রাটের পর সিংহাসনচ্যুতি ও এল্‌বা (Elba) প্রয়াণ; ১৮১৫ :—পুনরাগমন, শত দিবসব্যাপী (The Hundred day) ব্যাপার ও নেপোলিয়ন রবির চির অস্ত; অষ্টাদশ লুইর পুনরাবির্ভাব; ১৮৪৮ :—দ্বিতীয় বিপ্লব ও লুই নেপোলিয়নের অধীনে দ্বিতীয়বার সাধারণ তন্ত্র স্থাপন; ১৮৫২ :—জ্যেষ্ঠতাতের পদানুসরণ দ্বারা ক্রমে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে সিংহাসনাধিকার; ১৮৭০ :—জর্ম্মানদের সহিত যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ; ইহার ৪ দিন পরে তৃতীয় সাধারণ তন্ত্র স্থাপন; ১৮৭০-৭১ :—দুই বারে ৫ মাস ব্যাপী জর্ম্মান সৈন্য কর্ত্তৃক পারিস বেষ্টন (seige) ও অধিবাসীগণের নানা প্রকারে দারুণ অভাব ও ক্লেশ; সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন; মোসিও টিয়ার্সের (M. Thiers) শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া মাক মেহন (Mac Mahon) গাম্বেটাদির (Gambetta) প্রাধান্য ও বর্ত্তমান সময়ের মহাত্মা কার্ণোর (M. Carnot) সভাপতিত্ব;—এই সকল ঘটনা জীবন্তভাবে মানসিক দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আনয়ন করে। বাস্তবিক কলিযুগে বিধাতার বিশেষ বিধান স্বরূপ ফরাসিবিপ্লব তুমুলকাণ্ড যেমন সভ্য জগতের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যাপার, তৎ স্মরণ চিহ্ন অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ, অভ্রভেদী এফেল টাওয়ারও তেমনই তাহার উপযুক্ত।

* ইঁহারা বলিদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের হিতকামনায় প্রফুল্লচিত্তে সমস্বরে গান গাইয়াছিলেন।

† মুসলমানদের প্রীত্যর্থ এই নাম গ্রহণ করা হয়; উহাদের হৃদয়াধিকার উদ্দেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিতেন না।

মহারাজা দলীপসিংহ।

এফেল স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে দৈবসংযোগে বিখ্যাত সোব্রাঁও সুমরক্ষেত্রের সজীব ধ্বংসাবশেষ পঞ্জাবকেশরী প্রবল

পরাক্রান্ত নরপতি রণজিৎ সিংহের পুত্র 'মহারাজা' দলীপসিংহের সহিত পরিচয় হইল। ইঁহাকে প্রদর্শনীর অন্তর্গত করিয়া লওয়া, কোনরূপে অসঙ্গত হয় না। যে প্রদর্শনী বিশ্বসংসারের জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, উদ্ভিদাদি নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার একত্রিত করিয়া বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য উপায়ে পৃথিবীকে বিবিধ জ্ঞান বিতরণ করিতেছে, তাহাতে সিংহাসনচ্যুত শিখরাজকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অস্থৈর্য্য-বিজ্ঞাপক জীবন্ত বিদ্যমান সাক্ষীরূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিলে বিশেষ শিক্ষা লাভেরই কথা। সুতরাং এক্‌জিবিশনের সকল দৃশ্যের মধ্যে ইঁহাকে একটী প্রধান দৃশ্য গণ্য করিতে হয়। ইনিও প্রতিষ্ঠাবধি নিয়মিতরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই নির্দ্দিষ্ট হোটেলের (Spiers and Pond's Grillroom) বারাণ্ডায় সস্ত্রীক বা বন্ধুবান্ধব সহ আরামের সহিত বসিয়া আহারাদি করেন। এটী ইংরেজের হোটেল, এখানে ভারতীয় বাটিকায় (Le pavillon Indien) নিযুক্ত কলিকাতার খানসামা দ্বারা প্রস্তুত পোলাও প্রভৃতি ইচ্ছা করিলে পাওয়া যায়; তাই রোজ এই খানেই আহার করেন। সাক্ষাতের পর দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতোষ করত থিয়েটারে লইয়া যান। আরও কয়দিন দেখা হয়, এবং এক দিন বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি; সেই দিন ভারতেশ্বরীর নিকট পত্র এবং শিখদিগের প্রতি ঘোষণাপত্রের (manifesto) মুদ্রিত নকল ও তাঁহার হীরামাণিকমুক্তাশোভিত রাজবেশের ফটোগ্রাফ দেন। প্রথম স্ত্রীর বিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন; ইনিও ইংরেজ মহিলা। 'মহারাণী'র কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, উঁহার মত নয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডে ফিরিতে পরামর্শ দেওয়ায় দলীপসিংহ বলিলেন "আল্‌জিয়র্স (Algiers) দেশে এক পয়সার একখানা রুটি খাইয়া অজ্ঞাতবাসে দিন যাপন করিব, তবু ইংরেজের অর্থ আর গ্রহণ করিব না।" এ সকল বাতুলের কথা, এরূপ "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া", দারুণ পাগলামি বই কি? তাঁহার পঞ্জাব পুনঃ প্রাপ্তির প্রয়াস, "মুণ্ডমালার দন্তবিকাশ, খেলারামের ভারত উদ্ধার," বামনের চাঁদে হাত দিবার প্রয়াস মাত্র। এরূপ জাগন্ত স্বপ্ন যেন কোন মানুষকে আচ্ছন্ন না করে। পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বে গেলেও বর্ত্তমান রাজদণ্ড টলিবার নয়। নিজেও বলিলেন, রুশিয়া, ফ্রান্স তাঁহাকে কণিকামাত্র আশা ভরসা দেওয়া দূরে থাকুক, ইঙ্গিতে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের পরম মঙ্গল হেতু বিধাতার বিশেষ বিধানে জন বুল ভারত অধিকার করিয়াছে, এবং এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ভোগ করিবে। বিধিলিপি মনুষ্য কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারে! পাঠক মহোদয়, ভাবিয়া দেখুন, ভারতীয় রাজার অধীন হইয়া পুনরায় দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চাদ্গমনাপেক্ষা ভীষণতর নরকভোগ আমাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে! চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি রণজিৎ পুত্রের পক্ষে যৎসামান্য হইতে পারে, কিন্তু যখন এই ৩৭।৩৮ বৎসর কাল উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাটাইয়াছেন, এখন আপত্তি করিলে ফল কি? উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ত তাঁহার অনুগামী হয় নাই; মাতৃহীন কন্যা দুইটী অল্প বয়স্কা, অবলা,

কাজেই পিতার সঙ্গে রহিয়াছে। মহারাজের বাল্যকালের অভিভাবিকা সহৃদয়া উচ্চমনা লেডি লোগিন (Lady Login) বলেন, তাঁহার প্রতি ন্যায় ব্যবহার হয় নাই, এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত। আমরাও কোমল হৃদয়া দয়াবতীর সঙ্গে সন্তপ্ত; কিন্তু উপায় কি? তাঁহার বর্ত্তমান উদ্যোগের সহিত সহানুভূতি কেহই প্রকাশ করেন না; আমরাও উহাকে সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলি। যে শাসন প্রণালীতে "রাজার মা" বাস্তবিকই "ভিক্ষা মাগে",—স্বয়ং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীকে পুত্র পৌত্রের ভরণ পোষণের জন্য "Honorable Guardians of the National purse" "জাতীয় ধনভাণ্ডারের মান্যবর অভিভাবক গণ সমীপেষু" বলিয়া কমন্স সভায় আবেদন করিতে হয়, এবং বহু ওজর আপত্তি তর্ক বিতর্কের পরে অতি কষ্টে প্রার্থনা খণ্ডিত ভাবে (conditionally) গ্রাহ্য, সেখানে আমাদের বাতীল 'মহারাজের' তামাদী দাবী কি আশা করিতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। দশ জনের পেট কাটিয়া এক জনের ভুঁড়ি পূরণ, আর অধিক দিন চলিতে পারে না। "Laborare est orare" (শ্রমই পূজা) মহামন্ত্রে সংসারের আপাদমস্তক সকলের দীক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

যাহা হউক, মহারাজের নিকট একটা বিশেষ বিষয়ের পরিচয় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি। ১২ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের রত্নসিংহাসন হইতে নামিয়া ইংলণ্ডের স্কুল ছাত্র হন; এখন বয়স ৫০।৫১; এ যাবতকাল প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের সংসর্গে বরাবর ইংরেজ মহলেই ফিরিয়াছেন; সুতরাং মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অবকাশ খুব কম পাইয়াছেন; অথচ পরিষ্কার হিন্দীতে কথা কহেন, এমন কি "ফলান ঢেকান" পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই। আর আমাদের দেশীয় ভ্রাতারা তিন দিন তামসের জল খাইয়া মাতৃভাষা সম্বন্ধে একেবারে তমসাচ্ছন্ন হন। বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার কথা। স্বদেশ ও মাতৃভাষা সহজে ভুলিবার সামগ্রী নয়। যিনি সহজে এই দুইটি বিস্মৃত হন, তাঁহাকে ঘোর বিকারগ্রস্ত জানিতে হইবে। [ক্রমশঃ]

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

আজ কারে মনে হয়?

(১)

আজ কারে মনে হয়?
মেঘে মাথা দশ দিশি, ভেদ নাই দিবানিশি
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময়!
আজ কারে মনে হয়?

(২)

চপলা চমকে ঘন,
ঘন ঘন গরজন,
কে জানে আমার কেন আঁখি জলময়!
আজ কারে মনে হয়?

(৩)
ভিজিতেছে তরুলতা,
কাঁপিতেছে ফুল পাতা,
নীরব নিঝুম এই উপবনময়!
আজ কারে মনে হয়?

(৪)
পিছনে ধানের খেত;
বেঙ্ ডাকে গেঁত্ গেঁত্,
ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময়!
আজ কারে মনে হয়?

(৫)
সমুখে পুকুরে জল,
কুমুদ কহ্লার দল,
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত কুবলয়!
আজ কারে মনে হয়?

(৬)
বাগানের এক পাশে,
কেতকী কুসুম হাসে,
ভাদরে বিদেশী যেন বিদরে হৃদয়!
আজ কারে মনে হয়?

(৭)
'মেউয়া' ডাকে 'পিপী' ডাকে,
বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিক্‌বালা পরিয়াছে রজত বলয়!
আজ কারে মনে হয়?

(৮)
একটু দেখিনা আলো,
আকাশ তরল কালো,
অনন্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয়!
আজ কারে মনে হয়?

(৯)
ভিজা বুক ভিজা মন,
ভিজে গেছে দু'নয়ন,
সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ ভিজা সমুদয়!
আজ কারে মনে হয়?

(১০)
পরবাসে—বনবাসে,
এ ভরা ভাদর মাসে,
কে থাকে বরষা দিনে একা এ সময়?
আজ কারে মনে হয়?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

সুখ ও দুঃখ।

পৃথিবীর যে দিকে চাই, সে দিকেই আমরা দুইটী অবস্থা দেখিতে পাই। চঞ্চল পৃথিবীর পরিবর্ত্তন নিয়তই চলিতেছে;—এক দিকে ভাঙ্গিতেছে, আর একদিকে গড়িতেছে। সমুদ্র মধ্য হইতে দৈবাৎ পর্ব্বত উৎপন্ন হইতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ ফল পুষ্প সমন্বিত ভূমিখণ্ড জলগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যখন গোধূলিকালে আকাশের দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করি, তখন একটীর পর একটী করিয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত কত প্রকার সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই। সে সকল কবিরাও বর্ণনা করিতে পরাস্ত হইয়া যান। আবার যখন সেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর ঘনঘটায় পূর্ণ হয়; সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ সকল ক্রীড়া করিতে থাকে এবং প্রবল বেগে বহিয়া উহাদের মধ্যে ভীষণ রূপ

আনয়ন করে, তখন সেই সকল পরিবর্ত্তন কি বিস্ময়কর বোধ হয়! বাহ্য প্রকৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমরা এই সকল পরিবর্ত্তনে কখন সুখ, কখন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। এই সুখ দুঃখ মনুষ্যের শিক্ষা ও মনের গঠনের ইতর বিশেষের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সাধারণত লোকে আলোক ও সুন্দর দৃশ্য হইতে সুখ পাইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্যেরা অন্ধকার ও পৃথিবীর ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া এক প্রকার সুখ সম্ভোগ করেন। সুখের অর্থ অমিশ্র সুখ নহে, কেননা পৃথিবীতে তাহা মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটেনা। অবস্থা বিশেষে এক জনের সুখ আর এক জনের দুঃখে এবং এক জনের দুঃখ অন্য জনের সুখে পরিণত হয়। দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রণার অংশ অল্প হইলেই আমরা সুখের অবস্থা বলি। সন্তোষকর সুখপ্রদ সামগ্রী সঞ্চয় ও অসন্তোষকর দুঃখজনক সামগ্রী দূরীকরণে মনুষ্য সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছে। আমাদের মনোমধ্যে সুখ-দুঃখ-বোধ নামে যে দুইটী বৃত্তি আছে তাহার একটী অর্থাৎ সুখ-বোধ বৃত্তিকে আমরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং দুঃখ-বোধ বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে এবং উহার উত্তেজক পদার্থ অপসারিত করিতে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকি।

সুখ দুঃখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, —শারিরীক ও মানসিক, কতকগুলি নিবার্য্য, কতকগুলি অনিবার্য্য। কতকগুলি আমরা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া থাকি; কতকগুলি আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম বলিলেই হয়, কেন না, সেই সকল ভিন্ন আমাদের জীবন রক্ষা কখন সম্ভবে না। মানসিক উন্নতি ও অবনতিতে যে সুখ ও দুঃখ, তাহা আমাদের সৃষ্ট; সদ্‌গ্রন্থ পাঠে যে সুখ এবং তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা এই শ্রেণীর। ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ এবং তাহার অতৃপ্তিতে যে দুঃখ, তাহা আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম। সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা অনেক প্রকার কৃত্রিম সুখ দুঃখের সৃজন করিয়াছি। সাধারণত নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা সুখ পাই, যথা—পেশী সঞ্চালন, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, ইন্দ্রিয় সকলের সুস্থ অবস্থা, পরিমিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ; ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি, মিষ্ট আস্বাদ, সুগন্ধ আঘ্রাণ, কোমল ও ঈষদুষ্ণ বস্তুর স্পর্শ; তাল মান সমন্বিত শ্রুতিমধুর শব্দ, নানা বর্ণে রঞ্জিত দৃশ্য সকল, আলোক, কারাবদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ, আশ্চর্য্য নূতন ব্যাপার দর্শন, কোমল বৃত্তি সকলের পরিচালনা, দাম্পত্য প্রণয়, মাতৃ ও পিতৃ স্নেহ, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্ম প্রসাদ, প্রশংসা, শক্তি, প্রভুত্ব, আধিপত্য, প্রতিশোধ পাইবার ক্ষমতা, জ্ঞান, মানসিক শক্তি সঞ্চালন, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কবিতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সহানুভূতি, নীতি ও জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, সমাজ, জীবন ধারণ ইত্যাদি। নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা ক্লেশ, দুঃখ বা যন্ত্রণা পাইয়া থাকি, যথা, পেশীর ক্লান্তি, শরীরের কোন যন্ত্রের বিকার এবং রোগসমূহ; শীতলতা, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, অন্ধকার, অত্যন্ত আলোক, ইন্দ্রিয় সুখের অতৃপ্তি; স্বাধীনতার পর রুদ্ধ অবস্থা, সকল প্রকার ভয়, শোক, স্নেহ ও ভালবাসার সামগ্রী হইতে বিচ্ছেদ, লজ্জা প্রাপ্তি, অবিচ্ছেদে এক রূপ অবস্থায় থাকা, আত্ম অবনতি ও অপমান,

শক্তিহীনতা, দাসত্ব স্বীকার, প্রতিশোধ লইতে অপারগ হওয়া, অজ্ঞানতা, কদর্য্যতা, অসুস্থতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মূর্খতা, নীচতা, মৃত্যু ইত্যাদি। এই সুখ দুঃখের অবস্থা হইতে কেহ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ রূপে উহাদের অতীত হইতে পারেন না। ইচ্ছা করিলে আজীবন কেহ দুঃখ ভোগ করিয়া কাটাইতে পারে না, তাহাকে কিছু না কিছু সুখের অংশ লইতেই হইবে। সেই রূপ দুঃখও মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা। অসম্পূর্ণ মনুষ্য, কোন বিষয়ে সম্পূর্তা লাভ করিতে পারেন না। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃখ যন্ত্রণার অতীত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। অনেকে হয়ত এ কথা শুনিয়া হাসিতেছেন, অথবা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের ইহা প্রলাপবাক্য বলিয়া উপহাস করিতেছেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা পৃথিবীতে এই দুঃখের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর একাধারে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় হইতে পারেন না। তিনি দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান হইলে কেন জীবের দুঃখ দেখিয়া মোচন করেন না? আর সর্ব্বজ্ঞ হইলে তিনি কেন পৃথিবীকে এরূপ ভাবে সৃজন করিলেন না, যাহাতে জীবগণ দুঃখের অতীত হইত? ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হয় তিনি নির্দ্দয়, নয় তিনি জীবের দুঃখের প্রতি উদাসীন। পৃথিবীর গঠন প্রণালী যেরূপ দেখা যায়, তাহা হইতে অন্যরূপ ঈশ্বর কেন করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। তবে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পৃথিবী যেরূপ সৃজিত হইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে সৃজিত হইয়া আসিতেছে, (আমরা এরূপ বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সৃজন ক্রিয়া প্রত্যহ চলিতেছে) তাহাতে বর্ত্তমান সুখ দুঃখের অবস্থা জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন।

উক্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে জনষ্টুয়ার্ট মিল এক জন প্রধান। মনে করা যাউক, আমরা সর্ব্বশক্তিমান, দয়াশীল ঈশ্বরের সহিত জগতের সুখ দুঃখের অস্তিত্বের সমন্বয় করিতে আপাততঃ অক্ষম। কিন্তু সেই জন্য কি ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, পৃথিবীতে এমন কোন সত্য নাই, যদ্দারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় স্বরূপের সহিত সুখ দুঃখের অস্তিত্বের কোন সমন্বয় আদৌ হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমানের অর্থ কি? যে শক্তি দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান শক্তি বলা যায়। এবং যাহা কিছু চিন্তায় সম্ভব হয়, তাহাই বস্তু বা কার্য্য বলা যায়। কিন্তু পানদোষ-শূন্য মাতাল, সাধু চোর, চতুর্ভুজ সমন্বিত পঞ্চভুজ, দুই পার্শ্বের পর্ব্বত শূন্য উপত্যকা, ইত্যাদি আমাদের চিন্তায় সম্ভব হয় না। যদি কেহ বলেন, ঈশ্বর একটী ত্রিভুজ দুইটী সরল রেখার দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি শক্তিহীন, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অজ্ঞান বা বাতুল ভিন্ন অন্য কিছু মনে করি না। যেমন দুইটী সরল রেখার দ্বারা একটী ত্রিভুজ নির্ম্মাণ সম্ভব নহে, সেইরূপ সুখোৎপত্তির উপাদান যে দুঃখ হইতে পারে না, এ কথা কে সপৎ করিয়া বলিতে সাহসী হইবেন? সুখ দুঃখের সহিত এরূপ সম্বন্ধ থাকা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানতা স্বরূপ তাঁহার দয়ার ন্যায় অন্য স্বরূপ দ্বারা বিধিবদ্ধ নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ইহা ধ্রুব সত্য যে,

ঈশ্বর তাঁহার বৃত্তের পরিধির সকল স্থানেই সৎ।

স্কোপেনহার, হার্টম্যান ও লিওপারডাই প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পৃথিবী কেবল দুঃখের আগার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দুঃখ ও নৈরাশ্যের প্রাদুর্ভাব, রোগের আধিক্য এবং যন্ত্রণার সর্ব্বব্যাপিত্ব দেখিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি প্রায় সকলেই অসন্তুষ্ট, সুতরাং দুঃখই পৃথিবীর আদি ও অন্ত, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। দুঃখবাদীদের অন্তত একটী মত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা যে সকল দুঃখ, যন্ত্রণা ও অশুভ ঘটনার উপর আপনাদের ভিত্তিস্থাপন করেন, সেই সকলই অনেক সময় মানবের হিত সাধন করিয়া থাকে, ইহা কেবল কথার কথা নহে, অথবা ঈশ্বরানুরাগী ধার্ম্মিকদের হৃদয়ের ভাব নহে। যতই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে, অমিশ্র অশুভের অস্তিত্ব নাই। ঘোর বিপদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই। এবং ইচ্ছা করিলে দুঃখকে আমরা সময়ে সময়ে সুখে পরিণত করিতে পারি। স্পেন্সার তাঁহার First Principles of Riligion and Science নামক পুস্তকেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবল ঝড়, ধ্বংশের অবতার। ইহার অনিষ্টকারী শক্তি সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু এই ঝড়ের আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে আমরা কতক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহার দ্বারা বায়ু পরিষ্কৃত হয়, রোগ নিবারিত হয়, এবং ফল শস্য উৎপাদনকারী বৃষ্টি হইয়া থাকে। যন্ত্রণা ও কষ্ট যদিও সর্ব্বব্যাপী, তথাচ ইহার মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই।

প্রথমত বেদনা বা যন্ত্রণা, আমাদের জীবন রক্ষার্থে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। অগ্নির দহনে যদি আমরা জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব না করিতাম, অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মাংসবিদ্ধ হইলে যদি আমরা কোন যন্ত্রণা বোধ না করিতাম এবং দুর্গন্ধে যদি আমাদের কোন কষ্ট অনুভব না হইত, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান শরীর গঠন লইয়া জীবিত থাকা অসম্ভব হইত। এরূপ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদা মৃত্যু যাচিয়া লইতাম এবং আসন্ন বিপদও আমরা বুঝিতে পারিতাম না; অথবা যখন বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই, তখনই আমাদের চৈতন্য হইত। অজ্ঞান সন্তানেরা অগ্নিতে হস্ত পোড়াইয়া, অস্ত্রে হস্ত কাটিয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া কষ্ট পাইতেছে, সত্যবটে, কিন্তু এই সকল দ্বারা তাহারা আত্ম রক্ষা শিক্ষা পাইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষা তিন প্রকারে হয়, দেখিয়া, শুনিয়া ও ঠেকিয়া, কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে যে শিক্ষা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অনেক সময়ে অবিলম্বে শাস্তি পাই না বটে, কিন্তু অল্পে অল্পে স্বভাব আমাদের চৈতন্য করিয়া দেয়, যখন আমরা তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ না করি এবং নিয়ম ভঙ্গ বিরত না হই, তখন উহা আমাদিগকে কর্কশস্বরে লাঞ্ছনা করে। ইহাতেও যদি আমরা উহার আদেশ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে শীঘ্র আমরা যথাবিহিত শাস্তি পাই। যদিও তাহার সতর্কতা ও শাস্তি আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক, তথাপি ইহারই দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। কষ্ট যন্ত্রণা, শোক ও দুঃখ যে কেবল দৈহিক বা শারিরীক নিয়ম রক্ষার্থে কার্য্য করে, তাহা নহে; কিন্তু ইহাদের দ্বারাই

মানসিক পরিবর্ত্তন ও চরিত্রের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতালীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। নগরবাসীরা সকলেই কোন না কোন দস্যু দলভুক্ত, অরাজকতার এক শেষ, আততায়ীরা অবাধে তাহাদের দুর্বৃত্তি চরিতার্থ করিত। আহত ব্যক্তিরা বিচারপ্রার্থী হইলে সফল হইত না। এই সময়ে ইতালীর দুইটী যুবক পরস্পরের কত আশা ও উন্নতির কথা বলিতে বলিতে এক দিন সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ জ্যেষ্ঠটি কনিষ্ঠকে রাখিয়া কোন কার্য্য বশত স্থানান্তরে গমন করিলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রাতার শোণিত-সিক্ত মৃত শরীর ধূলায় লুণ্ঠিত রহিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিল।' ইহাতে ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তার জন্ম হইল। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রিয়াঞ্জি, তিনি বলিয়াছিলেন, "Will they not give us justice ; time shall show. So saying he bent his lead over the corpse, his lips muttered, as if with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him, but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer ; Cola De' Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar or a poet, a man of thoughts not of deeds."

ইতিহাস হইতে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্বার্থত্যাগ, আত্মজ্ঞান, সাহস, বিক্রম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ কোন কালে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভিন্ন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাঁহারা কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বলবান। যাহারা নিজ শরীরে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা পর দুঃখ ও যন্ত্রণা নিবারণ করিতে ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে সক্ষম। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণাই পরস্পরের আনুকূল্যের প্রস্রবণ। অন্যের দুঃখ নিবারণ করিতে যাইয়া নিজের দুঃখ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতে অন্য প্রকার উপকারও হইয়া থাকে, ইহার দ্বারা কেবল যে দুঃখী ও যন্ত্রণাভোগীকে বল দেয় এবং তাহাকে পবিত্র করে, তাহা নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা আশ্রয়দাতার হৃদয়ে সহানুভূতি ও পরোপকারের ভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। Oliver Wendell Holmes সুন্দর রূপে বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী রোগগ্রস্ত বন্ধুর সেবা শুশ্রূষা করিলে যেমন শ্বেত শ্মশ্রু ও কেশ আনয়ন করে, তেমনই ইহাতে হৃদয়কেও শুভ্র বা পবিত্র করে। মনুষ্য জীবনের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাদের জন্য আমরা কষ্ট ভোগ করি, তাহাদের প্রতি আমরা অধিক অনুরক্ত হই। গর্ভধারণ, প্রসব কালীন বেদনা, এবং সন্তান লালন পালনে মাতার যে কষ্ট ও চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাই সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের মূল। পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, তাহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, দুঃখ কষ্টের সকল গুরুত্ব ভেদ করিতে আমরা স্পর্দ্ধা করিতেছি। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপযুক্ত চিন্তার দ্বারা আমরা ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথকে কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করিতে সমর্থ হই। এই বিচারে আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে উপনীত হই।

১। পৃথিবী কেবল সুখের অথবা কেবল দুঃখের আগার নহে, সুখ দুঃখ দুইই সকল মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা।

২। যেমন আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনায় পৃথিবীর বাহ্যবস্তুর অতীত কত নূতন সুখের আগার সৃজন করিয়া থাকি, সেইরূপ নূতন প্রকার দুঃখও আমরা সৃজন করি।

৩। দুঃখকে যেরূপ অপ্রিয় বস্তু বলিয়া আমরা সাধারণত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যেরূপ গঠন ও বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুভব করিলে দুঃখ যন্ত্রণা আমাদের জীবন রক্ষার্থে কতক পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

৪। দুঃখ কষ্ট হইতেই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, সাহস, বিক্রম, সাহানুভূতি, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সদগুণ অধিক স্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করিতে হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি যে, দুঃখ অনিবার্য্য, যেখানে কেন আমরা যাইনা, যতই কেন আমরা সুখ অন্বেষণ করি না, আমাদের বিষয় কার্য্য যতই কেন ভাল রূপে নির্ব্বাহ করিনা, তথাচ অসম্পূর্ণ মনুষ্যের দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার নাই, শারিরীক বা মানসিক কষ্ট কতক পরিমাণে সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনেক সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর বিরক্ত হই। প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলে, আশানুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, আত্মগ্লানি আসিয়া আমাদিগকে ম্রিয়মাণ করে। দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা চারি দিকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি আমরা উহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বহন করি, ইহারা আমাদিগকে বহন করিবে এবং আমাদের ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবে। যদি আমরা অনিচ্ছা পূর্ব্বক উহা বহন করি, উহা আমাদিগের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এবং আমরা উহার ভাবে ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িব, অথচ উহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। একটী অপ্রিয়কর অশুভ বস্তু আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দেখিতে পাই যে, অপর একটী গুরুতর অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার হস্ত হইতে কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব? এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ধার্ম্মিক লোকদেরও দুঃখ অল্প নহে। যতই তাঁহারা উন্নতি লাভ করেন এবং ঈশ্বর প্রেমে অনুরক্ত হন, ততই তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

দুঃখের সময় ঈশ্বরের প্রেম-সুখ যেরূপ সুমিষ্ট বোধ হয়, এমন আর কোন সময়ে নহে। যখন সমস্ত পৃথিবী আমাদের বিমুখ হয়, আমরা নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি ও নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করি, তখন অনুতাপিত হৃদয় কত না সুখ পায়। তখনই বলি, দুঃখই পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। যখন দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে, তখন শত্রুরা আর আমাদিগকে আক্রমণ করে না। দুঃখই মনুষ্যের হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করে।

বেন (Bain) তাহার মেণ্টাল ও মরাল সায়েন্সে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম, সুখ লাভের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) কোন সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সুখের কারণ সম্পূর্ণ নূতন হওয়া আবশ্যক। যথা জননীর প্রথম সন্তান। নূতন প্রেমের যে সুখ, তাহা পুনরায় লাভ করা যায় না।

(২) প্রত্যেক সুখের কিয়ৎ কাল নিবৃত্তি থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা কোন আহ্লাদ বা সুখ কেবল কিছু কালের জন্য সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার অতিরিক্ত আর পারি না। সুখোৎপত্তির কারণ কিছু কাল বিরাম থাকা আবশ্যক।

(৩) অনবরত সুখে থাকিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নানা প্রকার সুখের বস্তু থাকা আবশ্যক, এই সকল বস্তু যত বিভিন্ন হইবে ও ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের আয়ত্বাধীন হইবে, ততই সুখ বৃদ্ধি হইবে। কোন সুর যতই কেন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য হউক না, উহা একাধিক্রমে শুনিলে কখনই সুখ লাভ হয় না। যন্ত্রণা হইতে মুক্তি অধিকন্তু সুখের একটী উপায়, যথা, রোগের পর সুস্থতা লাভ। মনের কোন উদ্বিগ্নতা বা ম্লানতার অবসান। মারিভয় হইতে মুক্তিলাভ। বহুকালের ঈপ্সিত অথচ অতৃপ্ত সুখ প্রাপ্তি। সুখ লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে কষ্ট বা দুঃখ ভোগ করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে, কিয়ৎ কাল সুখের বিরামই সুখভোগের পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্য, শরীর সঞ্চালন, সমাজ ও সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে আমরা যে সুখ পাই, তাহার মধ্যে মধ্যে বিরাম আবশ্যক। এইরূপ বিরামের পর সুখই যথার্থ নির্দ্দোষ সুখ। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে, দুঃখ কষ্টের পর আমরা যে সুখ পাই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অত্যন্ত প্রখর।

(৫) পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য পরিবর্ত্তনও উপকারী। সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত না হইলে, এক প্রকার কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে, অন্য প্রকার কার্য্য করিতে আমরা সক্ষম হই। মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে, আমরা শারীরিক পরিশ্রমে সক্ষম হই। চিন্তাতে বিরত হইয়া, পাঠ বা কার্য্য করিতে পারি। বিজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া, সাহিত্য বা চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিতে সক্ষম হই। স্বয়ং কোন কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইলে, অন্যের সাহায্যে কার্য্য করা যায়।

(৬) স্বভাবদত্ত সুখ ব্যতিরেকে আমরা সুখের স্থান বৃদ্ধি করিতে পারি। জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা ও উৎকর্ষ লাভই এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের গূঢ় তত্ত্ব জানাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতেছি যে, সচরাচর যেরূপ মনে করিয়া থাকি, দুঃখ আমাদের সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বরং আমরা অনেক সময় উহার ভিতর আমাদের হিতকর সামগ্রী লুক্কায়িত রহিয়াছে, দেখিতে পাই। সুতরাং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের সকল অবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃখের অবস্থায় হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া নূতন উৎসাহ ও বীর্য্যের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয। এবং সুখের সময় সাবধান পূর্ব্বক পদক্ষেপ করা উচিত। কেন না, সুখ দুঃখ উভয়ই আমাদের পরীক্ষার অবস্থা, উভয়ই আমাদের সহজে বিপথে লইয়া যাইতে পারে, এবং বোধ হয়, সুখের সে ক্ষমতা দুঃখের অপেক্ষা অধিক। সেই জন্য এক জন বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন :—

"The trials of prosperity
As that of adversity
Must be guarded against."

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

মহারাষ্ট্র।

। ১ ।

থলঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃ কালে পুনা হইতে রেল পথে যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কথিত স্থানে গাড়ী আসিল। বোরঘাটের ন্যায় থলঘাটে পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহ-পথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোরঘাট শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল। রাত্রি ১০টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের বাটীতে বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রানুজ এই স্থানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এখানে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে। এই থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, নিজাম রাজ্য, সরকার প্রদেশ দিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪৫০ ক্রোশ হইবে। বাটীর জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া বাটী পরিষ্কার রাখে, পৃথিবীর জল নদী দিয়া বহিয়া সেইরূপ ধরা পবিত্র করে। উৎপত্তি স্থান নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। সে জন্য স্নান প্রভৃতির সুবিধা করণার্থ কুণ্ড ও প্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। স্থান বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন সুন্দর দেখায়। নদীর উভয় পারে বসতি ও দেবমন্দির, সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আলবালের সাহায্যে পার হইতে হয়। নানা স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের গঠন বহুবিধ। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পঞ্চবটি দর্শন করিতে গেলাম, সেখানকার দৃশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর। অতি অল্প দিনের পাঁচটী বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি খোলার ঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি এখানে তাহা দেখিতে পান। নাসিকের গোদাবরী তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শনীয় কিছু নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্যায় মনোরম নদী তীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার চক্ষে কোনও কোনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর অপেক্ষা সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার প্রবাহ সংকীর্ণ, সেজন্য উভয় পারে ঘট্ট ও মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়ী মরাঠী ব্রাহ্মণ-ললনা সতত গোদাবরী কূল আলো করিয়া রহিয়াছেন। গৃহদেবীগণকে স্নানের পর পূজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না। গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে যে কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাও, দেখিবে, বাইয়া বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দূরে থাকিলে সোপানের উপর বস্ত্র-তাড়নের পট

পট শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। নদীর তট এক স্থানে পর্ব্বতময়, সেই খানে পাহাড় কাটিয়া সোপান খোদিত হইয়াছে। চন্দ্রমা-শালিনী সন্ধ্যাকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া দেবালয়ের রৌশনচৌকি শুনিতে শুনিতে এবং রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া কাশীর অহল্যা বাইযের ঘাট মনে আসিল। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেন। তজ্জন্য গোদাবরী তট দীপ-আলিতে মণ্ডিত হইয়াছে ও দেওয়ালির উপঢৌকন দা'ককাম অর্থাৎ পটাকা রমণী হস্তে পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইয়া আনন্দলহরী তুলিতেছে। কপালেশ্বর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অদ্য রাত্রে শিঙ্গার বেশ হইয়াছে। বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দিরে দুইটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া সেবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্তলের শিব মূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে। আতুর সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থান মার্জ্জিত করিয়া সন্তানগণ দীপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ করিবার জন্য মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। সেই কারণে নাসিকে দুই চারি জন দণ্ডি থাকিলেও বহু সমাধি (গঙ্গাতীরে) দৃষ্ট হয়। কপুরথলার রাজার ইংলণ্ড যাইতে ইডন নগরে মৃত্যু হয়। তাঁহার শব গোদাবরী তীরে যে স্থানে দাহ করা হইয়াছে, তথায় একটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ ইংরাজী প্রথানুযায়ী মন্দির রচিত হইয়াছে। এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ হইয়া থাকে। পর পারে সাপ্তাহিক হট্ট হয়। নদী তীরে আসিলে, সুতরাং, এ জনপদের সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জন সংখ্যা ২২৪৩৬।

পাণ্ডুলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব না। বোধিসত্ত্বের কৃপায় চটি জুতা পায়ে থাকিলেও উঠিতে পারিলাম। আমি যত গুলি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। ইহাতে অনেক গুলি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ অভ্যন্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের বাহিরে পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডার কর তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি দানের উল্লেখ আছে এবং যে অব্দ আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় পণ্ডিত কহেন, অশোকের অনুশাসন লিপির পূর্ব্বে লিখন প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত অক্ষর আর্মেনিয়ম বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মে ইহুদি, দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক্, রাজনীতিতে রোমান ও নীতি শাস্ত্রে স্যাক্সন্ জাতিকে উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদ্রব্যগ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত ও লিপিকার্য্য আর্মানিদের কাছে পাইয়াছি, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাণ্ডুলেনায় একজন "ঘাটির" সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বোধ হয় প্রহরী, কিন্তু আমাদের

কাছে পাণ্ডার দাবি করিতে লাগিলেন। এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় একজন পীতবাসা যতিকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি বৌদ্ধ, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, শাক্য বংশ স্থাতিধর্ম্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান পূজা করিতে আসেন। শেবগর্ভ নামক শালগ্রাম শিলার গাত্রে চন্দ্রনের সহিত কুঙ্কুম কর্পূর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করেন। তদনন্তর পঞ্জিকা উদ্ঘাটন করত তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প অক্ষত সহকারে পূজা হইয়া থাকে। এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণের বর্ত্তি দ্বারা আরতি শেষ করিয়া "দেব লোকং গচ্ছ" প্রভৃতি কথিত হয়। ইত্যাকার অর্চ্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় রত্নমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (Mollusca), শিরঃপদী (Cephalo poda), বর্গের বহু কোষ্ঠী (ammomiteda) জীবের দেহাবশেষ মাত্র। গঙ্গাপুরা নামক স্থানে গোদাবরীর একটি জল প্রপাত দেখিতে যাত্রা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক নীচে, সুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, সেই জন্য এই প্রপাতের নাম দুধস্থলি হইয়াছে। মন যদি অতি নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে। বারিধারা ক্ষুব্ধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া নয়ন ভুলাইতেছে, সেখানে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে শিলাতলে উপবেশন করত ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম। একজন জালিক জলের পতন-মুখে মৎস্য ধরিতে লাগিল।

ত্র্যম্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে, গোদাবরী শৈল-দুর্গোপরি উড়ুম্বরী মূলে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম গঙ্গা দ্বার ও তন্নিম্নে সেই অনুযায়ী কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান তীর্থজীবিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা এস্থানে উদ্ভূতা হন নাই। এখান হইতে যে ধারা বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা নালার কঙ্কর সিক্ত হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে গঙ্গা গুপ্তা হইয়া যাইতেছেন। আমরা যখন ত্রি-অম্বকে পৌছিলাম, তখনও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ এবং পট্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে ব্রাহ্মণগণও দেব সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্র্যম্বকেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, প্রকৃত প্রস্রবনের উপর শয়ান শেষশায়ী প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ যুক্ত চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট উৎসজল পূর্ণ কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ড-সমীপে মহামরী দেবীর বলি প্রেরণ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম। এ গ্রামে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অন্নপাক করা হইয়াছে। এক খানি গরুর গাড়ীতে ভাত বোঝাই দিয়া তাহার উপর রক্তবর্ণ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত মশাল

প্রোথিত করিয়া দিলে, অগ্নিহোত্রী ও দেশমুখ সেই স্থানেই দেবিকে বলি [ভাতের গাড়ী] নিবেদন্ করিয়া দিলেন। যুগন্ধরের উপর একটী নারিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদ্গমের সহিত শকট পরিচালন করা হইল। বলি গ্রামের বাহিরে দিয়া আসিয়া, তবে জানপদগণ অদ্য ভোজন করিতে পারিবেন। পাণ্ডা গণপতি শঙ্কর শুকুল মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের আহার করা স্থির হইল। আমার সহচর বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া "মুরমুরে"[মুড়ী] ও পেড়া খাইলেন। উপাধ্যায় পত্নীরা পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ পাতের উপর দুই তিন প্রকার চাট্‌নি একটী বধূ দিয়া গেলেন। অন্য জনে প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দোনা রাখিয়া দিলেন। তৃতীয় যাতা অন্ন আনিলেন। ভাত অতি অল্প পরিমাণে দিতে দেখিয়া ভাবিলাম, এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, সেই হাতায় করিয়া চাপিয়া এক হাতা ভাত পাতের উপর উল্টাইয়া ঢালায় মাথাটী গোল হইয়া রহিল; যে দোনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তরল ঘৃত প্রদত্ত হইলে এবং অধিকাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল; যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়া যায়, হয় কটু নতুবা অম্ল। এত ঝাল যে কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিবেশন-কারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুপ" চাই। আমি বুঝিতে না পারায়, কি বস্তু প্রশ্ন করায়, তিনি কহিলেন, ঘৃত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘৃত আবশ্যক হয় জানি, সুতরাং কহিলাম, না। তাহার পর "পোলি" দিয়া গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল শর্করা যোগে দলিয়া যে রুটিতে পুর দেওয়া হয়, তাহার নাম "পুরন্-চা পোলি"। উষ্ণ ঘৃতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঘৃত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লইলাম, এবং পোলি দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যে পোলি পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও উষ্ণ। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহারাষ্ট্রীয়দের প্রধান খাদ্য; এই জন্য ভাত অল্প করিয়া প্রথমে দিতে হয়। একটি বৌ ক্লান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার করিতে কেন বস নাই। তিনি কেবল, না, কহিলেন। পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক আহার করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ইনি দেবরাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে অগ্রে উঁহাকে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী আহার করিয়াছি, তাহার উপস্কর ও চুক্র আমাদের পক্ষে অখাদ্য। সূপ ও শাক একত্রে —কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়াছিল। তাহা এত ঝাল যে, দুই একবারের অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিৎকর কড়ী খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অত্যন্ত গুণ শুনিলাম, তাহার নাম সার। পাচক কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে জানে না। ইহা কর্ণাট দেশীয় সামগ্রী। ইহাতে আবার ঔষধের কাজ হয়; জ্বর হইলে সার উপকারী। এই অমূল্য বস্তু জিহ্বায় প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক্ক তিন্তিড়ী গুলিয়া লঙ্কা সহযোগে ধনিয়া শাক বাসিত করা হইয়াছে। সেদিন অম্ল ও কটু রস বিহীন ডাল ভাতে পাইয়াছিলাম, বলিয়া কিছু ওদন উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের জন্য একখানি জওয়ারা ও আর এক খানি গোধূমের রোটিকা দিয়াছিলেন। জওয়ারার রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধূম অপেক্ষা

মিষ্ট। রুটি ঘি মাখা নহে, কিন্তু দুধে ফেলায় ময়ানের ঘৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরীর রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক তরকারি আমরা পুনা ও বোম্বাইতে বাঁধিয়া খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, দধি জলহীন করিয়া সর্করা, এলাফল এবং এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ খাইয়াছি, তাহা বিশেষ সুখাদ্য নহে। অনেক হিন্দুর চা ও কাফি-পানীয়ের দোকান বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আছে। ত্র্যম্বকে গঙ্গাদ্বারের ৩২টী সোপান উঠিয়া "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মখ্যাতা চে মালক" রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী কবীশ্বর "ধর্ম্মপেটী" লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক প্রস্তুত চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে পান শুপারি লইতে যাইও।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

প্রাচীন-বংশ-বিবরণ [৩য়]

[৭ খণ্ড, ১১ সংখ্যার পর]।

মরীচি ও কলা, পূর্ণমাস, বিরজ ও বিশ্বগা।

কোন কোন মতে ব্রহ্মার মানসানুসারে মরীচি প্রভৃতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন, এই জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের ন্যায় তাঁহারাও ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলিয়া খ্যাত। মহর্ষি মরীচি, কর্দ্দম মুনির ঔরসজাত ও দেবহূতির গর্ভোদ্ভূত কলার পাণিগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, কলার অপর নাম কলাবতী। কলার গর্ভে ও মরীচির ঔরসে কশ্যপ ঋষি ও পূর্ণমাস সঞ্জাত হন। পূর্ণমাসের বিরজ ও বিশ্বগা দুই সন্তান।

কশ্যপ ও নিধ্রুব-কন্যা।

কশ্যপ নামে এক অসাধারণ জ্যোতির্ব্বেদা ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিৎ কশ্যপ, ও মরীচি-সুত কশ্যপ, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তি নিঃসংশয় বলা কঠিন। অনেকের মতে মরীচি-পুত্র কশ্যপই জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানিতেন। অপর কাহার কাহারও মতে কশ্যপ-গোত্রীয় অন্য এক জন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। শেষোক্ত মত সবিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে, কৌশিকী-নাম্নী তটিনীর তীর-সান্নিধ্যে ভগবান্ কশ্যপ মুনি "পুণ্য" নামক আশ্রমে তপস্যা করিতেন। কৌশিকী নদী, গঙ্গার উপনদী; উহা প্রাচীন গৌড়দেশের সীমার অন্তর্গত। মহাভারতের রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যখন পরশুরাম, কশ্যপকে তাঁহার অধিকৃত স্থান দান করেন, তখন ঋষিবর কশ্যপের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। কেন না, তথায় তাঁহার বাসোপযোগী স্থান নাই। তদনুসারে পরশুরাম, দাক্ষিণাত্যের সমীপস্থ সমুদ্রতটে

গমন কবেন (৭)। কশ্যপেব আত্মজ কাশ্যপ, তাঁহাব নামান্তব শণ্ডিল। দ্বিতীয পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানেব পুত্র বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনু হইতেই চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশেব উৎপত্তি। একমাত্র ঋষিপ্রবব কশ্যপ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয উৎপন্ন হন। কশ্যপেব সংস্রবে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভাবদ্বাজ প্রভৃতি অনেক গোত্র সম্ভূত হইযাছে। তিনি নৈঋব-সুতাকে ধর্ম্মপত্নীপদে গ্রহণ কবেন। দুঃখেব বিষয়, অদ্যাপি নৈঋবাত্মজাব প্রকৃত আখ্যা জানিতে পাবা গেল না। নৈঋব-তনয়া ব্যতিবিক্ত দক্ষেব ঔবসোদ্ভূত ও প্রসূতিব গর্ভজাত অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনাযু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রভা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই ১৩ তেব পত্নী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন বনিতাব অস্তিত্ব জ্ঞাত নহি। কশ্যপনন্দন কাশ্যপই, সূর্য্য-সাবথি বলিয়া বর্ণিত। অরুণ ও অনরু, তাঁহাব নামান্তব। তিনি গরুডেব জ্যেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতিব গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ পুত্র জন্মে। ইঁহাবা সাধারণতঃ আদিত্যগণ নামে খ্যাত। অশ্বিনীকুমাবদ্বয় ত্বষ্টাব পুত্র। দ্বিতীয়া বনিতা দিতিব সন্তান হিবণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল ৫ পাঁচ পুত্র। প্রহ্লাদের পুত্র বিবোচন, তৎপুত্র বলি। বলির তনয় বাণ। ইহাঁরাই দৈত্য বলিযা খ্যাত। তৃতীয়া ভার্য্যা দনুব গর্ভজাত অপত্যেবা, দানব আখ্যায সর্ব্বত্র পবিজ্ঞাত। চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দনুব দুই আত্মজ ছিল। বাতাপি, দনুব পৌত্র। অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক বাতাপিব ধ্বংস হয। কশ্যপেব চতুর্থ বনিতা কালাব বহু তনয। সকলেই অসুব মধ্যে গণনীয। কালাব অপব নাম কাষ্ঠা। পঞ্চম পত্নী দনাযুবও ৪ চাবি সন্তান—বিক্ষয, বল, বীব ও বিত্র এবং পুলোমা নাম্নী এক সুতা। ভৃগুব সহিত ঐ কন্যাব বিবাহ হয। কশ্যপেব ষষ্ঠ জাযা সিংহিকাব বাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন ৪ চাবি সন্ততি। সপ্তম ভার্য্যা ক্রোধা ও নবম ভার্য্যা বিশ্বাব বিষযে বক্তব্য নাই। কশ্যপ ঋষিব অষ্টমা প্রিযতমা প্রভা। তাঁহাব অপত্যেব মধ্যে সুব, গন্ধর্ব্ব ও অসুবেব উৎপত্তি দেখা যায। বিশ্বাবসু ও ভানু এই পুত্রদ্বয, দেবতা বলিযা খ্যাতাপন্ন। গন্ধর্ব্বেব ভিতব অপ্সবাও এক স্বতন্ত্র শ্রেণী। ইহাব তাৎপর্য্য এই, পুরুষেবা গন্ধর্ব্ব ও স্ত্রীগণ (কেশিনী, বম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, অলম্বুষা ও মনোবমা ইহাবা) অপ্সবা নামে পবিচিত। দশম সহধর্ম্মিণী বিনতাব অরুণ ও গরুড় ২ দুই পুত্র। একাদশ ভার্য্যা কপিলা (৮) হইতে অমৃত, বিপ্রজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হন। দ্বাদশ প্রণযিনী মুনিব পুত্রেবা সর্পজাতি। ত্রযোদশ জাযা কদ্রু। তিনি অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলাব, কর্কট ও শঙ্খ, এই অষ্ট নাগেব জননী।

(৭) গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে।
ন তে মদ্বিষয়ে রাম। বাস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ ॥
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্ম্মমে,
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্ত-মহীতলং ॥
শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম, ৪৯।—৬৬ ৬৮।

(৮) কপিলা নাম্নী অপর এক মহিলা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি আসুরিক পত্নী। আসুবি, কপিলের শিষ্য। আসুবিব শিষ্য পঞ্চশিখ, কপিলার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা কবেন।—শান্তিপর্ব্ব, ২১৮ অধ্যায।

কশ্যপ ঋষি, বেদ-শাস্ত্রের কোন কোন অংশ প্রণয়ন করেন। চরণব্যূহ, শৌনক-প্রণীত প্রাতিশাখ্য, শৌনক-প্রণীত বৃহদ্দেবতা, আর্য্য-বিদ্যাসুধাকর, মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদের বিশেষ বিশেষ বিভাগাদি পাঠে এবং ঋগ্বেদ সংহিতার "সর্ব্বানুক্রমণিকা", আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি ঋষি-বিরচিত গ্রন্থাধ্যয়নে ঋক্-প্রণেতা ঋষিবর্গের নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায়। কশ্যপ ঋষি, বেদের যে যে ভাগ প্রণয়ন করেন, তত্তাবৎ বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতায় নিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত, ঋক্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়।

"মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এস্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটি কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত শত যুগ পূর্ব্বে যে, বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতে সাব্যস্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদশাস্ত্র, ঋষিগণের ও তাঁহাদিগের শিষ্য-পরম্পরার মুখে মুখে অভ্যস্ত হইত। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ, ঐ রূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য, গদ্য ও গান, এই ৩ তিন মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সুশৃঙ্খলা-ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য-গদ্যকে তান-মান-লয়-স্বর-সংযোগে পাঠ করাতে, ১ একটী ভাগ হয়, তাহারই নাম গান। এই রূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা চারি অংশে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ-বেদ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। তাবৎ পদ্য ভাগকে ঋক্, গদ্য ভাগকে যজুঃ কহে এবং পদ্য বা গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিলে, তাহাকে সাম বলে। অথর্ব্ব ঐ ৩ তিনের সমষ্টি। এইরূপে বেদ ৪ চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়। * * * ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটী ঋক্ লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া, এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকরণ এবং ঋককে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও, কোন ক্ষতি নাই।" (৯)

কশ্যপ মুনি মহোদয়, ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা, গায়ত্রী, পঙ্‌ক্তি, বৃহতী ও সতোবৃহতী, এই ছয় প্রকার ছন্দে অগ্নি, বিশ্বদেব ও পবমান (অর্থাৎ ক্ষরণশীল) সোমের বৃত্তান্ত ১০১ এক শত একটি ঋকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসদেব, কশ্যপের রচিত অংশ সমুদায়, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম, অষ্টম ও নবম মণ্ডলে নিবেশিত করিয়াছেন। উল্লিখিত তালিকা-সম্বন্ধে ঐ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা বিধেয়। ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২৯ উনত্রিশ সূক্তের রচনা-বিষয়ে ঋষিদের মধ্যেই মতান্তর লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মতে উক্ত সূক্ত, বৈবস্বতমনু-

(৯) মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত, ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রণীত। ৯ নবম মণ্ডলের ১০৭ সপ্তাধিক শত-তম সূক্তটি কেবল কশ্যপ ঋষির নিজেরই সঙ্কলিত নয়, কশ্যপ, ভরদ্বাজাদি ৭ সপ্তর্ষি কর্তৃক সঙ্কলিত।

কশ্যপ মহোদয়ের বিরচিত বেদ-মন্ত্রের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। প্রথম মণ্ডল	৯৯ সূক্ত	১ একটি	অগ্নি	ত্রিষ্টুপ
২। অষ্টম মণ্ডল	২৯ সূক্ত	১০ দশটি	বিশ্বদেব	দ্বিপদা
৩। নবম মণ্ডল	৬৪ সূক্ত	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। ঐ	৬৭ সূক্ত	৩ তিনটি	ঐ	ঐ
৫। ঐ	৯১ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ঐ
৬। ঐ	৯২ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ত্রিষ্টুপ
৭। ঐ	১০৭ সূক্ত	২৬ ছাব্বিশটি	ঐ	বৃহতী, সতোবৃহতী, দ্বিপদা
৮। ঐ	১১৩ সূক্ত	১১ এগারটি	ঐ	পঙ্‌ক্তি
৯। ঐ	১১৪ সূক্ত	৪ চারিটি	ঐ	ঐ

১০১ একশ এক।

কশ্যপ-প্রণীত কতিপয় ঋকের বঙ্গানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"সর্ব্বভূতজ্ঞ বহ্নির উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করিতেছি। আমাদের উপর যাহারা বিপক্ষবৎ ব্যবহার করে, বহ্নি। তাহাদের অর্থনাশ করুন। নৌকার সাহায্যে যেমন নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আপনি আমাদিগকে সমস্ত ক্লেশ হইতে নিস্তার করুন। আপনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিন।

—[১ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত, ১ ঋক।]

"ক্ষরিত হইতেছে, এ প্রকার সোমের আধারে যিনি শুশ্রূষা করেন, যিনি, তাঁহার মনোমত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। হে সোম! ইন্দ্রের নিমিত্ত তোমার ক্ষরণ হউক।—[৯ মণ্ডল।]

"হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্র-রচয়িতারা যে সকল স্তোত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক তুমি স্বীয় বাক্য বর্দ্ধিত কর। সোম রাজাকে প্রণিপাত কর। তিনি যাবতীয় উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান।"—[ঐ মণ্ডল।]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৪৩। ভক্ত, এক সুন্দর পুরুষ কিম্বা এক সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি দেখিলে বলেন যে, যেমন ইহার বাহিরে দেখিতেছি অনিত্য মনোহর দৃশ্য, তেমনি করে ইহার অন্তরের নিত্য মনোহর শোভা প্রকাশিত হইয়া ইহার ব্যবহারে দীপ্তিমান হইবে।

২৪৪। লম্পট পাপী অপেক্ষা কুলটা পাপীয়সীর মূর্ত্তি অধিকতর জঘন্য ও ঘৃণিত, কারণ ঐরূপ পাপী অপেক্ষা ঐ রূপিণী পাপীয়সী জন সমাজের অধিকতর অনিষ্টোৎপাদন করে।

২৪৫। জ্ঞান চক্ষে ঈশ্বর নিরাকার ও ভক্তি চক্ষে তিনি সাকার রূপে দৃষ্ট হন। জ্ঞানী উপাসক ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে মঙ্গলময়ের নিকট পশ্চাৎ লিখিত রূপে প্রার্থনা করেন; হে মঙ্গলময়! তোমারই মঙ্গল বিধানে এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইতেছি। তোমারি মঙ্গলময় চরণে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করিয়া উহা গ্রহণ করি।

ভক্ত উপাসক ঐ কালে যাহা বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাহা এই,—মা গো, তুমি অন্নপূর্ণারূপ ধারণ করিয়া নিজ হস্তে এই সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া তোমার এই পাপী সন্তানের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তির জন্য এখানে অধিষ্ঠান হইয়াছ। মা গো, তোমার স্নেহময় চরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, বিশেষ নির্ভরতা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম করিয়া তব প্রদত্ত অন্ন পান গ্রহণ করি। আমায় রক্ষা কর। আমার শরীর, মন সুস্থ ও পবিত্র কর।*

এই দুই প্রার্থনার মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিলে, প্রথম উল্লিখিত কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

২৪৬। প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তিনি, যাঁহার জীবন নানা সদনুষ্ঠানে পবিত্র ও উন্নত হয়। এ প্রকার পবিত্রতা ও উন্নতি বিনা সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র গৌরব নাই। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা করিয়া অনিত্য জীবনের উন্নতির জন্য লোকে সচরাচর বড়ই ব্যস্ত। ব্রাহ্মেরা সেই পথের পথিক হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় প্রভূত অনিষ্ট ঘটিবে। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা করিয়া যিনি অনিত্য জীবনের জন্য ব্যস্ত, তিনি অতি ভ্রান্ত ও মোহিত।

২৪৭। যিনি হন যত মাটি, তিনি হন তত খাঁটি।

২৪৮। যে উদ্দেশে যাহার সৃষ্টি, তদন্যথাচরণই তদীয় শ্রীহীনতা, তাহাই পাপ, তাহাই অপবিত্রতা।

২৪৯। যাহা ইহলোকে, পরলোকে, অনন্ত জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ হয়, তাহাই পবিত্রতা। যাহা অনন্ত সুখাবহ, তাহাই পবিত্রতা।

২৫০। এ প্রদেশে বিবাহের পর বিবাহিত পুরুষ যে নারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার পতি, স্বামী, ভর্ত্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। এই সকল শব্দের অর্থ প্রভু। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভু তাঁহার স্বামী বিনা আর কেহ নাই। তিনি তাঁহার সেবায় কায়মনো-

বাক্যে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিবেন। তাহাই তাঁহার ব্রত। সে ব্রত পালনে তিনি পবিত্রতা ও কৃতার্থতা লাভ করিবেন। স্বামী-পূজা সম তাঁহার কোন ব্রত নাই।

২৫১। ব্রাহ্মধর্ম্ম মার্জ্জিত ও বুদ্ধি সম্পন্ন উন্নতমনা ও প্রেমিক হৃদয়বান ঋষিদিগেরই গ্রহণোপযোগী ধর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে অসমর্থ। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কবে যে সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে যোগ্য হইবে, তাহা সেই পূর্ণ জ্ঞানময় ও অনন্ত মঙ্গলময়ই জানেন।

২৫২। মঙ্গলময় কত রূপে কত প্রকারে তাঁহার ভক্তদিগকে দর্শন দেন। তন্মধ্যে সচরাচর দুইটি দৃষ্ট হয়। একটি এই যে, তিনি তাঁহার রচনায় তাঁহার গুণ প্রকাশে দেখা দেন। অপরটি বড় দুর্ল্লভ। সেটি এই, তাঁহার ভক্তের প্রাণে তিনি তাঁহার জ্যোতি অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করেন। যে তাহা ভোগ করিয়াছে, সে তাহা জানে।

২৫৩। ভক্তজীবন পবিত্রতার ভিখারী। তিনি কেবল শব্দগত, শারীরিক, মানসিক, বাচনিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। তিনি এ সকল বিষয়ক পবিত্রতা লাভের জন্য তাঁহার বাসগৃহ ও তৎস্থিত দ্রব্যাদি ও পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কারাদির পবিত্রতা চাহেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের পথাদি ও প্রতিবেশীদিগের পবিত্রতার জন্য যত্নযুক্ত হন্। তিনি অর্থ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যবহারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য বড়ই কাতর হন্। তিনি সামাজিক পবিত্রতা ভোগের জন্য সদাই চিন্তিত। তাঁহার আহার, পানীয় ও সেবনীয় বায়ুর পবিত্রতার জন্যও তিনি কাতর। পবিত্রতাময় তাঁহার জীবন। এরূপ জীবনই সার্থক।

২৫৪। ক্রোধ, ভক্ত জীবনের যেরূপ বিষম শত্রু, তাহাতে তাহার আক্রমণ হইতে ভক্তের আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যে যে উপায়ে তাহা করিবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে পরম পবিত্র স্বরূপের বর্ত্তমানতা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা সর্ব্বপ্রধান। তাহার পর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রশান্ত ভাব সর্ব্বদা ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শরীর ও মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপযোগী অবস্থায় অবস্থিতি করিবার বিশেষ রূপে চেষ্টা করা উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম সম ঐ শত্রু দমনের উপায় নাই।

২২৫। অহঙ্কার, অসত্য মূলক। সুতরাং উহা মানব হৃদয় মনকে অসত্যে, অন্ধকারে ও মৃত্যুতে লইয়া যায়। ধর্ম্ম সাধনের উহা বিষম শত্রু। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র মনেতে উহা স্থান পায়।

২৫৬। অর্থলোলুপ ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র। তাহার ধন থাকিতে ধন নাই। সে সর্ব্বদাই ধন লালসার অধীন হইয়া ধনাগমের জন্য চিন্তিত ও ব্যস্ত। তাহার ধন তৃষ্ণার কিছুতেই শান্তি হয় না। সে কি সৎ কি অসৎ উপায়, যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই সন্তোষ লাভ করে। এ প্রকার ব্যক্তির লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হইবে, আশ্চর্য্য কি? সেই পাপাত্মাই দরিদ্র।

২৫৭। যখন তব ও মুখ হেরি
তখন সব দুঃখ পাশরি।

২৫৭। পরমাত্মাই মানব প্রাণের পরম ও নিত্য ভোগ্য। তিনিই তাহার পরম বাসস্থান। তাঁহারই পবিত্র সহবাসে মানবাত্মার

নিত্যানন্দ, নিত্য শান্তি ও নিত্য মঙ্গল। সেই অনাদি, অনন্ত, সত্য, নিত্য, একমেবাদ্বিতীয়ং, মঙ্গলপূর্ণ, স্বয়ম্ভু ও স্বপ্রকাশের পবিত্রতম ও শোভনতম চরণে মানব প্রাণ একীভূত ও বিলীন হইয়া নিরাপদে থাকিবে, নিত্যকাল ভোগ করিবে তাঁহার অজস্র ও অনন্ত মঙ্গলামৃত বর্ষণ। সেই অদ্বিতীয় বিনা নিত্য সত্য আর কিছুই নাই।

২৫৯। যে হয় পরের ভালর জন্য যত ছোট, সে হয় যথার্থতঃ তত বড়।

২৬০। মানুষের নিকট সকল আশা হয় না পূরণ, প্রাণনাথের মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন কারণ।

২৬১। সরোবর তীরে ঘোর অন্ধকারে সজ্জীভূত আলোক মালা তদীয় জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, যেমন তাহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়, সেই রূপ ভক্তি সরোবরে ভক্তনাথের পবিত্রতার জ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা পরম রমণীয় মনঃতৃপ্তিকর শোভা ধারণ করে।

২৬২। ধর্ম্মরাজ্যে সচরাচর দুই দল সুন্দর বেশধারী লোক দৃষ্ট হয়। এক দল গড়িতেছে ও অপর দল ভাঙ্গিতেছে। গড়া ও ভাঙ্গা, এই দুই কার্য্যের জন্য তাহাদিগের মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মনু, ঈশা, মূষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ গঠন কার্য্যের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মত ঐ কার্য্যে যাঁহারা এখনও বহুযত্ন সহকারে নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারাই দেব পদ বাচ্য, তাঁহাদিগের জীবনই ধন্য। আর যে সকল ভদ্র বেশধারী ভ্রান্ত মানব সন্তান দেবতাদিগের বহু আয়াসে গড়া সামগ্রী ভাঙ্গিবার জন্য সদাই চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত, তাহারাই অসুরের নীচ পদে অবনত। তাহারাই ধর্ম্মরাজ্যে দস্যু, দানব, রাক্ষস, বানর। তাহারা আপনারা অবিশ্বাসী ও ঈশ্বর ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বল ও অর্ব্বাচীন ভক্তিরসপানার্থীদিগের নব কোমল বিশ্বাস ও ভক্তি-কলিকা অপহরণ ও তাহাদিগের হৃদয় মধুময় ভক্তি ও শান্তিবিহীন করিয়া থাকে। এই পাপাত্মাদিগকে মঙ্গলময় সুমতি দিন ও তাহাদিগের দুর্গতি নিবারণ করুন।

২৬৩। একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই পারেন না, মানবাত্মাকে পাপ হইতে মুক্তি ও অনন্ত মঙ্গল দান করিতে। ইহা তাঁহার অদ্বিতীয় স্বরূপের উজ্জ্বল মহিমা। তিনি ভিন্ন মানবের নিত্য জীবনের ভোগ্য পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম শান্তি, পরম পবিত্রতা প্রভৃতি পবিত্রতর রসবর্ষণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। দেবপদ বাচ্য তাঁহার উন্নত সন্তানগণেরও তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা নিত্য জীবনের ভোগ্য, তাহা মেলে কেবল সেই অদ্বিতীয় সত্য, নিত্য মঙ্গলময়ের অনুপম চরণ পূজায়। আর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না।

২৬৪। আমি যেন সকলকে দেখি ভাল,
কেবল আপনাকে দেখি কাল॥

২৬৫। যাহার জীবন জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলিত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, ভক্ত তাহারই নাম।

যে হয় ভক্তনাথের অনুপম চরণগত প্রাণ,
সেই পায় ভক্তের মধুময় নাম।

যে সেই জ্ঞানময়ের উজ্জ্বল জ্ঞানকিরণে ভক্তির মনোরম পবিত্র উদ্যানে করে সদা বাস, তাহারই জীবন হয় ভক্তিময়।

যে পায় মঙ্গলময়ের রচিত অগণ্য অতুল-

নীয় পদার্থ গুণে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ দর্শন, তাহারই হয় ভক্তিরসাভিষিক্ত সুখের জীবন।

যে জানে, সে নিজে কিছুই নয়, করে সে সকল সুখ ভোগ কেবল মঙ্গলময়ের কৃপায়, ভক্ত নামের যোগ্য সেই জন হয়।

মান, অভিমান, অহঙ্কার, অহংজ্ঞান যে করিয়াছে বিসর্জ্জন, তাহারই হয় সজ্জনগণের অভিলষিত ভক্তজীবন।

যে তৃণ সম বিনীত, যাহার বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা, তাহারই জীবনে রক্ষিত হয় ভক্তের যোগ্যতা। চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহারে, যাহার প্রাণ সহিতে নাহি পারে ভক্তনাথের অবমাননা, সেই বুঝিয়াছে ভক্ত জীবনের গৌরব ও মর্য্যাদা।

নানা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশে যাহার মন প্রাণ থাকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ চরণতলে, অবাতকম্পিত দীপ শিখার ন্যায় স্থিরীভূত, তাহারই জীবন ভোগ করে ভক্তির অমৃতময় শান্তিপূর্ণ বিমল সুখ। সর্ব্বত্যাগী হইয়া যে করে মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ অমৃতময়, অভয় চরণে নিরন্তর বাস, তাহাতেই পূর্ণ হয় ভক্ত জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ।

২৬৬। নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম বাহ্য বস্তুতে যে রূপে হন দৃশ্যমান, তদপেক্ষা উচ্চতর রূপে তিনি মানব আত্মাতে দৃষ্ট হন। স্বরূপত তিনি মানব চিন্তার অতীত।

২৬৭। পূর্ণব্রহ্ম বিনা পূর্ণতা লাভের কাহার অধিকার নাই। মানব আত্মা চিরোন্নতিশীল। অনন্তকাল তাহার উন্নতির পর উন্নতি লাভ হইবে। উন্নতির শেষ কখনই হইবে না। পূর্ণ ও অদ্বিতীয় স্বরূপ চিরদিন তাহার সম্মুখে পূর্ণ অদ্বিতীয় রূপে দর্শন দিবেন।

২৬৮। পবিত্র স্বরূপের কৃপায় পবিত্র না হইলে কেহই তাঁহার শোভনতম রূপের পরমশোভা ভোগ করিতে পারে না।

২৬৯। যাহার চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিনয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি না পায় প্রকাশ, তাহার হয় না ভক্ত জীবন।

২৭০। ভক্ত দেখে তাহার পার্থিব পিতা ও মাতাকে, সেই নির্গুণ পিতা ও মাতার প্রতিনিধি স্বরূপ। সুতরাং তাঁহারাই তাহার পার্থিব পরম পূজনীয় গুরু।

২৭১। ভক্ত জানে যে, ভক্তনাথ করিবেন না তাহার পূজা গ্রহণ, যদি সে না করে তাঁহার প্রতিনিধিদিগের যথোচিত পূজা।

২৭২। ঈশ্বরেতে যাহার আছে ভক্তি, তাহারই হয় পিতা মাতায় ভক্তি। আবার যে করে তাহার পিতা মাতাকে ভক্তি, ঈশ্বরেতে তাহারই হয় ভক্তি। ভক্তির তৃপ্তি ঈশ্বরেতেই। যতদিন তাঁহাতে ভক্তি পরিচালিত না হয়, ততদিন তৎ প্রবৃত্তির তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

২৭৩। পাপ অতিশয় ঘৃণার্হ, কিন্তু পাপী অতি কৃপাপাত্র।

২৭৪। ভক্ত প্রতিদিন পিতা মাতার পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন ও তাঁহাদিগের পাদোদক পান করিবার পর আহারাদি করিয়া থাকেন।

২৭৫। ভক্ত গুরুজনদিগের কথার প্রতিবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বিনীতভাবে মৃদুস্বরে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি কখন তাঁহাদিগের নিকট অপ্রিয় বচন কহেন না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকানাইলাল পাইন।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

। দ্বিতীয় প্রস্তাব। ।

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ।

প্রাচীন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্ব্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এরিয়ান, ডাইওডোরাস্ ও টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারগণ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশকে গৌড় ও অনুগঙ্গ প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেন-বংশীয় মহারাজ বল্লাল সেনের সময়েও বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বভাগ মাত্র 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এক্ষণে বাঙ্গলার যে অংশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া কথিত হয়, তাহার নামানুসারে সমস্ত দেশের নাম বাঙ্গলা হইয়াছে। 'বাঙ্গলা' দেশের নামে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীনকালীয় প্রাধান্য ও গৌরব লক্ষিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় ভূপতিবর্গের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কোন সংশ্রব ঘটিয়াছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হয় না। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণায় পালরাজগণের যে কয় খানি প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপ উপাধিই দেখা যায়। তাঁহাদের শাসনবিস্তৃতির পরিচায়ক কোনও তাম্রশাসনাদি চিহ্ন পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের শাসনদণ্ডের অধীন ছিল না, অথবা পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের আধিপত্য সবিশেষ বদ্ধমূল হয় নাই।

পক্ষান্তরে বুদলগাছির প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিলিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, পালবংশীয় রাজন্যবর্গ বঙ্গের বিষয় অনবগত ছিলেন না। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের আদেশে এই প্রস্তরলিপি খোদিত হয়। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ কাব্যজ্যোতিষাদি নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন *। ভাগলপুরের তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গবাসী মদ্যদাস নামক শিল্পকর দ্বারা উৎকীর্ণ হয় বলিয়া বোধ হইতেছে। মদ্যদাস সমতটের অধিবাসী ছিলেন, উক্ত শাসন-পত্রের শেষ শ্লোকে তাহা উল্লিখিত হই-

---

* প্রস্তরলিপির ২০।২২ শ্লোকে গুরবমিশ্র প্রশংসিত হইয়াছেন। বঙ্গ শব্দ দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ, কি পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। শেষোক্ত অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের সবিশেষ চর্চ্চা ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আদিশূরের সময়ে এই পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটে।

নানাকাব্যরসাগমেষ্বধিগমো, নীতৌ পরা নিষ্ঠতা
বেদোক্তানুগমাদশৌ প্রিয়তমো বঙ্গস্য সম্বন্ধিনাং।
আসক্তি গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং, বিখ্যাতবিজ্জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারো নদঃ ॥ ২০॥

আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী সেনরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইয়া, বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও পালরাজগণের আধিপত্য কালক্রমে বিলুপ্ত করে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

যাছে *। এই উভয় লিপিই পালরাজগণের পূর্ব্ববঙ্গে শাসন প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় দিতেছে। এই অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষতার নিমিত্তও পূর্ব্ববঙ্গ সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল—ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আদিশূর ও তাঁহার পরবর্ত্তী সেনরাজগণের আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গেই প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে সমগ্র বঙ্গ ও গৌড়দেশে সংস্থাপিত হয়।

পালরাজগণের আধিপত্য অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত যে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, জনপ্রবাদও তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, পালবংশীয় যশপাল তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত, মাধবপুরে, শিশুপাল ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত কাপাসিয়াতে এবং হরিশ্চন্দ্র পাল বর্ত্তমান সাভারের সন্নিহিত কাঠীবাড়ীতে ‡ রাজত্ব করিতেন। এই তিনটী স্থানই বর্ত্তমান ঢাকা জিলার উত্তর অংশে অবস্থিত, ইহার কোন স্থানই ঢাকার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নহে, কিম্বা আদিশূর ও সেনরাজগণের রাজধানী সমতট ও রামপালের নিকটবর্ত্তী নহে। ডাক্তার হাণ্টারের মতে ইহারা তিন জনেই পালবংশীয় ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। জনশ্রুতি ও 'পাল' উপাধি ভিন্ন ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার অন্য কোনও কারণ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ না হইলেও, অন্ততঃ ঢাকার উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনদণ্ডের অধীন ছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এস্থলে পালরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পালবংশীয় নৃপতিগণ সুপ্রাচীন মগধরাজ্যে প্রথমত রাজপাট সংস্থাপিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া মগধে উপনিবিষ্ট হইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, বা মগধই তাঁহাদের আদিম বাসস্থল, ইতিহাস তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। অঙ্গ (পূর্ব্ববিহার), গৌড় (পশ্চিম বঙ্গ), পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং তীরভুক্তি বা ত্রিহুত (উত্তর বিহার) লইয়া তাঁহাদের রাজ্য সংগঠিত হয়। পূর্ণিয়া, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া তাঁহাদের শাসনাধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন * রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

---

* শ্রীমতা মদ্যদাসেন শুভদাসস্য সূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎ-সামতটজন্মনা॥

‡ কাঠীবাড়ীতে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ও উচ্চ মৃত্তিকাস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভটী প্রায় পঁচিশ হাত উচ্চ। প্রবাদ আছে যে, এই উভয়ই রাজা হরিশ্চন্দ্রের নির্ম্মিত।

* খ্রীষ্টীয় ৬২৯ অব্দের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাং, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসূতি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা দর্শন ও সেই পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশ শিক্ষা করিবার মানসে স্বীয় জন্মভূমি লিয়াংচু পরিত্যাগ করিয়া বহু আয়াসে নানা শঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক স্থলপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় অপর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। ৬৩৭ হইতে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ পর্য্যন্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থান বিহার প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া

ছিল। মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের প্রধান রাজধানী ছিল। তাঁহাদের প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন হইতে এই সকল বিষয় জানা যাইতেছে। মুঙ্গেরে দেবপাল দেবের ও ভাগলপুরে নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্দলগাছি ও আমগাছি নামক দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে পালরাজগণের নামাঙ্কিত দুই খানি শাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় শাসনলিপিই পদ্মা নদীর উত্তর তীরে পালবংশীয় নরপতিদিগের আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে। দিনাজপুর. রঙ্গপুর ও বগুড়া জিলায় পালরাজগণের কীর্ত্তি ও ক্ষমতার পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন অদ্য পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিজ্ঞবর ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের মহীগঞ্জ,—দিনাজপুরের মহীপুর, মহীনগর, মহীসন্তোষ ও মহীপালদিঘী পালবংশীয় সর্ব্বপ্রধান নৃপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দিনাজপুরের নয়নগর মহারাজ নয়পালের শাসনপ্রভাব ঘোষিত করিতেছে। দিনাজপুর জিলায় বর্দ্ধনকোটি (প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী) অবস্থিত আছে। এই বর্দ্ধনকোটির প্রায় ১০ মাইল উত্তরে রাজা ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত মহীপুরে মহীপালের এবং আটাপুরে উষাপালের আবাসবাটীর চিহ্ন লক্ষিত হয়। স্থানীয় অজ্ঞ লোকের নিকট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শুনিয়াছেন যে, যোগীঘোপায় রাজা দেবপালের প্রিয়তমা তনয়া বিমলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। যোগীঘোপার নিকটস্থ অমারি নামক স্থানে রাজা দেবপালের আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ বহুতর ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। ইহার দুই মাইল দূরে চন্দিরা নামক স্থানে চন্দ্রপালের বাসস্থলীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। চন্দিরার সাত মাইল উত্তরে বুদলগাছির সুবিখ্যাত প্রস্তরস্তম্ভে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের বংশাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণায় পালরাজগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তরলিপি ও শাসনপত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সময়ানুক্রমে প্রদান করা আবশ্যক। এই সকল শাসনলিপির কোন কোন কোনটীর অংশ বিশেষ বিলুপ্ত হইয়াছে, কোন কোনটীর স্থানবিশেষ অবোধ্য ও অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন কোনটীর আদিম লিপি দূরে থাকুক, তাহার প্রতিলিপি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন এই সকল লিপি হইতে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎগণ ভিন্ন ভিন্ন

বৌদ্ধগয়া, কুশাগারপুর, রাজগৃহ ও নালন্দা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করেন। নালন্দা হইতে হিরণ্য পর্ব্বত (মুঙ্গের ?), চম্পা, (পাটলীপুত্র ?) ও কজুঘির (রাজমহল ?) হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তিনি ২০টী বৌদ্ধবিহার ও ১০০ বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পান। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ রাজার আশ্রয়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, কামরূপের হিন্দুরাজা ভাস্করবর্ম্মার রাজধানীতে (গৌহাটী ?) উপনীত হন। কামরূপ হইতে সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কিরণসুবর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ভারতীতে 'হিয়াং সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহের যথোচিত বিবরণ থাকা সম্ভবপর।

পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য কুশী হইতে ব্রহ্মপুত্র, এবং গঙ্গা হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী বর্দ্ধনকুঠী (রাজবাড়ী) নামে পরিচিত, ইহা করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে বিষম মতভেদ সংঘটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত, বিনষ্ট, অবোধ্য ও অপাঠ্য শাসনলিপি হইতে তাহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল লিপিই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া, পালরাজগণের আধিপত্যকালেও বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সবিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স সাহেব মুঙ্গেরে পালরাজগণের প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন। ইতি পূর্ব্বে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে বুদ্দলের প্রস্তরলিপি তাঁহার যত্নে আবিষ্কৃত হয়। এই শিল্পকুশল চিরস্মরণীয় মহাত্মা স্বহস্তে যে বাঙ্গলা অক্ষর সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ অক্ষরে ১৭৭৮ খ্রীঃ হল্‌হেড্ সাহেবের প্রণীত বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতবিৎ উইলকিন্স সাহেবের নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র যেমন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছে, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার ইতিহাসও সেইরূপ দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে। প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদির সাহায্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত অপরিজ্ঞাত অংশ যে পুরাতত্ত্ববিৎগণের গবেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। মহাত্মা উইলকিন্স সাহেবই এই বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ চিরকাল তাঁহার অবিনশ্বর নাম ও কীর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার পরম পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা চার্লস উইলকিন্স মুঙ্গেরের তাম্রশাসনের অনুবাদ তাহার মর্ম্মালোচনার সহিত সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত করেন। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ দেবপাল দেব স্বকীয় রাজত্বের ৩৩ তম বর্ষের ২১শে মাঘ বোধ ভিক্ষুরত মিশ্রকে শ্রীনগরের (বর্ত্তমান পাটনা) অন্তর্গত মিসিক গ্রাম উপভোগার্থ নিষ্কর প্রদান করেন। দাতা ও গৃহীতা উভয়েই বিহার প্রদেশে বাস করিতেন, উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে মুদ্গগিরিতে (বর্ত্তমান মুঙ্গেরে) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে রাজা দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল, মাতা রণ্ণা (রণ্ণা?) দেবী এবং পিতামহ গোপালের নাম উল্লিখিত আছে। ডাক্তার হারনলি বলেন, ইহাতে রাজ্যপাল দেবপালের পুত্র ও যবরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১৭৮৫ খ্রীঃ উইলকিন্স সাহেব বুদ্দলের সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ ও বিবরণ প্রকাশ করেন। বুদ্দলগাছি বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত পত্নীতলা থানা হইতে ১০ মাইল দূরে পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানির আমলে এক বাণিজ্যকুঠী বিদ্যমান ছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্দলের প্রস্তরস্তম্ভ মহাত্মা চার্লশ উইলকিন্স কর্তৃক সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই স্তম্ভ মহারাজ নারায়ণ পালের মন্ত্রী বেদ বেদাঙ্গবিৎ গুরব মিশ্রের আদেশে নির্ম্মিত ও লিখিত হয়। ইহাতে মন্ত্রীর বংশাবলী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে পালবংশীয় তিন জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, জামদগ্ন্যগোত্রজ এই মিশ্রবংশ পুরুষানুক্রমে পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রস্তরলিপির শেষ ছয়টী (২৩-২৮) শ্লোকের নানা স্থানের

অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, এই ভাগের প্রকৃত ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, বীরদেবের পিতা শাণ্ডিল্য মিশ্রবংশের আদিপুরুষ। বীরদেবের পুত্র পাঞ্চাল। পাঞ্চালের পুত্র গর্গ। গর্গের পত্নীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্র দর্ভপাণিমিশ্র মহারাজ দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। শর্করা দেবীর গর্ভে দর্ভপানির সোমেশ্বর নামে পুত্র জন্মে। সোমেশ্বরের পত্নীর নাম তরলা দেবী। ইহার পুত্র কেদার মিশ্র রাজা সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বর দেবপাল ভুজবলে উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হুন দেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কেদার মিশ্র দেবগ্রামের বব্বা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র গুরব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি রাজা নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন।*

* পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়টী শ্লোক আছে তাহার মূল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল। অনুবাদ দ্বারা অযথা প্রবন্ধের অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া তাহা প্রদান হইতে নিবৃত্ত রহিলাম।

খ্যাতঃ শাণ্ডিলবংশেকো, বীরদেবস্তদন্বযে।
পাঞ্চালো নাম তদগোত্রে, গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ ১
পত্নীস্থা নাম তস্যাসীদ ইচ্ছান্তর্বিবর্ত্তিনী।
॥ ৩
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪
আরেবাজকোম্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহত
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপ ॥ ৫
দিকচক্রায়াতভূভৃৎপরিকররিসরদ্বাহিনো দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতি ররসতাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য ॥৬
দত্বাপ্যনল্প উড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥ ৭

১৭৯৪ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ জোনাথান ডাঙ্কান সাহেব বারাণসীর নিকটস্থ সারনাথ নামক বিবিধ বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ স্থানে পালরাজগণের নামাঙ্কিত এক খানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত করেন। ইহাতে মহীপাল, স্থিরপাল, বসন্তপাল ও কুমারপাল—এই চারি জন পালবংশীয় রাজার নাম খোদিত আছে। এই প্রস্তরলিপি এক্ষণে কোথায় আছে, তাহা জানা যায় নাই। ইহার অনুবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর মহীপাল বারাণসী ক্ষেত্রে ঈশান ও চিত্রঘণ্ট প্রভৃতি শত শত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। স্থিরপাল ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তপাল বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাহাদের আদেশে ১০৮৩ সংবতাব্দের ১১ই পৌষ গর্ভকুঠী সহ তথায় এক বৌদ্ধশৈল নির্ম্মিত হয়। এই স্থিরপাল ও বসন্তপাল বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎগণ অনুমান করেন। বারাণসী পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর পালরাজগণের শাসন প্রভাব যে বিস্তৃত ছিল, তাহা এই প্রস্তরলিপি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে

উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বং
খর্ব্বী কৃতদ্রবিড়গুর্জ্জররাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বর শিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ ১৩
যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীসুরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজা নতশিরা জগ্রাহ পূতপয়ঃ ॥ ১৫
কুশলো গুণান বিবেক্তুং বিজিতেষু যং নৃপঃ প্রপদং
সুনমতি (?)
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্যস্তৈব ॥ ১৯

১৮৭৪ খৃঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বুদ্দালের প্রস্তরলিপির যে মূল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলি গৃহীত হইল।

এই প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ হয়, অনুমান করিয়া বহুমানাস্পদ ডাক্তার মিত্র ও কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎগণ পালরাজগণের সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মূলের অভাবে এই লিপি হইতে পুরাতত্ত্ববিৎগণের কোন্ কথা কত দূর বিশ্বাস্য ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে, বলিতে পারি না।

১৮০৬ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ কোলব্রুক সাহেবের প্রযত্নে দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছিতে পালরাজগণের নামাঙ্কিত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। কোলব্রুক সাহেব তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ডাক্তার হারনলি রোমান অক্ষরে তাহার মূল স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। * ইহাতে পালরাজগণের বংশাবলি বিস্তারিত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে একাদশ জন পাল বংশীয় নরপতির নাম জানা যাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার নানা স্থানের অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার যথোচিত অর্থ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এক মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই মতভেদে পালরাজগণের পুরুষ গণনা নিশ্চিত রূপে হইয়া উঠে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মিত্র মহোদয় ও বিজ্ঞবর ডাক্তার হারনলি সাহেবকে পরস্পর বিরোধী দুই মতের প্রধান পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দেশকেই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমগাছির শাসনপত্রের বিকৃত ও অস্পষ্ট মূল দৃষ্টে পাঠকবর্গ স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।

* আমগাছির সুপ্রসিদ্ধ তাম্রশাসনের প্রতিলিপি হইতে পালরাজগণের বিস্তীর্ণ বংশাবলী, ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সহিত মিলাইয়া, নিম্নে প্রকাশিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সংস্কৃতবিৎ পাঠকগণ ইহা হইতে স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে, এবং প্রবন্ধলিখিত মতের সারাসরবত্তা নিরূপণ করিতে পারিবেন। ডাক্তর হারনলির মত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না স্মরণ নাই।

স্বস্তি।

মৈত্রীকারুণ্য রত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সংদধানঃ
সম্যক-সম্বোধিবিদ্যা সরিদমলজল ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং পাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপাল দেবঃ॥ ১

লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদ উপস্থিতবতাং একাশ্রয়ো ভূভৃতাং।
মর্য্যাদা পরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূদ
দুগ্ধাম্ভোধি বিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥

(জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন
উপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থ পিত্রে
চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥)

রামস্যেব গৃহীতসত্যতপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদিতুল্যমহিমা বাক্‌পাল-নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান নয়বিক্রমৈকবসতিভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদ একাতপত্রা দিশঃ॥ ৩

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈ জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভুব বিজয়ী জয়পাল নামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥ ৪

(যস্মিন ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাৎ উৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণযিপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণাং উপশমিতসমিৎশঙ্কয়া যস্য চাজ্ঞাং॥)

আমগাছির তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 'মহারাজাধিরাজ' নয়পাল দেবের পুত্র 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্' বিগ্রহপাল দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটীবর্ষ গ্রামে দুই দ্রোণ ভূমি খোভূত দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। দানগৃহীতা খোভূত (?) সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী বেদান্তমীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিৎ অক্কিবন দেবের পৌত্র ও অর্কদেবের পুত্র

শ্রীমান বিগ্রহপাল সংগ্রম বজাতশকবির জাতঃ।
শক্রবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ ॥ ৭

(বিপক্ষো যেন গুর্ব্বী ণাং বিপদাং আস্পদীকৃতা।
পুরুষাযষদীর্ঘাণা সুহৃদ সম্পদামপি॥
লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
পত্নী বভূব কৃতহৈহয়বংশভূষা।
যস্যা শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধিং পরমো বভূব॥)
দিব্যানাং ক্ষিতিপালনায় দধত দেহে বিভক্তাং শ্রিয়.
শ্রীমন্তং জনয়ত তনয়ং নারায়ণ স প্রভুং।
যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি পীঠোপল
ন্যায়োপাত্তং অলঙ্কার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসন ॥ ৩

ভাগলপুরের তাম্রশাসন রাজা নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত বিধায়, অতঃপর ১১-১৭ শ্লোকে নারায়ণপালের প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই তাম্রশাসন অনুসারে 'শ্রীনারায়ণপালদেবম সৃজৎ তস্যাং স পুণ্যোত্তর' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ( ) চিহ্নের অন্তর্গত চারিটী অতিরিক্ত শ্লোক ভাগল পুরের শাসনপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।

তাপা—জলধিমলগভীরাভে
দেবালয়শ্চ বলভূতবন্তুস্য কম্পে।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইত্যবনিলোকপাল.॥ ৭
তস্য—বশিতি—নিধিরিব সহসা রাজাকুটা পে -
পুজ্যস্যোত্তুঙ্গমৌলে দুহিতরি তনযো ভাগদেবা
প্রসূত।
শ্রীমান———ভবা নৈকবত্র—
——তিথবিতবর্গঃ সি—বিগ্রাংশুকয়োঃ॥ ৮
যঃ স্বামিন রাজ্যংশৈবত্বমাসেরত
————প্রভুশক্তি লক্ষ্মী
পৃথ্বীং সপত্নীমিব শিলপত্র॥ ৯
তস্মাদ বভূব সবিতু র্বসুকেটিবর্ষী
কালেন চন্দ্র—ব বিগ্রহপালদেব.।

—পেন বিমলেন কলাংশদেন
আবিভিতন পনিতো ভুবনস্য তাপ॥
ভবসকলবিলক্ষ সঙ্গরে বা প্রদশং
অনধিকৃতবিলগ্নং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং
———— পদম্ মা ভূৎ
—বনিপাল শ্রীমহীপালদেব॥ ১
তজন তোপসঙ্গ শিবসি কৃতপাদং
ক্ষিতিভৃতা বিবর্ণে সর্ব্বনাং প্রসভ – বির ববিং।
ভব—ন্ন স্নিগ্ধপ্রকৃতিবনুরাগো—বসতিস্ম
রাধন্য প্রাপ বজনি নয়পালো নরপতি॥ ২
পিত সঙ্গনলে বনিং স্মরবিপো পত্র
— -বিশামে—ধিকারিভবন ক কৃতে বিদ্বিষাং।
মন্বৎ দয়মাশ্য শিবপাস—পেপ্সণ—ন্দবন
শ্রীমদ বিগ্রহপালদেব নৃপতি ——— ॥ ৩
কুন্দসান্দ্রেকর পত্তত্যাপীকর ——— ॥ ৪

ইহা হইতে পাবর য গোপালদেব ধর্ম্মপাল ও রাবপাল নরপাল ও ভয়পাল বিগ্রহপাল নারায়ণ পাল রাজ্যপাল শ্রী-পাল বিগ্রহপাল মহীপাল, নয়পাল ও বিগ্রহপাল— এই একাদশ জনের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে। নারায়ণপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ সম্বন্ধেই বিষম মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তার হারনলি ৭—১৪ শ্লোকে উল্লিখিত নামাবলী পুনরুক্তি মাত্র বলিয়া রাজা নারায়ণ পালের উত্তর পুরুষ ছয় জন রাজার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিতে চাহেন। তাঁহার মতে দেবপাল ও নয়পাল, বিগ্রহপাল ও সুরপাল, মহীপাল ও ভূপাল অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি রাজ্যপালকে দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহীপালের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান অনুসারে ৯০৬—১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর কাল গোপাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত ছয় জন রাজা বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন।

ছিলেন। এই শাসনপত্র বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ৯ই চৈত্র তারিখে পোসলী গ্রামবাসী মহীধরের পুত্র শশীদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হয়।

পোসলীগ্রামনির্য্যাত শ্রীমহীধরসূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীশশীদেবশর্ম্মণা॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে, মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) বিগ্রহ পালের শাসিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শাসন পত্রে বৌদ্ধ গোপাল দেব পাল বংশের আদিম পুরুষ ও প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ধর্ম্ম পাল ও বাক্‌পাল নামে গোপাল দেবের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতিকে পরাজয় করেন বলিয়া ভাগলপুরের শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ বাক-পাল স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনাধীনে প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক নানা দেশ জয় করেন। অপুত্রক ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর বাক্‌পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপাল স্বীয় পিতৃব্যের স্থলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। দেবপাল পাল বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পালের প্রতি রাজ্য শাসনের গুরুভার অর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। মুঙ্গেরের তাম্রফলকে বর্ণিত আছে যে, দেবপাল হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদূর কাম্বোজ রাজ্য পর্য্যন্ত আপনার শাসন প্রভাব বিস্তার করেন। ভাগলপুরের শাসনপত্র অনুসারে তিনি উৎকল (উড়িষ্যা) ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম কি আলাহাবাদ?) রাজ্য আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতেও লিখিত আছে যে, গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হূনদিগের দেশ ভুজবলে পদানত করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত সুরপাল ও দেবপাল এক অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। দেবপালের পর তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগলপুরের শাসন পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, রাজা বিগ্রহপাল হৈহয় বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পাল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে নারায়ণ পাল কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই বিধায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজাকূটা (রাষ্ট্রকোটা?) পতির তনয়া ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। রাজ্যপালের পর তাঁহার অজ্ঞাত নামা পুত্র এবং তদনন্তর তাঁহার পৌত্র বিগ্রহপাল, (দ্বিতীয়) রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁহার পুত্র মহীপাল, তৎপর মহীপালের পুত্র নয়পাল, তদনন্তর নয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) স্ব স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই তৃতীয় বিগ্রহপালই আমগাছির শাসনপত্রে উল্লিখিত ভূমি খোভূত (?) দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। এই শাসনপত্র হইতে পালবংশীয় একাদশ জন বিভিন্ন নৃপতির নাম জানা যাইতেছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তার হারনলি সাহেবের মতে ইহা হইতে গোপাল হইতে নারায়ণ পাল পর্য্যন্ত মাত্র ছয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র ভাগলপুর হইতে রাজা নারায়ণ পালের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম শ্লোক আমগাছির শাসন লিপিতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়েকখান প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সম্পূর্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনপত্রের দ্বারা বিগ্রহপালের পুত্র পরম সৌগত (বৌদ্ধ) রাজা নারায়ণ পাল তাঁহার রাজত্বকালের সপ্তদশতম বর্ষের ৯ই বৈশাখ তীরভুক্ত (ত্রিহুত) প্রদেশের অন্তর্গত মকুতিকা নামে গ্রাম পাশুপত আচার্য্যের শিষ্য শিব ভট্টারককে প্রদান করেন। নারায়ণ পালের মন্ত্রী বেদ বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভট্ট গুরব মিশ্র ইহা রচনা করেন। সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র সুলেখক মদাদাস কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পাল রাজগণের শাসিত অঙ্গরাজ্য* পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বভাগে সমতট (বামপাল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিহুত পূর্ব্বকালে তীরভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। মুদ্গাগিরিতে (মুঙ্গের) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী থাকিলেও পালরাজগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ব্ববিধ প্রজাবর্গকে সমভাবে পালন করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মাননা ও সমাদর করিতেন, এবং উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারিলে উচ্চতম রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুপ্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে শাসন করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, বলি ও দেবপূজাদি বহুবিধ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর্গকে ভূমি দান করিতেন, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অধিকৃত রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে জলাশয় খনন, অতিথিশালা ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের উপকার সাধন করিতেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* ভঙ্গীক্রমে অঙ্গরাজ্যের নাম এই শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

স্বীকৃতঃ সুজনমনোভিঃ, সত্যান্বিতঃ সহবাহনৈ. স্বীয়ৈঃ।
ত্যাগে ন যো স্মধত্তাশু, দেযং মেহঙ্গ রাজন কথা॥ ১২
শ্রীপতিরকৃষ্টকর্ম্মা বিদ্যাধরনায়কো মহাভোগী।
অনলসদৃশোঽপি ধাম্না যশ্চিত্র' নলসমঞ্চরিতৈঃ॥ ১৩

রাজা নারায়ণ পাল বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতগণের আশ্রয় স্থল ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গুরব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা ভাগলপুর ও বুদ্দলের শাসন লিপিদ্বয়কে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

বেদান্তৈরসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরম সার্দ্ধমঙ্গৈরপীতি।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত মহাভুক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

সুমুখী।

নাট্য কবিতা

প্রথম অঙ্ক।

(স্থান স্বর্গ—কৈলাস ধাম)

উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

জয়া।—দেবিগো, আনন্দময়ি, জগত-জননি,
বল শুনি কেন আজি বিরস বদন?
নয়ন-কৌমুদী ম্লান কেন ত্রিনয়নি?
দীপ্তভালে চিন্তা কেন করে সন্তরণ?

উছলিত সুধারাশি, শুকায় অধরে,
একি কীট, একি ছায়া, পশিল অন্তরে?
উমা।—সখীরে, সুধাও কেন কি দুঃখ উমার,
দেবত্বের সুখ বুঝি ঘুচিল তাহার।
আহারে জনক যার, পাষাণ, অচল,—
নহিল পরাণ তার নির্ম্মম নিশ্চল,
এই ক্ষোভ, এই দুঃখ উথলিছে বুকে,
কি কাজ জিজ্ঞাসি আর? তোরা থাক্ সুখে।
জয়া।—আতঙ্কে কাঁপে যে প্রাণ ওগো মহেশ্বরী,
আতঙ্কে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য করে টলমল,
একবার ক্রোধে ধ্বংশ হল দক্ষপুরী,
যেতেছিল সুরপুরী প্রায় রসাতল,
আবার কি ক্ষোভ আসি গ্রাসিছে পরাণী?
সম্বর এ অভিমান, ত্রৈলোক্য তারিণি।
বিজয়া। আহা মরি, মহেশ্বরী কি দুঃখ তোমার?
ত্রিদিব পূজিতা তুমি, ও রাঙ্গা চরণ,
কে আছে ত্রিলোকে যে না ধ্যায় অনিবার?
সুরনর সবারি যে তুমিই শরণ।
হের ওই মর্ত্ত্যলোকে নরনারী শত,
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পহারে পূজিছে তোমার,
যুক্ত করে নম্রশিরে স্তুতি গায় কত,
কতই দিতেছে ভক্তি প্রীতি উপহার।
ইন্দ্রের ধেয়ানে তুমি শচী তব পায়;
চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ তবগুণ গায়,
ওই শুন, ওই শুন, ডমরুর স্বরে,
তোমারি প্রেমের গীতি শিব গান করে।
উমা।—একি শ্লেষ, একি নিন্দা, একি অপমান।
এই কিরে প্রিয় সখি উচিত তোমার?
চাইনা নরের পূজা, চাইনা সম্মান।
প্রসন্ন নরের ভাগ্য দুঃখ দেবতার।
মানুষীর প্রেম-ধ্যানে মত্ত মহেশ্বর;
মহেশের মহেশ্বরী, উমা আর নয়!
আঁধার ছাইছে যেন কৈলাস শিখর;
প্রদীপ্ত, অনন্দপূর্ণ, আজি লোকালয়।
তুচ্ছ ঘৃণ্য নরকের ধূলায় গঠিত,
ক্ষুদ্র মানুষীর শোভা এত মনোহর,
ভুলিয়ে দেবত্ব যাহে হ'ল বিমোহিত,
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা পরম ঈশ্বর।
একপ যৌবনে মোর মোহ আর কই?
নরত্বে দেবত্বে ভেদ ঘুচিয়াছে সই।
জয়া।—বিষাদে পূরিছে প্রাণ, উপজে বিস্ময়।
কে গো সে মানবী দেবি, এত রূপ কার?
পেয়ে যাবে, জগন্ময়ি, তোমার প্রণয়
তেজিয়ে, করেন শিব মরতে বিহার?
উমা।—হের ওই মর্ত্ত্য লোকে ভারত উত্তরে,
আমার পিতার নামে নামাঙ্কিত গিরি,
ওরি পাদদেশে রাজ্য, "কোঁচ" নাম ধরে,
বহিতেছে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা যারে ঘিরি।
জয়া।—আমরি কি চারুদেশ, সৌন্দর্য্যে অতুল।
মরতে নন্দন বলি মনে হয় ভুল!
ছোট খাট দেশ খানি বেষ্টিয়া হেথায়,
সুরম্য কানন রাজি কিবা শোভা পায়।
বিজয়া।—(জয়ার প্রতি) শোভার মাথায় বাজ,
কি দেখিছ ছাই?
(উমার প্রতি) বল দেবি, একি দৃশ্য দেখিবারে
পাই?
ওইযে কানন পারে সুন্দর নগরী,
দিবাসে ও কেন ওরে ব্যাপিয়ে শর্ব্বরী?
জয়া।—তাইতো, তাইতো সই, একিরে বিস্ময়।
নাজানি হবে বা হোথা কি মহাপ্রলয়!
রবির প্রদীপ্ত তেজে দীপ্ত ধরাতল,
কেন অন্ধকার হোথা ছেয়ে অবিরল?
উমা।—দেখিতেছ যে নগরী অন্ধকারময়,
ওইতো গো সখি, কোঁচ-রাজ রাজধানী,
হোথায় পাইছে শোভা রাজার আলয়,
সে আলয়ে আছে এক দ্বিতীয়া ভবানী।
সুমুখী রাজার মেয়ে, অনূঢ়া ষোড়শী,
তাহারি প্রণয়ে মত্ত দেব মহেশ্বর।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাই এ হেন রূপসী,
সৃষ্টির চরম নাকি ধরণী ভিতর।
পাছে কেহ স্বর্গপথে দেখিবারে পায়,
তাই দেব মায়াবল করিয়া বিস্তার;
ঢাকিয়া নগর খানি আঁধারের ছায়,
আনন্দে সদাই হোথা করেন বিহার!
আঁধার, প্রলয়-চিহ্ন নহে লো সজনি,
আছে হোথা চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী।
বিজয়া।—জগৎ আরাধ্যা তুমি, সুর নর-মাতা,
নরলোকে হবে দেবি, তব অপমান?
আজ্ঞা দেহ, পৃথ্বী বুকে বসাইয়া জাতা,
ধূলার ধরার করি বিনাশ বিধান।
কি ছার সে তুচ্ছ ধরা? তোমার ঈঙ্গিতে,
ধূলি-চক্র কেন্দ্র রবি, যাবে রসাতলে,
বুধ, গুরু, শনৈশ্চর নিবিবে চকিতে;
আজ্ঞা দেও সৃষ্টি ধ্বংশ করিব সবলে!
তোমারি বিনষ্ট রিপু অসুরের মেদে
জনমিল যে মেদিনী, তারি কীটগুলি,
—একিরে একিরে স্পর্দ্ধা মরে যাই খেদে—
তোমারে করিবে তুচ্ছ, গর্ব্বে মাথা তুলি?
ছিঁড়ি আকর্ষণ সূত্র, ফেলি পৃথ্বী ছুঁড়ি
অগ্নিময় সূর্য্যগর্ভে, যাক্ যাক্ পুড়ি!
তুমি যদি অপাঙ্গেতে চাহ ক্রোধভরে,
কার সাধ্য রাখে সৃষ্টি বলহে রুদ্রানি,
শিবের(ও) ত্রিশূল দেবি, টল মল করে;
তোমারি বলেতো বলী দেব শূলপানি।
উমা।—বিজয়ারে প্রিয় সই, ছিছি একি বাণী!
হলি কিরে আত্মহারা ক্রোধে অভিমানে?
ত্রিলোক পূজিত তিনি দেব শূলপাণি,
এ অনন্ত চারু সৃষ্টি যাঁহার বিধানে,
সর্ব্বলোকে পূজনীয় ত্রিশূল তাঁহার,
রয়েছে অনন্ত লোক যাহার আশ্রয়ে,
ভ্রমেও তাহার নিন্দা করিস্‌নে আর
প্রবেশিবে মহাপাপ ত্রিদশ আলয়ে।
আমারি কপাল পোড়া নিন্দ মোরে সই,
শিবের হউক সুখ, মোরা দুঃখে রই।
বিজয়া।—সত্য দেবি, অপরাধ হয়েছে আমার,
কিন্তু কি গো করিব না কিছু প্রতীকার?
তোমারে করিয়া তুচ্ছ, হে দেবি সর্ব্বাণি,
কার সাধ্য হবে ভবে ভবের ভবানী?
উমা।—যাহা খুসী প্রিয় সই, কর্ তোরা তাই;
সন্ন্যাস কুটীরে আমি শিব ধ্যানে যাই।
ধন্যরে ধূলার ধূলা মানুষী সুমুখী,
যার রূপে, যার প্রেমে মহেশ্বর সুখী!

(প্রস্থান)

বিজয়া।—দেবীর সেবায় জয়া কর লো গমন!

(জয়ার প্রস্থান)

মর্ত্ত্যলোকে যাই আমি দেখি একবার;
দেখি সে কুঁচুনী মাগী রূপসী কেমন!
যাই যাই, সুমুখীর সাধিগে সংহার।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(সুমুখীর প্রমোদ ভবন)

সুমুখী।—এখনো কাঞ্চন শৃঙ্গ আলোকে ভাস্বর,
এখনো গেলোনা সূর্য্য অস্তাচল গায়!
এখন তো জনস্রোতে পূর্ণ এ নগর;
এখনো আকাশে—কই? দেখা নাহি যায়!
কি দীর্ঘ দিবস! ধৈর্য্য মানে না হৃদয়!
কার পদশব্দ শুনি! না না কিছু নয়।
(সুমুখীর প্রাচীনা ধাত্রীর বেশে বিজয়ার প্রবেশ)
বিজয়া।—(স্বগত) পুড়ুক কপাল তোর; যাও ছারখার!
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, চিনিতে মোরে পার কি এখন?
সুমুখী।—একি স্বপ্ন? ওমা একি, ধাই মা আমার?
তাইতো গো আয় আয় করি আলিঙ্গন।

বিজয়া।—কবে মরি কবে বাঁচি, ভাবিলাম তাই,
একবার সুমুখিরে, তোরে দেখে যাই !
সুমুখী। ভালতো গো ছিলি তুই ? দেশের মঙ্গল?
প্রাক্‌জ্যোতিষপুর হতে আসিলি কখন ?
জানিতে কত কি কথা হৃদয় চঞ্চল !
বসিয়ে করগো আগে শ্রান্তি বিনোদন।
হয়েছিস্ বড় বুড়ী, ধাই মা আমার !
তাইতো গো একটীও দাঁত নাই আর ?
বিজয়া।—কত দিন থাকে কার নবীন যৌবন ?
চঞ্চল জগৎ, হেথা দুঃখ পরিণাম।
লাবণ্য, সুরূপ, সে তো দুদিনের ধন,
তার পড়ে ভেঙ্গে পড়ে এ দেহ সুঠাম।
শরতে অদ্রির শোভা ছিল কি সুন্দর।
এ শীতে সকলি হের হয়ে ছ অম্বর।
(হিমাচলকে লক্ষ্য করিয়া)
কাল দেখেছিনু ওর এলো চুলগুলি,
প্রেমের এলান কেশ গুচ্ছের মতন ;
দীপ্ত নীলাকাশ তলে ছিল মাথা তুলি
যেনরে অক্ষয় বীর পুরুষ সুজন।
আজি গো মস্তক তার অমল ধবল,
ঝলিছে তুষার, শুভ্রতায় রৌপ্য জিনি ;
এ জরা তাহার শিরে, ঝাড়িয়া অঞ্চল
দিয়াছে সে মৃত্যুময়ী হিম নিশিথিনী।
নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রে বাঁধা এক সাথে,
আছে দুই জন তারা বার্দ্ধক্য যৌবন।
দিন বর্ষ আছে সবে ধরি হাতে হাতে,
ক্ষুদ্র এক স্বপ্ন মাত্র মধ্যে ব্যবধান।
সুমুখী।—আগেতো শুনিনি ধাই কখনো এমন ?
এত তত্ত্ব কথা তুই শিখিলি কোথায় ?
বিজয়া।—সুমুখিরে আছে তোর নবীন যৌবন,
তোর রূপে দেবতারো মন ভুলে যায়,
তাইতো এ তত্ত্ব কথা তিক্ত লাগে কাণে।
শিব শিব। সুখ, আশা, থাক্ তোর প্রাণে।
একি দেখি সুমুখীরে, শিব নাম শুনি,
গণ্ডে কেন ব্রীড়া তোর সঞ্চরে অমনি ?
সুমুখী।—(স্বগত) একি দায় ! পোড়া প্রাণ
সামালিতে নারি !
(প্রকাশ্যে) থাক্ ছাই, এস ধাই অন্য কথা
পাড়ি।
তোদের দেশের বল্ সবতো মঙ্গল ?
রাজা রাজপরিবার তাঁদের কুশল ? [পুবে,
বিজয়া।—অতি বৃষ্টি মহামারী প্রাক্‌জ্যোতিষ-
আসে না বিদেশী কেহ থাকে দূরে দূরে।
বাণিজ্য ব্যবসা সব হল লুপ্ত প্রায়,
উঠেছে রোদন ধ্বনি দেশ যায় যায়।
নিশি দিন হোম যাগ শিব আরাধনা,
তবুও গণ্ডনা গ্রহ বড় বিড়ম্বনা।
যাজক ব্রাহ্মণ শেষে কহিল রাজারে,
কোঁচরাজ্যে শিব নাকি, ফেলিয়া কান্তারে
বিহার করেন নিত্য ; তাই নাকি আর
পৌঁছেনা কৈলাসে ভক্তি পূজা উপহার।
তাই মোরা আসিয়াছি পূজিতে হেথায়,
দেখি তাহে এ দুদ্দিন যায় কি না যায় !
সুমুখী। যাও সবে দেশে ফিরে শঙ্কা নাই আর,
নিরাপদ হবে দেশ কহিনু তোমার।
এই দণ্ডে প্রাক্‌জ্যোতিষ শিবের কৃপায়,
নিরাপদে পাবে স্থান শান্তির ছায়ায়।
বিজয়া।—তবে কিলো সত্য তাই, লোকে
যাহা বলে ?
ওকি লো ঢাক যে মুখ সহসা অঞ্চলে ?
তোমারি প্রণয়ে শিব মজেছে সুমুখি ?
সুখে থাক, সুখে থাক, শুনে হনু সুখী।
কিন্তু এক শঙ্কা মোর হতেছে পরাণে ;
মহারুদ্র রূপ তাঁর পুরাণে বাখানে।
কেমনে মানুষী হয়ে তাঁহারে লইয়া
হয়েছ সুখিনী তুমি মরিলো ভাবিয়া। [ধাই!
সুমুখী।—শোন্ শোন্ তবে কথা কহি তোরে
অমন মধুর রূপ চক্ষে দেখি নাই।

তরুণ যৌবন তাঁর কান্তি মনোহর,
নিয়ত উষার রাগ কপোল উপর!
প্রণয়-মদিরা বশে আঁখি ঢল ঢল,
সুধার তরঙ্গ যেন অধরে চঞ্চল।
হাসির জ্যোছনা খেলে শ্রীমুখে সদাই,
কি যে সে সুঠাম দেহ বর্ণিব কি ছাই।
সে অঙ্গ পরশ মাত্রে অবশ হৃদয়,
সে রূপ দেখিলে বল কার হয় ভয়?
বিজয়া।—মায়াময় মহেশ্বর; তাই তবে হবে,
ধরিয়ে মানব বেশ বিহরেন ভবে।
কিন্তু তিনি মহাদেব, জানিলে কেমনে?
প্রকাশ দেখেছ কিছু স্বরূপ লক্ষণে?
সুমুখী।—দেখি নিত্য যোগাসনে আসিতে হেথায়,
আসিবার পূর্ব্বে শুনি ডমরুনিনাদ,
অদৃশ্যে সতত নন্দী সঙ্গে তাঁর যায়,
শুনেছি হেরিলে তারে ঘটয়ে প্রমাদ।
আর (ও) শুন; আগমন করেন যখন,
পাদস্পর্শে ধরে ধরা, নব শোভা রাশি,
অন্ধকারে আলোকের করেন সৃজন,
জ্যোছনায় অমানিশা ফুটে পড়ে ভাসি।
বিজয়া।— সুমুখি, বালিকা তুমি, জাননা বিশেষ,
সহসা মনেতে মোর শঙ্কা উপজিল।
মনিপুর রাজপুত্র ধরি ছদ্ম বেশ,
অবশেষে আসি হেথা তোরে কি ছলিল?
ভেল্কিবাজী জানে সে যে বড় যাদুকর,
শুনেছি তাহারো রূপ বড় মনোহর।
ছলেছে অনেক নারী প্রাকজ্যোতিষ ধামে,
নারীর সতীত্বনাশ ব্যবসা তাহার।
শুনিযাছি চারিদিকে ফেরে শিব নামে,
যাদুবলে করে নিত্য আকাশে বিহার।
নিতান্ত সে নীচজাতি মনিপুর বাসী;
সেই কি সতীত্ব তোর গেলরে বিনাশি?

সুমুখী।—শুনে যে কাঁপেরে প্রাণ ওগো মা আমার!
তাইত! কেমনে আমি বুঝিব বলনা,
সত্য কি না মহাদেব এ কণ্ঠের হার,
অথবা কলঙ্ক মাত্র,—কেবল ছলনা।
দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ, ধর মোরে ধর,
চেতনা মিলায় যে গো বক্ষ মোরে হর।
(মূর্চ্ছা)
বিজয়া।—হর তুমি সেই মোর একান্ত বাসনা।
(সুমুখীর মূর্চ্ছাভঙ্গ)
শিব বলে পেল বুঝি আবার চেতনা।
সুমুখী।— উঠিয়া এখন বল্‌লো তুই কি করি উপায়?
না জানিয়া না বুঝিয়া ঘটিল কি দায়।
বিজয়া।—ভয় নাই ধৈর্য্য ধর, কে বলিতে পারে,
হয়ত সত্যই শিব প্রণয়ী তোমার।
পরীক্ষা করিয়া তুমি লইবে এবারে,
সহসা দিওনা স্থান নিকটেতে আর।
এখন আসিলে, আগে করি অভিমান,
কহিওনা কোন কথা; রেখো দূরে তারে;
তার পর, যখন সে হোয়ে আগুয়ান
প্রণয় বচনে আসি তুষিবে তোমারে,
করিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দিতে পরিচয়
পার্ব্বতীর নামে, শেষ অঙ্গীকার হলে
কোরো তাঁরে পীড়াপীড়ি দেখাতে নিশ্চয়,
কপালে নয়ন তাঁর জ্বলে কি না জ্বলে।
অন্য কোন চিহ্নে তুমি ভুলনা কখন;
যাদুবলে যাদুকর কত কি না পারে,
কিন্তু সাধ্য আছে কার ধরে ত্রিনয়ন?
সেই গো নিশ্চিত চিহ্ন কহিনু তোমারে।
হেরিলে কপালে তাঁর সে দীপ্ত নয়ন,
"ভয়পারে মো'রে যাবে" বলিতেও পারে।
কিন্তু সে কথায় দেখো ভুলনা কখন।
মরণ কি হয়, মৃত্যুঞ্জয় রক্ষে যারে?
সুমুখী।—ঠিক বলেছিস্ তুই অহাই করির,

নতুবা, না জানি চিত্ত, কেমনে সঁপিব ?
সত্য হৌক অথবা গো মিথ্যা ছলনায়
অর্পিয়াছি প্রাণ মোর মহেশ সেবায়,
অজ্ঞাতে কলঙ্ক যদি ছুঁয়েছে তাহার,
বিষ পানে, শিব নামে, করিব সংহার।
বিজয়া।—(স্বগত) ধরেছে ঔষধ মোর আর
চিন্তা নাই!
যা হবে বুঝেছি শেষ এখন পালাই।
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, বিদায় দে গো যাই মা
নগরে,
প্রভাতে আসিব তোরে দেখিবার তরে।
(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

(স্বর্গপথে মহাদেব সুমুখীর গৃহের দিকে
অবতরণ করিতেছেন; সঙ্গে নন্দী)

মহাদেব।—নন্দি।
নন্দী।—প্রভু!
মহাদেব।—কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি ?
ডাকিছে আমারে আজি কে সে অসহায় ?
নন্দী।—দেবদেব! পতি হারা কাঁদিছে রমণী,
করিছে তোমার নাম লুটায়ে ধূলায়।
মহাদেব।—দ্রুত যাও, পতি তার দেও বাঁচাইয়া,
জগতে বিচ্ছেদ জ্বালা সহিবে না কেহ,
স্বয়ং ঈশ্বর যদি প্রণয়ে মজিয়া
ধূলার জগতে আসি করিলেন গেহ!
নন্দী।—যে আজ্ঞে চলিনু তবে! (প্রস্থান)
মহাদেব।—(সুমুখীর গৃহে অবতরণ করিয়া)
সুমুখি, কোথায় ?
নিত্য দেখি অপেক্ষিয়া থাকে দরজায়!
আদরেতে আগুসারি হাসি ভরা মুখে,
প্রেমময় বাহুপাশে বাঁধে মোরে বুকে।
কৈ গো আজি তো তারে দেখিতে না পাই;
সুমুখি! সুমুখি! নাগো হেথায় তো নাই।
অসুস্থতা ? অমঙ্গল ? সম্ভবে না কভু,
স্বয়ং মঙ্গলদাতা শিব যার প্রভু।
মহেশ্বরী অভিমানে বধেছেন প্রাণ ?
দেবতার বক্ষে কম্প!! করিব সন্ধান।
সুমু...।

(সুমুখীর প্রবেশ)

এইত মোর চাঁদের উদয়।
শশাঙ্কশেখর যারে শিরে তুলে লয়।
(অবনত মুখে সুমুখীর পরিভ্রমণ)
ধরায় কৈলাস তুমি, ভবানী, শঙ্করী,
কাছে এস—
সুমুখী।—যাও যাও!
মহাদেব।— একি গো সুন্দরি!
সুমুখি, তোমার মুখে একি শুনি বাণী;
কাছে এস, কাছে এস, হৃদয়ের রাণী!
(সুমুখীর দূরে গমন)
অহো, আজি সৃষ্টি কিরে নিবিবে নিমেষে!
সুমুখি! চিনিতে তুমি পারনা মহেশে ?
সুমুখী।—থাম, শঠ প্রবঞ্চক।
মহাদেব।—সুমুখি আমার!
সুমুখী।—যাও যাও!!
মহাদেব।—আমি শিব চরণে তোমার।
সুমুখী।—তুমি শিব? ছিছি তোর হয় না শরম?
জন্ম লয়ে রাজবংশে এমন ধরম ?
সতীত্ব নাশের পাপে, মনিপুর পতি।
করিবেন শিব তোর নিরয়েতে গতি!
মহাদেব।—(সগৌরবে) হের বিশ্ব পদতলে
ঘুরিছে আমার।
আমি মনিপুর-পতি? কি কথা তোমার ?
সুমুখী।—পাপ! পাপ! মহাপাপ! বলিও না
আর!
মহাদেব।—এ কি ভাষা! এ কি স্বপ্ন দেখিছ
মায়ার ?
সুমুখী।—মায়ার স্বপন বটে! ঠিক কথা তাই!

(ঊর্দ্ধে চাহিয়া) এ কিবে কুহকে মোর ফেলিলে গোঁসাই!
যাও যাও, দূরে যাও, যা হবার হলো;
করিলাম ভ্রমে সুধু কলঙ্ক সম্বল—
নারীর সতীত্ব রত্ন কেনই হরিলে,
শিব নামে মোরে তুমি কেনই ছলিলে?
মহাদেব।—শিবত্বে সন্দেহ ধনি, হয়েছে তোমার?
সুমুখী।—সত্য যদি শিব তুমি হইতে আমার!
আহারে যৌবন মোর সঁপিযাছি শিবে!
যদি তুমি শিব নহ, সুমুখী মরিবে।
মহাদেব।—বল ধনি কি করিব দিতে পরিচয়?
সুমুখী। প্রতিজ্ঞা "পার্ব্বতী নামে" কর মহাশয়।
যা সুধাব যা বলিব করিবে গো তাই।
মহাদেব।—(স্বগত) কে শিখাল এ প্রতিজ্ঞা, একিরে বালাই!
অঙ্গীকার না করিলে ক্ষুব্ধ হবে প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) ভাল, করিলাম দিব্য পার্ব্বতীর নামে।
সুমুখী।—পুরাণে তন্ত্রেতে উক্ত শিব ত্রিনয়ন।
কপালে তৃতীয় চক্ষু দেখাও এখন।
মহাদেব।—(বিষাদে) সুমুখী ধরিগো পায়, ক্ষমা কর মোরে;
এমন দুর্ব্বুদ্ধি বল কে দিয়াছে তোরে?
পার্ব্বতীর নামে করিয়াছি অঙ্গীকার,
সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, ভাঙ্গিব আবার।
করলো সুমুখি তুমি অন্য আবদার,
সে চক্ষু দেখিলে তুমি যাবে ছারখার।
দেখ চেয়ে গ্রহ তারা আমার ইঙ্গিতে,
জ্যোতিহীন ম্রিয়মান হয়েছে চকিতে,
ঐ দেখ রজনীতে হল সূর্য্যোদয়,
ইথে কি সন্দেহ আর, পেতে পরিচয়!
সুমুখী।—যাদুকর, যাদুবলে পারে সমুদয়,
ইহাতে কিছুই মোর না হয় প্রত্যয়!
বরংসন্দেহ বড় জনমিল প্রাণে।
দেবতা কি সুখ আশে আসিবে এখানে?
স্বরগে শঙ্করী সদা সাথে সাথে যাঁর,
নিজসৃষ্ট কীট প্রেমে কিহবে তাঁহার?
মহাদেব।—জাননা প্রেয়সি তুমি রহস্য ইহার;
চিত্রকর মগ্ন হয় চিত্রে আপনার।
আপনি গড়িয়া মূর্ত্তি আপনি পাগল,
হয়েছে জগতে শ্রেষ্ঠ ভাস্করের দল।
সুমুখী।—কি কাজ সে কথা শুনি? হৃদয় চঞ্চল,
দেখিতে কপালে সুধু চক্ষু সমুজ্জ্বল।
মহাদেব।— আতঙ্কে কাঁপিছে বক্ষ, সুমুখি আমার।
ছাড় এ কুমন্ত্র, কর অন্য আবদার।
সুমুখী।—হইলে প্রতিজ্ঞাচ্যুত, চলিলাম আমি।
(যাইতে উদ্যত)
মহাদেব।—আজিকি সঙ্কটে হায় ত্রিভুবনস্বামী,
সুমুখি! নিয়তি বল, কে খণ্ডিতে পারে।
অক্ষম রক্ষিতে আজি দেবতা তোমারে।
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সাধ্য কি খণ্ডিব?
এস, এস, যাহা চাও তাই দেখাইব।
হায়, হায়! সুমুখিরে, ফলিল কি ফল!!
এইদেখ দীপ্ত ভালে চক্ষু সমুজ্জ্বল!
(ত্রিনেত্র প্রকাশ—এবং সুমুখীর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া পতন)
(বিষাদে অন্তরীক্ষে মহাদেব; মৃতপুরুষের জীবনদানের সংবাদ লইয়া নন্দী উপস্থিত)
নন্দী।—দেব দেব। আজ্ঞাক্রমে জীবন সঞ্চার করিয়াছি নবদেহে। কি করিব আর?
মহাদেব।—যাও যাও, দ্রুতবেগে যাওগো আবার,
ফেল তারে মৃত্যু-মুখে বাঁচায়েছ যার!
অযুত যুবতি-পতি আরো কর বধ,
ছাড়াও পৃথিবীময় বিচ্ছেদ বিপদ।
বিচ্ছেদে কাতর যদি ত্রিভুবনেশ্বর,
বিয়োগ বিধুর তবে হোক্ নারীনর।
(উভয়ের প্রস্থান)
(যবনিকা পতন)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ছাটীয়ার জন্ম ষষ্ঠী।

বাপের পারিশ (গোত্র) মত ছেলের পারিস হয়, মার মত হয় না। যে গ্রামে সন্তান হয়, সে গ্রাম অশুদ্ধ হয়। শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূজা পর্ব্ব কিছু হয় না। পুত্র জন্মের পাঁচ দিবস পরে এবং কন্যার তিন দিবস পরে শুদ্ধ স্নান করিতে হয়। সেই দিন ছেলের বাপ গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে। সকলে আসিলে নাপিত প্রথমে পুরোহিত (পৃঝার), তাহার পর তন্ত্রধার (কুড়াম নায়কি) মোস্তাজির পরামাণিক, যোগ মাঝি, যোগ পরামাণিক ও গোডাই তকে ক্রমান্বয়ে কামাইয়া শেষে গ্রামের অন্য সকলকে কামাইয়া ছেলেকে কামাইয়া দেয়। দাই দুইটা দোনা (পাতের চোঙা) লইয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দ্বারে বসে। একটা দোনায় জল, অন্যটায় ছেলের মাথার চুল থাকে। কামান শেষ হইলে যে তীরে ছেলের নাড়ী কাটা হয়, দাই সেই তীরে দুটা সুতা বাঁধিয়া দেয়। তখন ছেলের বাপ দোনায় তেল লইয়া পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিয়া আসে। তাহারা ফিরিয়া আসিলে দাই তেল হলুদ সুতা বাঁধা শর লইয়া সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্নান করিতে যায়। ঘাটে গিয়া দাই চুলের দোনা ও একটা সুতা ভাষাইয়া দেয় এবং ঘাটে পাঁচ ফোঁটা সিঁদুরের দাগ দেয়। ইহাকে ঘাট কেনা বলে। অন্য সুতা ও শরটী ধুইয়া ঘরে আনে। সেই সুতায় হলুদ মাখাইয়া ছেলের কোমরে দড়ি করিয়া দেয়। ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাই চালের নীচে ছেলে কোলে করিয়া প্রসূতিকে বসাইয়া চালের উপর গোবর জল ঢালিয়া দেয়। সেই জল চোঁয়াইয়া প্রসূতির মাথার উপর পড়ে। কিছু জল হাতে মাথায় ছুঁইয়া দেয় ও কিছু পান করে। তাহার পর প্রসূতি ঘরে গিয়া ছেলেকে খাটিয়ায় শোয়াইয়া দেয়। তখন দাই চালের জল খাটিয়ার কোণে ছিটাইয়া দেয়। এক দোনা লইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমে গ্রামের প্রধানদিগের গায়ে ছিটাইয়া দেয়। এবং আর এক দোনা জল লইয়া পর্য্যায়ক্রমে উক্ত প্রধানদিগের স্ত্রী ও গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকের চক্ষে ছিটাইয়া দেয়। তাহার পর শিশুর নামকরণ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পিতার নামে। দ্বিতীয়ের নাম মাতামহের নামে। জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম পিতামহীর নামে ও দ্বিতীয় কন্যার নাম মাতামহীর নামে হয়। খুল্লতাত মাতুল প্রভৃতির নামে অন্য পুত্রের এবং খুড়া মাসী প্রভৃতির নামে অন্য কন্যার নামকরণ হয়। নাম স্থির হইলে দাই সকলকে দণ্ডবৎ করিয়া শীকারে ও অন্য কর্ম্মে পুত্রকে এবং জল আনিতে ও অন্য কর্ম্মে সেই নামে কন্যাকে ডাকিতে সকলকে অনুরোধ করে। তদনন্তর নীম পাতার গুঁড়া ও চালের গুঁড়া জলে ফুটাইয়া সেই জল পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে বিতরণ করিলে ছাটিয়ার সম্পূর্ণ হয়। তদবধি শিশু কুটুম্বের মধ্যে পরিগণিত হয়। ছাটিয়ারের পাঁচ দিন পরে দাই ও নাপিত দুই জনে মিলিয়া আর একবার ছেলেকে কামাইয়া দেয়। হাড়িয়া (মদ) ভিন্ন সাঁওতালের কোন পর্ব্ব পূর্ণ হয় না। এবং বোঙ্গা বুঙ্গিকে না দিয়া তাহা পান করে না। এজন্য সে কথা স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমুদ্র।

(প্রথম প্রস্তাব)

পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের পরিমাণ প্রায় ১৪,৪৭,১২,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর ৩/৪ অংশের কিছু কম স্থান সমুদ্র কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত।

সমুদ্রের গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে। বঙ্গোপসাগরের যে স্থান দিয়া গঙ্গা পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে, তাহা অতলস্পর্শ না হইলেও যে অত্যন্ত গভীর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত ১৫ বৎসরে সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, সেণ্টটমাস দ্বীপের ১০০ মাইল উত্তরস্থ সমুদ্রই আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর এবং উহার গভীরতা প্রায় ৪৷৷০ মাইল। কিউবিল দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বস্থ প্রশান্তমহাসাগর প্রায় ৫৷৷০ মাইল গভীর, ইহা অপেক্ষা গভীর স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং উহার উচ্চতম শৃঙ্গ প্রায় ৫৷৷০ মাইল উচ্চ। সুতরাং পৃথিবীর গভীরতম স্থান হইতে উচ্চতম স্থানের উচ্চতা প্রায় ১১৷০ মাইল হইল। যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত স্থান দ্বয়ের ন্যায় গভীর সমুদ্র প্রায় লক্ষিত হয় না। সমুদ্রের অল্প ও অধিক গভীরতার গড় ধরিলে উহার সাধারণ গভীরতা প্রায় ৩ মাইল হইবে। তাহা হইলে সমুদ্রের ঘন পরিমাণ প্রায় ৪০,০০,০০,০০০ চল্লিশ কোটী ঘন মাইল হইবে। কিন্তু এই অসীম জলরাশি, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। পৃথিবীকে যদি একটা কমলা লেবুর মত মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার ৩/৪ অংশে তুলি দ্বারা জল লাগাইয়া দিলে যত টুকু জল লাগে, সমুদ্র-জলের অনুপাত তাহা অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান তত্ত্ব এই যে, উত্তর, ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর, ক্যারেবিয়া, ওখটস্ক ও চীন সমুদ্র, বাফিন ও হাডসন্ উপসাগর প্রভৃতির সঙ্গে মহাসমুদ্রের কোন সম্বন্ধই নাই। স্থলভাগের স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়া ঐ সমস্ত সাগর ও উপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা যদি কয়েক শত ফাদাম উচ্চ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল জলভাগ আবার স্থলরূপে পরিণত হইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন কোথাও সমতল ক্ষেত্র বিস্তৃত, কোথাও গভীর গর্ত্ত, আবার কোথাও বা পর্ব্বত শ্রেণী শূন্যে মস্তক উন্নত করিয়া বিরাজ করিতেছে, সমুদ্র তলের অনেক স্থানেও সেইরূপ বিস্তৃত সমতল, গভীর গর্ত্ত ও পর্ব্বত শ্রেণী রহিয়াছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের চূড়া ২৷৩ শত ফিট জলের নিম্নে অবস্থান করিতেছে; আর কতকগুলির উন্নত শৃঙ্গ সমুদ্রের উপরিভাগে দ্বীপরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আজোরজ্, সেণ্ট-

পল, আনেন্সান, ট্রিষ্টান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। যে সমস্ত দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ ভূভাগ হইতে অনেক দূরে সমুদ্র মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা হয় আগ্নেয়গিরি, না হয় সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর প্রবালকীট দ্বারা নির্ম্মিত। সেণ্টহেলেনা, আসেন্সান্, ফ্রেণ্ডলি, স্যাণ্ডউইচ্ প্রভৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সমুদ্রের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রায় সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতই সমুদ্রের উপকূলে, না হয় দ্বীপের উপর অবস্থান করিতেছে, আবার অনেকগুলির শৃঙ্গ সমুদ্র গর্ভেই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতেও সময়ে সময়ে অগ্নিশিখা, গলিত প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিই বাড়বানল নামে অভিহিত হইয়াছে।

নদী ও পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুতরাং পানের উপযোগী; কিন্তু সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহা কিছুতেই পান করা যায় না। সাধারণত, সমুদ্র জলের প্রতিশত ভাগে প্রায় ৩½ ভাগ বিভিন্ন প্রকারের লবণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় ২¾ ভাগ আমাদের আহার্য্য লবণ। সমুদ্র সকল স্থানে সমান লোণা নহে। যেখানে সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, সেখানকার জল অধিক লোণা। এই জন্যই উষ্ণ প্রধান দেশের সমুদ্র অধিক লোণা। এই জন্যেই ভূমধ্য সাগরের জলে কখন কখন শত করা ৪$\frac{১}{১২}$ ভাগ পর্য্যন্ত লবণ পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে যেখানে নদী প্রভৃতি দিয়া প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার জল সমুদ্রে আসিয়া পড়ে এবং সেই সমুদ্রের চতুর্দ্দিক যদি অনেকটা স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহা হইলে সেখানকার জলের লবণের পরিমাণ কম হয়। বল্টিক সাগরের জলে এই কারণে শতকরা ½ ভাগ হইতে ১¾ ভাগের অধিক লবণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণময় পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নদী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। এক সহস্র কলসী সমুদ্র জলের ভার এক সহস্র ছাব্বিশ কলসী নদী জলের ভারের সমান। সমুদ্র জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া জাহাজাদি কোন জলযান সমুদ্রে গেলে অধিক ভাসিয়া উঠে।

সমুদ্র জলে এত লবণ কোথা হইতে আসিল? উহার জল পূর্ব্বে পরিষ্কার ছিল এবং তৎপরে কারণ বিশেষের দ্বারা লবণাক্ত হইয়াছে, অথবা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই উহার জল লবণাক্ত, এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জলের এই একটী বিশেষ শক্তি আছে যে, যে কোন পদার্থ উহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহার কিছু না কিছু অংশ গলিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। কাচ যে এমন কঠিন পদার্থ, তাহাতেও পরিষ্কার জল রাখিলে, কাচের কিয়দংশ গলিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টির জল পর্ব্বতের উপর এবং পৃথিবীর নানা স্থানে পতিত হইয়া, নদী খাল প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রতি বৎসর অসংখ্য নদী দিয়া, নানা প্রকার লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া

পড়িতেছে। এখন হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, নদী দিয়া লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কই আমরা নদীর জল ত তত লোণা দেখিতে পাই না? এ কথার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, নদী জলে লবণ থাকিলেও উহার পরিমাণ অনেক স্থলে এত অধিক নহে যে, অত জলকে বিস্বাদ করিয়া ফেলিবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই লবণের অস্তিত্ব অনায়াসেই দেখা যাইতে পারে। সমুদ্রে যে জল গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ পদার্থ থাকে বটে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে যে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, তাহা পরিষ্কার; সুতরাং যেমন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সমুদ্র জলে লবণের ভাগও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে।

সমুদ্র জল এইরূপে লোণা হইয়াছে, ইহা মানিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির আদিতে সমুদ্র জল লোণা ছিল না, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র জল যে কোন কালে পরিষ্কার ছিল, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়; তাঁহারা বলেন, নদী প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে লবণ যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন আর একটী বিশেষ কারণে সমুদ্র জল এত লোণা হইয়াছে। তাহা এই;—সৃষ্টির আদিতে যখন আমাদের পৃথিবী বাষ্পাকারে অবস্থান করিত, তখন অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সমস্ত জল রাশিও বাষ্পাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তৎপরে ক্রমে ক্রমে যখন এই জলীয় বাষ্পরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখনই বায়ুমণ্ডলস্থ নানা প্রকার লবণ পদার্থের সহিত মিশিয়া লবণাক্ত হইয়া গেল। এই লবণাক্ত জল রাশিই সমুদ্র, সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতেই সমুদ্রের জল লোণা। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকালে সমুদ্র জলে লবণের ভাগ যেরূপ ছিল, এখন নানা কারণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সমুদ্রের পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবী যখন তরল হইতে কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার উপরিভাগ প্রায় এক সমতলে ছিল। সুতরাং জল সমগ্র পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্থলভাগ ছিল না। তৎপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা স্থান বিশেষ উন্নত হইয়া অল্প বা অধিক উচ্চ স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবার বর্ত্তমান সময়ের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানা স্থানের স্তর সমূহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান পাওয়া যায়, যাহা কোনও কালে জলের নীচে ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং জলের নীচে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এই মত সত্য হইলে, পৃথিবীর জন্ম হইতেই উহার উপরিভাগে স্থল ও জল রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, বর্ত্তমান স্থলভাগের অনেক স্থান যে পূর্ব্বকালে জলময় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত হইত। উত্তর মেরু সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি ও সাহারা মরু পূর্ব্বকালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার যেখানে স্থল ছিল, এমন অনেক স্থান সমুদ্র হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত উত্তর, ভূমধ্য সাগর, হাড্‌সন্ উপসাগর প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য।

ইউরোপীয় মহাদেশ।

(২)

বাসগৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

এফেল-স্তম্ভ হইতে উত্তরদিকে বাহির হইয়া দুই ধারে মানব সমাজের আদিম অবস্থা হইতে বাসগৃহের পর্যায়ক্রমে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, (Histoire de L'Habitation de l'homme) তাহা দেখাইবার জন্য প্রায় ১৪ রশি লম্বা ও ২ রশি প্রস্থ স্থান ব্যাপিয়া প্রমাণ গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালের বাসস্থান গুলি ৪ শ্রেণীতে স্থাপিত।

১। ছাদহীন প্রস্তর প্রাচীর-বেষ্টিত সামান্য আশ্রয় স্থান।

২। গুহা গহ।*

৩। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা-হেতু জলাশয় মধ্যে প্রোথিত শঙ্কু পরি স্থাপিত কুটীর। অস্ত্রাদির অসদ্ভাবে জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা কাঠ কাটা হইত, দেখান হইয়াছে।†

* পুরাশৈলিক (Palœolithic) ও নবশৈলিক (Neolithic)যুগে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডস্থ বহু গুহা প্রাথমিক (Primitive) মানবের বাসস্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বুশমান প্রভৃতি কতিপয় অসভ্য জাতি গুহা ভিন্ন অন্য রূপ আশ্রয় জানে না।

† ইতিহাস বহির্ভূত (Prehistoric) কালে ইউরোপের অনেক হ্রদে এই রূপ গ্রাম সমূহ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বোর্ণিও (Borneo), সিলিবিস (Celebes) ও ক্যারোলীন দ্বীপপুঞ্জে (Caroline islands), নবগিনির (New Guinea) অন্তর্গত ডোরী উপসাগরে (Bay of Dorei) মধ্য আফ্রিকার মোর্হ্রিয়া (Morhrya) হ্রদে (গোলাম ধরা ডাকাইতদের ভয়ে), দক্ষিণ আমেরিকার মারাকাইবো খাত(Gulf Maracaibo) প্রভৃতি বহুস্থানে এরূপ গ্রাম দেখা যায়। কাশ্মীরেও না কি হ্রদ মধ্যে বাসস্থান আছে।

৪। বন্য হরিণ (Reindeer), মার্জ্জিত প্রস্তর (Polishd stone), পিত্তল (Bronze ও লৌহ (Iron) যুগের (Epoch) কতক পরিষ্কার গৃহাদি।

ঐতিহাসিক কালের গৃহগুলি ৫ পংক্তির সভ্যতার অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

১। প্রাথমিক সভ্যতা।

২। আর্য্য-সভ্যতা।

৩। রোমাণ পাশ্চাত্য সভ্যতা।

৪। রোমাণ প্রাচ্য সভ্যতা।

৫। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সভ্যতা, যাহা ভারতি-ইউরোপীয়(Indo-European) সভ্যতার বহির্গত, সুতরাং সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি পক্ষে কাজে আসে নাই।

খ্রীঃ পূ ১৫০০ অব্দের রাজা সিসষ্ট্রীসের (Sesostris) আমলের মিসরীয় অট্টালিকা; সিরীয়; ফিনিসিয়; খ্রীঃ পূ ১০০০ অব্দের হিব্রু ও ইট্রুস্কান; খ্রীঃ পূ ৭০০ বৎসরের আসিরীয়; পেলাস্‌গিয়; ৪৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের পেরিক্লিসের (Pericles) সময়ের গ্রীক; ৩০০ খ্রীঃ পূ অব্দের হিন্দু; পারস্য; রোমাণ; বাইজান্তাইন; আরব; ৪০০বৎসের পূর্ব্বেকার মেক্সিকোর আদিম নিবাসী আজতেকগণের বাটী (Aztecs); বর্ত্তমান কালের স্কাণ্ডিনেবীয় ও আফ্রিকান অসভ্যগণের কুটীর; কাফ্রি ক্রীতদাসদের কুটীর; সুদানীয়; চীন, ও জাপানীয় গৃহ এবং লাপলণ্ড দেশের একটী বরফাবৃত ক্ষুদ্র গ্রাম; এই স্থানের প্রধান দৃশ্য।

ইতিহাসের পুরাকালিক অসভ্যাবস্থার

আবাসগুলিতে কালোপযোগী বস্ত্রাবরণ সহ তদবস্থ মানুষের মূর্ত্তি রক্ষিত। ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমানের গৃহ প্রাসাদ অট্টালিকাতে সেই সেই দেশীয় স্ত্রী পুরুষদিগকে স্ব স্ব পোষাক পরিচ্ছদে তত্তৎস্থানীয় বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদি সহ রাখা হইয়াছে। মহাশিল্পী গার্ণিয়ে (M. Carnier) এই স্থানে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করত সমস্ত ঠিক যথাযথ ভাবে প্রস্তুত ও নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পুরা ও বর্ত্তমান তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও সাধারণ দর্শক একমুখে তাঁহার ভূয়সি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি, স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত অতি প্রাচীন কালের চিত্রাদি দৃষ্টে তদনুরূপ পোষাক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ধন্য গবেষণা ও ধন্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রচার। শতপুস্তক পাঠেও যে জ্ঞান লাভের সম্ভবনা নাই, এক প্রহর কাল এই স্থান পরিদর্শন করিলে তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। জগতের সভ্যাসভ্য সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ, বিশেষ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনি যেরূপ অতুলনীয় উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সংসার সে ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবেনা। আমরা এমনি হতভাগা, লক্ষ্মী ছাড়া জাতি যে, এরূপ সহজ সস্তা জ্ঞানোপার্জ্জনেও পরাঙ্মুখ। কি যে ভয়ানক আলস্য অবসাদ ও অনিবার্য্য "পয়সার চিন্তা" আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; কল্পনার সয়তান জীবন্তভাবে আমাদের উপর চূড়ান্ত যথেচ্ছাচারের সহিত অবাধে রাজত্ব করিতেছে। "শিক্ষিত" বলিয়া যাঁহারা দারুণ অভিমানগ্রস্ত, তাঁহারা যেন মনের কোণেও স্থান না দেন যে, অশিক্ষিতাপেক্ষা তাঁহারা অনেক উচ্চদরের জীব, উনিশ বিশ তফাত মাত্র, প্রায় এক লাঙ্গলের বলদ। এম, এ, ডি, এল উপাধিধারী "দশ টাকা রোজগারক্ষম" মিউনিসিপাল কমিশনর, জুষ্টিস অব দি পিস্ ইত্যাদি ইত্যাদি মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাব নিধিরাম ঘোষ রায় বহাদুর ও স্কন্ধে বাঁক ধারী "দুপয়সা উপায়ক্ষম" গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল, দধি-দুগ্ধ বিক্রেতা, দীনতার্ণব, নিরক্ষর, শ্রীহীন দুঃখীরাম ঘোষ গোয়ালাতে বড় বেশী তারতম্য নাই। আর সকল অসংখ্য অগণ্য মহা মহাব্যাপার থাকুক, কেবল এই সামান্য স্থানব্যাপী "মানব বাসগৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস" টুকু ইউরোপীয় ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিতেছে, এইরূপ পরিচয় দিবার যোগ্য হইতে পণ্ডিত মোহানন্দ (দুষ্ট ?) সরস্বতী, ডাক্তার দুনিয়াদাস (অ ?) বিদ্যা হিমালয় এ, বি, সি, ডি, প্রভৃতি মহাশয়গণের কত জন্ম কাটিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। প্রস্তুত অন্নে বেগুণ পোড়া মাখিতে আমরা খুব মজবুত, কোন লুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থ দৈবযোগে হাতে পড়িলে তাহার অনুবাদ, নকল বা বেমালুম চুরি করিয়া মহাগবেষক বলিয়া বাহবা মারিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত, কিন্তু মৌলিক তত্ত্বাদির বেলায় দন্তবিকাশ, তখন ৮০ বছরের জরাগ্রস্ত (Fossilized) বৃদ্ধা মাতামহীও যেখানে, আমিও সেখানে; বিশ্ববিদ্যালয়াদির উপাধির তাড়া বগলে করিয়া দিদিমার অঞ্চল অবলম্বন করত হেঁসেল ঘরের আশ্রয় লই। মহাবীর ষ্টানলে (Stanley) যেরূপ উদারতা, উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা এবং বিপুল ক্ষমতা ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছেন, করিতেছেন এবং আরও কত করিবেন, আমাদের দেশে

কোন্ কালে কয়জন সেপথে তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন? শুধু পাড়া ও শ্বশুর বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কাছে দশ বার গণ্ডা পাশের বাহাদুরী মারিলে, এবং অন্দরমহলে ভার্য্যার নিকট বড়াই করিলে মনুষ্যত্ব হয় না। শ্বশুর বাড়ীতে আড়াল হইতে শাশুড়ীর মুখে যদি শুনিলেন, "এমন জামাই হয় না, গড়্ গড়্ করিয়া পাঁচগণ্ডা পাশ দিয়াছেন, আবার এই বয়সে হাকিমী চাকরি করিয়া আমার খেন্তকে গা সাজাইয়া গহনা দিয়াছেন, এক গোছা কোম্পানির কাগজ করিয়াছেন, এমন গুণবান ছেলে বিশ্বব্রাঙ্গালায় আর একটী মেলা ভার," আর রক্ষা নাই, ভীমার্জ্জুন, নিউটন, দার্ব্বীন-বাঞ্ছিত পদ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, উচ্চাশার চরম শিখরে উন্নীত হইয়া ভাবে গদ গদ। এত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র যাহার আকাঙ্ক্ষার দৌড়, সে ব্যক্তি ত জন্মিবামাত্র মৃত, তাহার "জীবন" দুর্গন্ধময় শটিত শবমাত্র, সর্ব্বপ্রকারে সমূহ ক্ষতির কারণ। আর এক কথা;—পুরুষের প্রতি, "ভাল চাকরি ও সোণার দোয়াত কলম," এবং স্ত্রীলোকের প্রতি "চেলী চন্দ্রকোণা ও সোণার-বাউটী মুক্তার-মালা পরা" যে দেশের প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ, সেদেশে আশীর্ব্বাদ-দাতা ও তদ-গ্রহীতা উভয়ে উচ্ছন্নের পথে কত দূর গিয়া পড়িয়াছেন, সুবৃহৎ ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণও তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল জড়! কেবল জড়! কেবল জড়! চারিদিকে জড়েরই সম্মান, জড়েরই পূজা, জড়েরই রাজত্ব। হায়! এত জড় কত শতাব্দীতে মুক্ত হইবে, জানি না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বড় শক্ত জিনিস, কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া এক মাত্র ন্যায় ও কর্ত্তব্যের পথে সোজা খাড়া হইয়া চলিতে হয়, ভাবরাজ্যে অনেক উচ্চে উঠিতে হয়, সংসারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত করিয়া সুদূর দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে হয়, কূপ হৃদয়কে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় বিস্তৃত করিতে হয়, দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্তরে স্থান দিতে হয়, তবে মনুষ্য নামের যোগ্য হওয়া যায়, নচেৎ গোরিলা, বুশমান ও আমাতে কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

আবার বলি, পাদরীশূর ধর্ম্মাত্মা মহা-প্রেমিক ডাক্তার লিভিংষ্টোনের (Living-stone) মত ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানবিস্তার ও উৎপীড়িত দীন দুঃখী ধর্ম্মহীন কাফ্রি জীব সমস্তের উদ্ধার হেতু দেহ প্রাণ সমর্পণের ভাব, আমাদের মধ্যে কয় জনের হৃদয়ে স্থান পায়? "যোগ" "ভক্তির" বাহাড়-ম্বর সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক লম্বা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যোগভক্তি লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় জ্ঞান কর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকের নিকট শুনি। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়; যেখানে নির-বচ্ছিন্ন আলস্য, বিনাব্যয়ে চক্ষুবুজিয়া আমিরী আরাম, সেইখানে আমাদের ষোল আনা ঝোঁক; আর যেখানে স্বার্থত্যাগ, শরীর মনের পরিশ্রম, সেখান হইতে আমরা সহস্র-হস্ত দূরে থাকি। মৃত্যুর পরপারে যোগভক্তি চর্চ্চার বিপুল অবকাশ পাওয়া যাইবে, কিন্তু কর্ম্মের আশা নাই; অতএব মন, মস্তিষ্ক, হস্ত পদাদি থাকিতে উহাদের সদ্ব্যবহার না করিলে শেষে দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। বিধাতা আমাদিগকে ইহ সংসারে জড় চৈতন্যের আশ্চর্য্য সম্মিলন স্থূল এই শরীর মন দিয়া এরূপ করুণা প্রকাশ করি-য়াছেন যে, ইহা দ্বারা সম্পাদিত ছোট ছোট

কর্ম্মেও আমরা বহু উন্নতি লাভে সক্ষম হই। ক্রমাগত ত্রিরাত্রি নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিলে যত দূর অগ্রসর না হওয়া যায়, জল হইতে উদ্ধার করতঃ একটী ডুবন্ত বালকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তদপেক্ষা সহস্র গুণ উচ্চে উঠা যায়। অতএব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, এ পৃথিবীতে কর্ম্মই ঈশ্বরের উপাসনা ও আরাধনা।

"Work is Worship."

এফেল স্তম্ভের দক্ষিণে

সুয়েজ পানামা গৃহ।

সুয়েজ ও পানামা। টাওয়ারের ডাহিন দিকে প্রথম সুয়েজ ও পানামার ঘর। এটী হিব্রু ধরণের এক আজব গঠনের গৃহ। সুয়েজখালের অবিকল নকল একটী প্রকাণ্ড টেবিলের উপর রাখা আছে। অনেকগুলি দর্শক জমা হইলে ঘর অন্ধকার করিয়া দিয়া বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা খাল আলোকিত করা হইল। জোনাকীর মত আলোগুলি জ্বলিতেছে, বয়া ভাসিতেছে, জাহাজ যাইতেছে, দুই ধারে সুয়েজ ও পোর্টসায়েদ বন্দরে অনেক জাহাজ লাগিয়া আছে, ভারত ও ভূমধ্য সাগরে কত জাহাজ ভাসিতেছে। এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক খেলাঘরের সুয়েজ খাল। চারিদিকে খালের কল, কারখানা, সাজ, সরঞ্জামের নকল সাজান রহিয়াছে।

পানামা।—পাসিফিক্ ও আটলাণ্টিক মহাসাগরদ্বয়কে যোগ করিবার জন্য যোজকের এপার ওপার পানামা (Panama) হইতে কোলোন (Colone) পর্য্যন্ত ৫৪ মাইল যে খাল কাটা হইতেছে, তাহার কল কারখানা শুদ্ধ খালের কাণ্ড উল্লিখিতরূপে আর এক স্থানে রক্ষিত। সুয়েজে কেবল মরু কাটিয়া খাল করিতে হইয়াছে, এখানে উপরন্তু পাহাড় কাটিতে এবং কতকগুলি নদীর সহিত তাল রাখিতে হইবে। আবার দুই সমুদ্রের জলের উচ্চতায় বিলক্ষণ তারতম্য, উভয়ের সহিত মিল রাখিয়া খালের ব্যবস্থা আবশ্যক। সুতরাং অনেক প্রকার কল ব্যবহার হইতেছে, প্রদর্শিত হইল।

কন্‌ফিদারেসিও আর্জেন্তিনা গৃহ।

আর্জেণ্টাইন বা রৌপ্য সাধারণতন্ত্র।—স্থানীয় নাম Confederacion Argentina অর্থাৎ লাপ্লাটা ও পাটাগোনিয়া মিলিত রাজ্য। প্রত্যেক ঘরেই তদ্দেশের প্রচলিত মুদ্রা সমূহ, ৩৪ খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ ও রিলিফ ম্যাপ ও প্রধান দৃশ্যাবলী, উদ্ভিদ, জীব জন্তু ও মহৎলোকের ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রকার চিত্র; এবং স্থানীয় আচার ব্যবহারাদি বিজ্ঞাপক ছবি ও মূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে রক্ষিত। চিত্র মধ্যে গ্রান চাকোর (Gran Chaco) প্রধান শিকারবন ছবি অতি মনোহর। পারাণা (Parana) নদীর তীরবর্ত্তী জীব জন্তু সমাকীর্ণ একটী গভীর জঙ্গলের নকল অতীব চিত্তরঞ্জন। ইন্দুর জাতীয় গিনিশূকর, ক্ষুদ্রকায় টুকো টুকো (Ctenomys Braziliensis), হিংস্র জাগুয়ার, ক্ষুদ্র হরিণ এবং নানাবিধ পক্ষী ও সরীসৃপাদির সমাবেশ এক নূতন কারখানা। উদ্ভিদের মধ্যে এক প্রকার নূতন জাতীয় তালবৃক্ষ (Trithrinax) ও নারিকেল-খর্জ্জুর (Cocos Detib), অর্থাৎ নারিকেলের মত গাছ, খেজুরের মত ফল; এবং রেশমের ন্যায় কোমলভাবে উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণ শীষ (panicle, ধান্যের ন্যায়) বিশিষ্ট তোতোরাস (totoras), পাম্পাসতৃণ (Gynerium argentum) নয়ন আকৃষ্ট করিল।

লৌহ, তাম্র ও রৌপ্যের খনির নকলও দেখান হইয়াছিল। মূর্ত্তির মধ্যে লাসো (lasso) ও বোলাস (bolas) সর্ফাস-চর্ম্মরজ্জুর গোচ্ছা সহ ছোট গোদ্ধা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন মিশ্র গাউকো (Gaucho) জাতীয় অর্দ্ধ সভ্য পুরুষ ও পেরুদেশের স্বাধীনতাদাতা সেনাপতি সান মার্টিনের (General San martin) ঘোড়সওয়ার মূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য। স্থানীয় দ্রব্যজাতের মধ্যে পশম, চর্ব্বি, লোনা-মাংস, উষ্ট্রপক্ষীর পালক, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা, অস্ত্র শস্ত্র, স্থানীয় ব্যবহার্য্য ও ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত। পল্টনের পোশাক গুলি নূতন ধরণের। রাজধানী বুয়োনোসবার (Buenos Ayres) রিলিফ নক্সা (plan in relief) সুন্দর সহরের উপযুক্ত।

ব্রাজীল গৃহ।

ব্রাজীল বা সুন্দর বিহঙ্গের রাজ্য :—জঙ্গল। প্রকৃত দৃশ্যের কৃত্রিম অনুরূপ যেন জীবন্তভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সুদীর্ঘ হইতে অতি হ্রস্ব বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্ট নানা বর্ণের গাছের পাখীগুলি* মৃত কি জীবিত, ঠিক করা কঠিন। সাপগুলি (sorrocuco, jararaca প্রভৃতি) এরূপ ভাবে ফণা ধরিয়া আছে যেন পরমুহূর্ত্তেই ছোবল মারিবে। নাগ ভয়ে পলায়মান ছোট ছোট জন্তুগুলি ঠিক যেন ছুটিতেছে। ২০।২২ হাত লম্বা বোয়া (Boa Constrector) একটী শূকরকে জড়াইয়া বধ করিতেছে। দেশীয় অসভ্য স্ত্রী-লোকের গলহার রূপে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বর্ণ প্রবাল সর্প শান্ত নীরিহভাবে পড়িয়া আছে। বনবিড়াল, তরক্ষু, জাগুয়ার, শ্লথ, সজারু প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। এক অনুপম দৃশ্য। বলিহারি সাজান!

উদ্ভিদঃ—এই অট্টালিকায় একটী প্রকাণ্ড উদ্ভিদাগার (green house) স্থাপিত, তথায় ব্রাজীল প্রদেশের বিশেষ বিশেষ লতা গুল্ম বৃক্ষাদি জীবন্ত রাখা হইয়াছে। এক একটী বৃক্ষে শৈবাল হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকারের এত পরগাছা যে এ সকল দেশে (ইউরোপে) বহু-আয়তন ভূমিখণ্ডে অত উদ্ভিদ একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষারোহী লতা (Canisteria প্রধানত Malpighiaceæ জাতীয়) গাছে গাছে ফিরিয়া মালার ন্যায় শোভমান। বৃক্ষ ও পরগাছা গুলিতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত। আমাদের শিমুলগাছ এখানে দেখা গেল।

চিত্রঃ—আমাথন * (Amazon) নদী তীরস্থ পারুয়াকুয়ারার (Paruacuara) জঙ্গল ও পর্ব্বত শ্রেণী, পারা (Para) নগরের বাজার, রাজধানী রাইয়ো জেনেরোর (Rio de Janeiro) দৃশ্যাবলী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূর্ত্তি—মলাটো (mullattoes), মামালুকো (mamalucos), মেষ্টিজো (mestizoes) ও ছাঁকা আদিম নিবাসীগণের আচার ব্যবহার ব্যঞ্জক বহু মূর্ত্তি রক্ষিত।

দ্রব্যজাত—কাফি, চিনি, তামাক, চা, স্বর্ণ, হীরক ও নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তর, অস্ত্র শস্ত্র, স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং ঐতিহাসিক নানা প্রকার সামগ্রী রক্ষিত।

* জঙ্গলের সমস্ত জীব সজীবের ন্যায় রক্ষিত (stuffed)।

* ব্রাজীলের ভাষা স্পেনীয়, উহাতে z আমাদের থর ন্যায় উচ্চারিত। ইংরেজী ভাষার ভূগোল পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম আমরা যেরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা অনেক স্থলে ভুল।

মেক্সিকো গৃহ।

১২।১৪ কাঠা জায়গা ব্যাপিয়া এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইহার ভিতর তিন থাকে ঠাশা জিনিষ পত্র, তন্মধ্যে কোন্ কোন্টীর কথা বলিব, জানি না; অন্যান্য গৃহের ন্যায় ইহার বর্ণনা করিতে পারাও দুঃসাধ্য। মান্ধাতার আমল হইতে যে দেশে যাহা কিছু আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে ফরাসিগণ যথাসাধ্য ত্রুটি করেন নাই; এবং প্রত্যেক দেশের শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রম ও পণ্যজীবী ব্যক্তিগণ লাভের আশায় বিজ্ঞাপনোদ্দেশে আপনাপন জিনিষ পত্র পাঠাইতে সাধ্যমত কসুর করেন নাই, এমন কি, নানাবিধ আহার ও পানীয় দ্রব্য, ঔষধ ও খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রত্যেক গৃহের যথেষ্ট স্থান ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত গৃহগুলির বর্ণনা দ্বারা কেবল মাত্র তাহাদের সমূহ অপমান করা হইয়াছে, প্রকৃত অবস্থার কণা মাত্রও প্রকাশ করা হয় নাই। অতএব ভবিষ্যতে ওরূপ গুরুতর অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

টোলটেক (Toltecs), আজটেক (Aztecs), মায়া (Mayas) প্রভৃতি সভ্যাসভ্য আদিম নিবাসিদের সময় হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় অধিবাসিগণের কাল পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্রব্য এই প্রাচীন দেশে বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবমত সংগৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে বোলিভিয়া (Bolivia), ইকোয়েডর (Equador), ভেনেজিউলা (Venezuela), কলম্বিয়া (Colombia), পেরু (Peru) উরুগুয়ে (Uruguay), পারাগুয়ে (Paraguay), চিলী (Chili) প্রভৃতি দেশ এক একটী গৃহে প্রদর্শিত। এই অংশে শিশুদের প্রীত্যর্থ নানাবিধ সামগ্রী একটী প্রাসাদে রক্ষিত।

এফেল স্তম্ভের বামদিকে।

গ্যাস কোম্পানির ঘর।—নগরে গ্যাস কোম্পানির যে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। সন্ধ্যার পর ইহার ছাদ, চূড়াশ্রেণী, বারাণ্ডা, দ্বার, গবাক্ষাদি বেলওয়ারের দীপমালা দ্বারা আলোকিত হয়। ঠিক যেন সমস্ত বাটী সুসজ্জিত ভাবে অগ্নিময়।

টেলিফোন গৃহ।—টেলিফোনালয় একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ। এখানে মহাত্মা এডিসন (Edison) কর্ত্তৃক প্রকটিত টেলিফোনের প্রথমাবস্থা হইতে আধুনিক উন্নতি পর্য্যন্ত সকল প্রকার যন্ত্রাদি প্রদর্শিত ও দর্শকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে।

সুইডেন দেশের গৃহ।—এখানে সুইডেন দেশের নানাবিধ দ্রব্যজাত ও কল কৌশলের মধ্যে দেশালাই, কাচ ও চিনেমাটীর সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রদর্শিত। রাজধানী ষ্টকহলমের নিকটস্থ Skurusund এর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও গোটেনবর্গ নগরের চিত্র মনোরম।

নরওয়ে গৃহ।—সমুদ্রে মাছ ধরিবার নানা প্রকার কল কৌশল; বল্‌গা ও এল্ক, হরিণ ও অন্যান্য জন্তু (stuffed); এবং লাপলাণ্ডবাসীদের কুটীর ও গার্হস্থ্য জীবনজ্ঞাপক মূর্ত্তি ও বল্‌গা হরিণের রথাদি জীবন্ত ভাবে দেখান হইয়াছে। চিত্রের মধ্যে "সাত ভগ্নীর প্রপাতের" সহিত Geiranger Fjord এর নানা প্রকার ছবি সুন্দর। ইহার নিকটে রুশ দেশের ছোট ছোট খড় ছাওয়া কাঠের ঘর, ফিনলণ্ড দেশের গৃহ; মোনাকো

প্রদেশের অট্টালিকা; লোহাই (pastel) দ্বারা পলস্তরা করা গৃহ ও তাহাতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী; ও তুর্কি তামাকের ঘর;—এই স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রায় এক পোয়া ক্রীত হয়। একজিবিশনে প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দ্রব্য সামগ্রী ঠিক সেই সেই দেশের প্রথানুসারে নির্ম্মিত প্রাসাদাদিতে রক্ষিত, ইহা কম বাহাদুরীর কথা নয়।

মধ্যস্থলে।

এফেলখণ্ড হইতে বাহির হইয়া অকূল সমুদ্রে পড়িলাম; আর কূল কিনারা পাইবার জো নাই। ৩৪ বিঘা ব্যাপিয়া এক একটী চত্র, তদুপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা:—কোনটীতে ভাস্কর কার্য্য সমূহ; কোথাও বৃহৎ বৃহৎ তৈল ছবি; কোন গৃহে কেবলই জলচিত্র (water color paintings); কোথাও অগণ্য কল কারখানা বাস্প ও তাড়িত বেগে হুশ্ হুশ্ করিয়া চলিতেছে; কোন স্থানে হাতে চালান যন্ত্র সকল রক্ষিত, চারিদিকে নানা দেশের রেলগাড়ী ও এঞ্জিন সাজান রহিয়াছে; কোন বৃহদট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে সভ্য জগতের নানা রাজ্যের অসংখ্য শ্রেণীর বিবিধ প্রকারের পণ্য দ্রব্য; কোথাও দশ বারকাঠা স্থান জুড়িয়া কেবলই স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মাণিক, মুক্তা, প্রবালাদির বহুবিধ অলঙ্কার। কোন খানে প্রকাণ্ড ঘর সাজান কেবলই ঘড়ি; কোথাও খালি চিনের বাসন; এক স্থানে শুধু ফরাসি রেশমের বস্ত্রাদি; অন্যত্র পোষাকের ব্যবহার্য্য হরেক রকমের কৃত্রিম ফুল, পাতা, লতা; মেমের পোষাকের স্থান শেষ করা দায়; কোথাও কেবলই ধাতব ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহ; কোন খানে কেবলই বৈদ্যুতিক কারখানা, কোন গৃহে ব্যোমযান সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সরঞ্জাম ও বৃত্তান্ত; কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জাতির নৌকা ও অর্ণবপোতাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকল ও তদ্বিবরণাবলী; কোন ঘরে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারি কাণ্ড কারখানা; এক অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদে যুদ্ধাদি সম্বন্ধীয় অসংখ্য ব্যাপার:—এফেলস্তম্ভের ন্যায় এখানে সর্ব্বদা ভয়ানক ভিড়, অতি কষ্টে প্রবেশ করা গেল। ভিতরে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, তাম্বু কানাত, যান বাহন, পোষাক, রসদ, অস্ত্র শস্ত্র না আছে, এমন জিনিষ নাই। এক একটা অজগর কামান দেখিলে চক্ষু স্থির। যুদ্ধ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারির কল কৌশল যে কত রকম প্রদর্শিত, তাহা গণনা করা অসাধ্য। তবু অনেক জিনিষ অপরের অজ্ঞাতসারে সময়শিবে কাজে লাগাইবার জন্য হাতে রাখা হইয়াছে। হাসপাতাল, সেতু, পরিখা, গড়বন্দি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখান হইয়াছে, এমন কি, যুদ্ধকপোতকে শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রণালী আবশ্যক, তাহাও দর্শকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন যুদ্ধাদি ও ওয়াটারলু প্রভৃতি মহা সমরের দ্রব্য সামগ্রী ঐতিহাসিক বিভাগে রক্ষিত। ঘোড় সওয়ার, পদাতিক প্রভৃতি সৈন্যগণের গতি বিধি এরূপ স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে গঠিত যে, এক এক স্থানে চমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত। যুদ্ধ বিক্রম গৌরবোন্মত্ত ফরাসি বীরগণ এই প্রাসাদে জাতীয় যুদ্ধবিদ্যাবুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সাধ্যমত ক্রটী করেন নাই। জর্ম্মনির নিকট পরাস্ত হইলে কি হয়? বৈজ্ঞানিক স্থল-যুদ্ধে প্রখর-বোদ্ধা উৎসাহপূর্ণ ফরাসি কোন জাতির নিকট নতশির নন। গৃহের একাংশে জল-যুদ্ধের

সাজ সরঞ্জাম ও জাহাজাদির নকলও রক্ষিত। যত শীঘ্র হয়, সাংসার হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাওয়াই উচিত, তজ্জন্য বহু দেশের জ্ঞানী পুরুষ সম্যক চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া খাঁটি প্রশংসা করিতে পারা গেল না। ফরাসিগণ নিজেরাও পৃথিবীতে ভ্রাতৃশোণিত-পাত আর দেখিতে চান না; একজিবিশনের প্রচারিত উদ্দেশ্য সমূহ মধ্যে, পরস্পরের সংশ্রবে বিশেষ আলাপ পরিচয় দ্বারা প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসারে শান্তি সংস্থাপন করা একটী প্রধান। যদিও রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ কেহ জর্ম্মণদের প্রতি দারুণ কোপ প্রকাশ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ ক্রমে সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া শান্তিপ্রিয় হইয়াছে। ফরাসি ভূমিতে অনেক বার রক্তপ্রবাহ চলিয়াছে, আর ভাল দেখায় না।

এইরূপে কোন স্থানে চিকিৎসা শাস্ত্রের নানা বিভাগের ঔষধ পত্র, অস্ত্র যন্ত্রাদি; কোথাও রসায়ন ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর বিজ্ঞানোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী কল কারখানা; এক সম্পূর্ণ দিশাহারার ব্যাপার, যথাযথ বর্ণনা করে সাধ্য কার? কেবল কলঘরের বিষয় কিছু বলা উচিত।

কলঘর।—এফেল স্তম্ভের ন্যায় ইহাও ইঞ্জিনিয়ারির এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড; পৃথিবীর মধ্যে এক ছাদে এত বড় বাড়ী আর একটী নাই। ইংরেজ মার্কিন ঐক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন "It is the largest building under one roof in the world." ৩৭৭ ফুট পরিসরের (span) উপর এক খিলান। সমস্ত সভ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক চিহ্ন (coat of arms) মধ্য স্থলে চিত্রিত। অধিকাংশ কল ফরাসিদের, কিন্তু ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, মার্কিন প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও বহু কল দুই সহস্র অশ্বশক্তি (2000 horse power) দ্বারা ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ কিলোগ্রাম বাষ্প কর্ত্তৃক চলিতেছে। কলে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, অতি চমৎকার। এই ঘরের একাংশে এডিসনের উন্নত ফনোগ্রাফ (phonograph) দ্বারা দর্শকগণ প্রকৃত মানুষের স্বরে কলের গান শুনিতেছেন। দোমসাস্ত্রাল গম্বুজ ২৫০ ফুট উচ্চ ও ১০০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট। প্রাসাদ ও বাতিঘরের উপযুক্ত বহু শ্রেণীর বৈদ্যুতিক দীপ এখানে প্রদর্শিত। কতকগুলি কল তাড়িত বলে চলিতেছে।

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ঘরের বর্ণনা অসম্ভব; সুতরাং এই বিরাটকাণ্ডের বাহিরে পূর্ব্বদেশে যাওয়া যাউক।

জাপান গৃহ।—আসিয়া খণ্ডের এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে বেশ উন্নত; এবং অধিকতর উন্নতির জন্য রাজ্য ও সমাজের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছে। অতি অল্প কালের মধ্যে জাপান কত নিম্ন হইতে কত উচ্চে উঠিয়াছে, দেখিয়া উহার পথ অনুসরণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! ঐ টুকু দেশে পঁচিশ হাজার রীতিমত স্কুল, আর কি চাই? এই খানে প্রদর্শিত জাপানের রেশম, চিনে মাটি, সোণা রূপা ও এনামেলের (enamel) কাজ অতুলনীয়; নেকরে (nacre) লিখিত গ্রন্থাবলী, বাক্স, ছাতা, বাঁশের জিনিষ পত্র ও কৃত্রিম পুষ্প অতি চমৎকার; "হেমেজিগাবা" চর্ম্ম-পোর্টম্যাণ্টো, পুত্তল ও পান্টিলের (pantile) কাজে আর কোন জাতি জাপানকে পারে কি না, সমূহ সন্দেহ। ইহার পরেই পারস্য গৃহ; তথা হইতে বাহির হইয়া একেবারে মিশর দেশে,

কায়রো রাজপথে।

(বিখ্যাত Street du Caire)

এখানে দাঁড়াইয়া কাহারও সাধ্য নাই বলিতে যে, আমরা ইউরোপে, ঠিক যেন পূর্ব্ববাজা উঠাইয়া আনা হইয়াছে, বাস্তবিকও তাই।—জনৈক ফরাসি কর্ম্মচারী (M. Delort de Cleon) কর্ম্মোপলক্ষে বহুকাল মিসরে বাস করেন, এবং নীল নদী তীরবর্ত্তী প্রদেশে তাঁহার বহু দূর গতিবিধি ছিল। ইঁহার কর্ত্তৃ স্বাধীনে অনেক জীর্ণ প্রাসাদাদি ভাঙ্গা হয়, সেই সময় হইতে ইনি মাল মস্‌লা সংগ্রহ করেন, এবং ঐ সকল কাষ্ঠের কাজ করা বারাণ্ডা, দরজা, প্রকৃত গবাক্ষাদি (মুস আরাবী) দ্বারা এই স্থানে বহু প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান প্রথানুসারে পঁচিশটী বড় বড় বাড়ী, একটী মসজিদ ও মিনারেট (minaret) এবং কয়খানি দোকান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গন্ধী আতর, ফুলেল তেল বিক্রয় করিতেছে, নান্‌বাই রাখরখানি, চপাটি প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়া আছে, হালোয়াই বোতলুকুম মিষ্টান্ন সজ্জিত লোগিয়া সম্মুখে করিয়া পা ছড়াইয়া উপবিষ্ট, কোথাও আররেরা বিকট চিৎকার করিয়া গান গাইতেছে, কোন বাড়ীতে মিসরী সুন্দরীগণ বিশেষ হাব ভাব সহ নৃত্য গীত দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছে, কোন স্থানে বানর-নাচ ও সাপ-খেলান হইতেছে, রাস্তায় বহু স্ত্রীলোক বালক গর্দ্দভপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, পথে, মিস্‌রী, আরব, ইউরোপীয় প্রভৃতির ভিড় ঠেলিয়া চলা ভার; হুবহু মিসরের গুলজার বাজার। ১০০ গর্দ্দভ তাহার সরঞ্জাম ও সহিস ও দোকানদার নর্ত্তকী বাদ্যকর প্রভৃতি খাশ কায়রো হইতে আনা হইয়াছে। বলিহারি! বলিহারি! বলিহারি!, এ স্থানটী অতি মনোরম, এক মজার ব্যাপার।

ইহার পরে মরক্কো বাজার, তদ্দেশীয় নৃত্য গীতাদির ব্যাপার, চীন ও ভারতভবন। শেষোক্ত স্থানে সাদা পাগ্‌ড়ি, চাপকান, পাজামাধারী দেশের খানসামাগণ চা বিস-কুটাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দের সেবা করিতেছে। এই অংশস্থিত হাইটী দ্বীপ, গুয়াটিমালা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া অন্য দিকে যাওয়া যাউক। আপেক্ষি-কতার দরুণ এই সকল সুন্দর বিচিত্র-গঠন হর্ম্ম্যগুলি এখানে অকিঞ্চিৎকর হইয়া রহি-য়াছে, নচেৎ এমন একটী ঘর আমাদের ৮৪ সালের এক্‌জিবিশনে থাকিলে কত লোকের চক্ষু সার্থক হইত। এখান হইতে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণকারী

দিকবিল (Decauville) রেল

দ্বারা ভিন্ন অংশে চলিলাম। এই রেলের ছোট ছোট খোলা গাড়িগুলি ঠিক কলি-কাতার ট্রাম গাড়ির মত। রেলপথের দুই ধারে পৃথিবীর মৃত জীবিত বহু ভাষায় বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন (placards) প্রচারিত রহিয়াছে,—যেন কেহ গাড়ী হইতে হাত, পা, মুখ না বাড়ান;—তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত প্লাকার্ড দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, কিন্তু বঙ্গভাষায় বিজ্ঞাপন না পাওয়াতে দুঃখিত হইলাম; হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতির সঙ্গে বাঙ্গালা থাকা নিতান্ত উচিত ছিল, ফরাসিদের এই ত্রুটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

আদর্শ গ্রামাবলী।

উক্ত রেলে যে অংশে উত্তীর্ণ হইলাম, তথায় কতকগুলি গ্রামের নকল স্থাপিত।

তন্মধ্যে প্রধান যবদ্বীপ (Java), সেনিগাল (Senegal), মালগেচিয়া (Malgachia), টাহিটী (Tahiti), কঙ্গো (Cango), নব কালিডোনিয়া (New Caledonia) ও গাবন (Gabon)। পৃথিবীর নানা স্থানীয় দূর দূর দেশের ২০।৩০।৪০ জন অধিবাসী সহ খড় বাঁশ তালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাশাপাশি এক এক খানি গ্রাম; কি বিচিত্র ব্যাপার। এই গুলি দেখিলে ঠিক সেই সেই স্থানের গার্হস্থ্য জীবন প্রত্যক্ষ করা যায়। স্থানীয় দোকান পসার ও স্থানীয় লোক স্থানীয় ভাবে ঐখানে এই কয় মাসের জন্য জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? এক জন ইংরেজ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, বিনা ব্যয়ে, বিনা ক্লেশে, স্বল্প সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন আর কি প্রকারে সম্ভবে? "We can linger in a Tahitian village, a Cingalese, Cochin Chinese, or Chanack, and examine the inhabitants; then going round the world not in eighty days, or even eighty hours, but in an hour or an hour and a half and without danger of being killed or eaten, which is certainly an advantage." এরূপ ব্যবস্থা যে ফরাসি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে, তাহা বিশ্বাস হয় না; তবে মার্কিন-উৎসাহ ভয়ঙ্কর সতেজ, বিশেষ এই রেশারিশি স্থলে উহারা কত দূর করিবে, এখন বলা কঠিন। পৃথিবীর আর কেহ যাহা একপক্ষে করিতে সক্ষম হয় না, আমেরিকগণ তাহা এক দিনে সমাপ্ত করে। জনবুল-শ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সর উহাদের অত্যদ্ভুত উৎসাহ ও অমানুষিক উদ্যম দেখিয়া হতভম্ব হইয়াছিলেন। উদ্যম, উৎসাহ উন্নতি ত মার্কিনের; এ কথা সংসারের সবাই স্বীকার করিতে বাধ্য; শরীর মন অবিশ্রান্ত খাটাইতে এরূপ আর কেহ পারে না। না হইবে কেন? জন্ বুল সন্তানের নূতন দেশে নূতন ভাবে বিকাশ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়, জগতের বিশেষ শিক্ষার বিষয়। বাস্তবিক, মানব দেহ ধারণ করিয়া এই নশ্বর শরীর মন যদি নররূপী নারায়ণের সেবাতে না লাগাইতে পারিলাম, ধিক আমার জন্ম। এরূপ স্থলে জড়ে ও আমাতে তফাৎ কি? বরং জড় আমা অপেক্ষা অনেক গুণে উপকারী,—জড়কে জীব ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা যথোপযুক্ত কাজে লাগাইতে পারে; আমার সেটুকু উপযোগীতাও নাই। "যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে," কেবল মুখের কথা, গানের বুলি; কাজের বেলায় গা হাত পা কামড়ায়, মাথা ধরে, ক্লান্তি বোধ হয়, ঘুম পায়; কিন্তু আবার সেই দুর্দ্দম্য আলস্যের সময় যদি ফাঁপা বাকপটুতা প্রকাশের কোন অবকাশ উপস্থিত হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ সকল আবল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া জন্মবাগ্মী মহাপুরুষ। এত অকর্ম্মণ্যতা সত্ত্বেও আমাদের জাঁক কমে না, এই বাহাদুরী—এক মুখে বিদ্যার জাঁক, বুদ্ধির জাঁক, মান্ধাতার আমলের বিগত গৌরব ও লুপ্ত সভ্যতার জাঁক, রূপের জাঁক, গুণের জাঁক, ধর্ম্মের জাঁক, কর্ম্মের জাঁক, জাঁকের জ্বালায় দুনিয়া অস্থির; কেবল শুনিতে পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান সময়ের বলবীর্য্যের জাঁক, কারণ ওখানে ত শুধু বাকচাতুরীতে কুলাইবে না, শক্তি সাহসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করিতে হয়; সুতরাং ঐটী ছাড়া, অর্থাৎ শরীর মনের বল বিক্রম ব্যতীত, এমন জিনিষ নাই, যাহা আমাদের ছিল না

বা এখন নাই। কেবল অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, নতুবা আর কোন দুঃখ নাই, সকলই ঘরে মজুত।

যবদ্বীপ।—এখানকার মানুষ ক্ষুদ্রকায় ও পীতবর্ণ। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে অনেকটা আসাম প্রদেশের নাগাদের ন্যায় কিন্তু বড় কৃশ। গ্রামের নিকটে একটী নাট্যশালা, তথায় বিচিত্র পোষাকে অভিনব দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুবতী নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, এক নতন আমোদ ও শিক্ষার বিষয়। এই নাটমন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, কিঞ্চিৎ জলযোগ ও যাবানী নৃত্য গীত বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা নয়ন মনকে প্রীত করা গেল। যাবানীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত।

টাহিটী।—পশ্চিম আফ্রিকার সেনিগাল, কাফ্রিগ্রামের পার্শ্বে টাহিটী গ্রাম। অধিবাসীগণ তাম্রবর্ণ, সুচারু গঠন ও মধ্যমাকার। ইহাদের ভাষা, বিশেষ স্ত্রীলোকদের কথার সুর অতি মধুর, চিরবসন্ত বিরাজিত, মনোহর সুগন্ধ পুষ্প শোভিত রমণীয় দ্বীপের উপযুক্ত। ইহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত।

নব কালিডোনিয়া।—এখানকার স্ত্রীলোক এত কুৎসিত যে, প্রবল কল্পনার দ্বারাও ওরূপ কদাকার ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। বহুদিন ফরাসিদিগের শাসনাধীনে থাকা সত্ত্বেও এই প্রশান্ত সাগরস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস জাতীয় মানুষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গাবন।—আফ্রিকার গিনি উপকূলস্থ গোরিলার আবাস ভূমি গাবন গ্রাম খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। এ স্থানের কীট পতঙ্গ সংগ্রহ প্রাণীতত্ত্ব-শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয়। অধিবাসীগুলি সাধারণ কাফ্রি অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর ও সুশ্রী! এখানকার লাল পিপীলিকা বড় ভয়ানক।

আলজিরিয়া, টিউনিস প্রভৃতি দেশের বাড়ী, মসজিদ, মিনারেট, গাছপালা, দ্রব্যজাত, অধিবাসী ও বাজারাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া স্থানান্তরে যাইব।

ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক গৃহ।

এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য বাহির হইতে যেমন সুন্দর, ভিতরের কাণ্ড কারখানা ততোধিক হৃদয়গ্রাহী ও গভীর উপদেশ পূর্ণ। দুঃখের বিষয় সম্যক বর্ণনা মানব ক্ষমতার অতীত; চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিলে ঠিক ঠাক বুঝা অসম্ভব। কোথাও মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষ পর্ব্বত গুহা হইতে উঁকি মারিতেছেন, গুহা পার্শ্বে ব্যাঘ্র দণ্ডায়মান, কোথাও উলঙ্গ মনুষ্য কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি বাহির করিতেছেন, কোন বৃক্ষতলে বল্কল-পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ চকমকি ঠুকিতেছেন; কোন গৃহে মিসরীয় স্ত্রীলোক শিশুক্রোড়ে তাঁত বুনিতেছেন, কোন উদ্যানস্থ টোলে গ্রীক পণ্ডিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; কোথাও রোমাণ রাজসভা, আদালত, আবার কোন দিকে প্রাচীন অসভ্য ইউরোপের কামারের দোকান, কোথাও কালডীয় মেষপালক জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরিদর্শন করিতেছেন, কোন স্থানে বল্গা হরিণ ও শীলমৎস্য সহ শিবিরবাসী এস্কিমোর সংসারাশ্রম; কত বলিব? এ প্রকারে নানা দেশের নানা যুগের, নানা অবস্থার সামাজিক জীবন, তত্তৎকালিক বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্রাদি সহ জীবন্তভাবে প্রদর্শিত; হঠাৎ তাকাইলে বোধ হয় যেন স্ত্রীলোকের হস্তস্থ মাকু এখনি চলিবে, কামা-

রের উত্তোলিত হাতুড়ি এই মুহূর্ত্তেই নেহা-নের উপর ঠনাৎ করিয়া পড়িবে। এই হর্ম্ম্যের এক পার্শ্বে নানা দেশ হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাক্ষী স্বরূপ জিনিষ পত্র ও ছবি রক্ষিত।

নিকটস্থ একটী গৃহে নানা দেশের নানা বিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান হইতেছে। এখান হইতে বাহির হইয়া নিকারাগুয়া (Nicaragua) ঘরে তদ্দেশের নিকটস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের নকল অতি চমৎকার,—ছোট ছোট জাহাজ ভাসিতেছে, নদীর স্রোত, হ্রদের ঢেউ, সাগর তরঙ্গ বাস্তবিক অদ্ভূত, কাচের উপর প্রকৃত জল দ্বারা এই সকল দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

অদূরে আর একটী ঘরে পৃথিবীর আয়তনের নিযুতাংশের পরিমাণ এক বিরাট গোলক। গোলকটীর সমস্ত অংশ দেখিতে গেলে তিন থাক উঠিতে হয় এবং প্রদক্ষিণ দ্বারা বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ হয়। এই স্থানে ছোট বড় নানা রকমের গোলক প্রদর্শিত।

আর এক স্থানে কলে ঐকতানবাদন চলিতেছে, এবং নিকটেই পর্সিপলিস নগরের ভূগর্ভ হইতে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসিকগণের আহুরা মাজদার উপাসনা মন্দির, ঠিক ঠাক সেই ভাবে নির্ম্মিত হইয়া উপাসকাদি সহ বিদ্যমান।

এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ স্তম্ভ এবং তাহার চূড়ায় উঠিবার তাড়িত কলের ব্যবস্থা, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাচ, গান, থিয়েটর, তামাসা; এবং নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর অগণ্য হোটেল, কাফে (cafe), রেস্টরাঁ (restaurant), কাবারে (cabaret) প্রভৃতি পানাহারের গৃহ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও ক্ষুদ্র দোকান।

নদী পারে।

ঠিক সম্মুখে ট্রোকাডেরোর দুই বিশাল পক্ষ (wing) বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গনে কৃত্রিম ঝরণা ও বৃহৎ এক ফোয়ারা চারিটী বড় বড় পাথরের জন্তুর দ্বারা ধৃত,—ষাড়, ঘোড়া, গণ্ডার ও হাতি। প্রাসাদের ভিতরে এক প্রকাণ্ড হল, তথায় টেবিল চেয়ারাদি সরঞ্জাম সহ পাঁচ পাঁচ হাজার লোক বসিয়া আহার করিতে পারেন। অন্যান্য প্রকোষ্ঠে প্রাচীন ও আধুনিক ভাস্কর-কার্য্য, ফটোগ্রাফ ও পৃথিবীর সভ্যাসভ্য নানা জাতীয় পোষাক, অলঙ্কার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, যন্ত্র তন্ত্র, বাদ্য বাজনা ও নর নারীর মূর্ত্তি রক্ষিত। এ স্থানটী সাময়িক ভাবে একজিবিশনের সামিল হইয়াছিল, কিন্তু আসলে এই খণ্ড একটী স্থায়ী মিউজিয়ম।

এপারে বন, উপবন, নদী, সেতু, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল এবং জীবিত জলচর জন্তু সমূহ প্রদর্শিত।

বিশ্বপ্রদর্শনী শেষ করিলাম, কিন্তু কিছুই বলা হইল না; এজন্য ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে পাঠক মহোদয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা চক্ষে আর দেখা যাইবে না, কেবল কাগজে-কলমে ও চিত্রে যতদূর হয়। ইউরোপীয়গণ সহজ জীব নন; কয়েক মাস হইতে লণ্ডনস্থ Oxford Cyclorama হলে পৃথিবীর অন্যান্য বহুবিধ দৃশ্যের সহিত পারিস একজিবিশনের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড এরূপ ভাবে দেখাইতেছেন যে, ঠিক আসল বলিয়া ভ্রম হয়; দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন বোধ হয় পতাকাগুলি উড়িতেছে। "মডরণ ট্রুথ" (Modern Truth) নামক পত্রিকার মত

নিম্নে উদ্ধৃত হইল; তাহাতে কতক বুঝা যাইবে, কি প্রকার কাণ্ড।

"No words could give the faintest idea of the wonderful realism of the representations. You look along the landscape for miles and miles and are entranced. So perfect is the method employed that the haze of the atmosphere and that chiaroscuro which many of our best painters fail to catch, is faithfully reproduced. The green herbage on the mountain side is so vivid and apparently so near that you feel as though it were possible to stretch out your hands and pluck a cowslip from its vernal bed. We are charmed and have forgotten when the circle is completed that we are in England's metropolis. It is simply astounding in its verisimilitude."—
29th March, 1890.

যাহাই হউক, সেই রমণীয় নন্দনকানন সেই বৃক্ষরাজির পত্র মধ্যে তাড়িতালোকের বিচিত্র শোভা; সেই অগণ্য নর নারীর জনতা; সেই শিল্পজ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মেলায় রূপের বাজার; চারিদিকে সেই আনন্দহিল্লোল; মূল কথা, সেই সর্ব্বতোভাবে মনোহর ও বিরাট বিশ্ব-প্রদর্শন কোন শিল্পীর সাধ্য নাই জগৎকে আর একবার দেখায়।

বিগত শত বৎসরে জগতে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই প্রদর্শনী তাহারই জীবন্ত প্রমাণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অসহ্য ফরাসি রাজশক্তি নাশ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত কয় বৎসরের কি লোমহর্ষণ রক্তস্রোত দ্বারা উহা ভাসান হয়; আর আজ ১৮৮৯ অব্দের শেষ ভাগে পারিস একজিবিশনের অবসানে ১১ই নবেম্বর তারিখে বিশাল ব্রাজিল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাবন্ধু ষষ্ট্যাধিক বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাট ডম পিদ্রো (Dom Pedro) অর্দ্ধ শতাব্দির সুশাসনের পর রাজ্যের ভবিষ্যৎ হিতোদ্দেশে প্রকৃতি-রঞ্জনার্থ নিঃশব্দে নিজের ও বংশাবলীর জন্য সিংহাসন সত্ব জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয় ব্রাজীলের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করত ইউরোপ যাত্রা করিলেন;—শান্তভাবে প্রজাপরতন্ত্র শাসন প্রণালী সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ।

স্বাস্থ্যরক্ষা শাস্ত্রে যাহাই বলুক, প্রত্যূষের নিদ্রাটুকুর মত তৃপ্তিদায়ক জিনিস, এই দুঃখের সংসারে বড়ই বিরল। সাগর পাড়ি দিয়া, কূলে আসিয়া সাগরের সৌন্দর্য্য দেখার মত; সেতারে রাগিণী আলাপের পর, গতের ঝঙ্কারের মত; অতি ভোজনের পর, একটু "রসনার রস" চাট্‌নি চাটিবার মত; এবং মাতালেরা বলিতে পারেন যে, অতিমাত্রায় নেশা করিবার পর, একটু খোঁয়ারী ভাঙ্গার মত; এই প্রত্যূষের নিদ্রায় অনেক সুখ। আর স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ? যাহারা নিত্যসুস্থ, অথবা যাহারা স্বাস্থ্যেরই প্রতিমূর্ত্তি, সেই বিদ্যালয়ের শিশুছাত্র ভিন্ন শোনে কে? এ কথায় কেহ হয় ত টেনিসনের বচন তুলিয়া বলিবেন, "Cursed be the sickly forms that err from honest

Nature's rule." যাহাই বল বাপু, অভিধানের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা; আর স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া "প্রবৃত্তি কুত্র কর্ত্তব্যা"র অনুসন্ধান; আমা হইতে হইবে না। তবে যিনি ত্রেতায় সূর্য্যকে কুক্ষিগত করিয়া, রাত্রি বাড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র বংশোদ্ভব মহাত্মারা, পারিলে পারিতে পারেন। দোহাই ডারবিন্ সাহেব, আমি সেই গৌরবান্বিত দলভুক্ত নহি।

কিন্তু আমার প্রত্যূষ নিদ্রার অনেক ব্যাঘাত। আমার এই সুখের পথে অনেক কণ্টক। বিধাতা! শোভার শোভা, রূপের রূপ অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রতারকা তোমার যে অঙ্গুলীর সৃষ্টি, এই কর্কশ কণ্ঠ, কদাকার, কুরূপ, কৃষ্ণকায় কাক জাতি কি সেই অঙ্গুলী গঠিত? তোমার পরম রমণীয় বিহঙ্গ-জগতে এত কলকণ্ঠ, এত চিত্রিত বিচিত্রিত পক্ষী থাকিতে, এ কাকের সৃষ্টি কেন? বাজখাই আওয়াজের ভয়ে আমার এ জীবনে, সঙ্গীত শিক্ষা হইল না, আর আমার "ঘরের চালে পালে পালে" এত বাজখাই ছড়াইয়া দিলে কেন? পরীক্ষিত সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমি কাকযজ্ঞ করিব। আমি কাকের জ্বালায় প্রাণ ভরিয়া প্রত্যূষে নিদ্রা যাইতে পারি না। যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত্রি প্রভাত হয় না? যেখানে বক্তা নাই, সেখানে কি স্বদেশ-প্রেম জন্মে না? যেখানে উকীল নাই, সেখানে কি ন্যায় বিচার চলিতে পারে না? যাহাদের পুরোহিত নাই, তাহাদের কি ধর্ম্মলাভ হয় না? যে ঘরে পদীর মা নাই, সে ঘরের কি গৃহিণীপনা বন্ধ থাকে? যাহারা মদ খায় না, তাহারা কি আমোদ প্রমোদ করে না? ভারতমাতার বিশ কোটী সন্তান, যদি প্রতিজন এক একটী করিয়া কাক বধ করেন, তবে এ কাককুল অচিরাৎ নির্ম্মূল হয়; আর আমি সুখে এই শরতের প্রভাতে, আনন্দে একটু নিদ্রা যাই।

রাত্রে এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রভাতে, ঈষৎ মাত্রায় শীত বোধ হওয়াতে, বিছানার চাদর খানি তুলিয়া গায় দিয়া, একটু খানি মিঠে রকমের ঘুম ঘুমাইতেছি; এমন সময় সেই "কা-কা" শব্দ, চৈত্রের রৌদ্রে ঢাকের শব্দ অপেক্ষাও কর্কশ হইয়া কাণে গেল। রাগ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম; দেখি, চারি দিকে কেবল সেই "কা, কা, কা,"! দরজা খুলিয়া দেখি, শরতের জগতে সৌন্দর্য্য যেন আর ধরে না! কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালাই সেই "কা, কা" শব্দ! ভূমির সমান্তরাল রেখায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত, "তোয়ারশেষেণ হিমাভমভ্রম্," মেঘ শ্রেণীকে সপ্তবর্ণে চিত্রিত করিয়া উষার নবীন রাগ পূর্ব্বাকাশ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। এবং সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া, স্বচ্ছ, সুনীল, বহুদূর প্রসারিত, তরঙ্গান্দোলিত সাগরবারি, সাগরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মণি-মাণিক্য খচিত অঞ্চলের মত দুলিতেছে। ভাবিলাম, সেই অতুলনীয়া শোভা, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি! মনে করিলাম, যদি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছেই, তবে একবার এই প্রত্যক্ষীভূতা মূর্ত্তিমতী কবিতার লাবণ্য সাগরে ঝাঁপ দি! কিন্তু কাকের সেই কর্কশ স্বর, আমার সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের বাধা হইল; কবিতার প্রতি উদ্দীপ্ত মধুর প্রেম ভাবে, একটু যেন তিক্ততা আসিয়া পড়িল; আত্মবিসর্জ্জনের অনুরাগ যেন শিথিল হইয়া

পড়িল! দুর্ম্মুখ আবার ডাকিল "কা! কা! কা!"। আমি পরাজিত হইয়া মনে মনে কাতর ভাবে কাকের উদ্দেশে বলিলাম, বাপু, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু চুপ কর, আগামী নবান্নের সময় তোমাকে প্রাণ ভরিয়া চাউল খাইতে দিব। কাক যেন আমার কাতরতা বুঝিয়া বিদ্রূপ করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিল।

যে মানুষ কাকের কাছে পরাজিত হয়, তাহার মূল্য কি? বাস্তবিকই এ ছার মনুষ্য জীবনের মূল্য কি? বহির্জগতে আমার নিদ্রার বিঘ্ন এই কুৎসিৎ কাক কোলাহল; এবং অন্তর্জগতে আমার শান্তির বিঘ্ন শত শত কুপ্রবৃত্তির হলাহল! অসংযত রসনা প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিষ উদ্গীরণ করে, তাহাতে কত বন্ধুর হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে! কুশাসিত দৃষ্টি যেরূপ বক্র গমন করে, তাহাতে কত পবিত্র-স্বভাবা রমণী, সে দৃষ্টিকে সর্পের বক্র গমন অপেক্ষাও ভীষণ মনে করিয়া আমাকে দূরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! আমি প্রতি-নিয়ত হস্ত সঞ্চালনে কত নির্দ্দোষীর হৃদয়ে আঘাত দিতেছি; আমি প্রতি পাদবিক্ষেপে কত অবনত-মস্তক দরিদ্রের রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ মস্তক চূর্ণ করিতেছি! আমি প্রতি প্রশ্বাসে যে পাপের ঝড় প্রবাহিত করিতেছি, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার নির্ম্মম ধ্বংস কার্য্যের জন্য অনুতাপের ব্যথা বুকে পূরিতেছি! আমার শান্তি কই? আমার সুখ কই? অথবা সুখ বুঝি এ সংসারে নাই। তবে আমার প্রত্যূষ নিদ্রাই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, কখন কখন আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া বর্ণন করি; তাহারা সুখ নহে, দুঃখকে ঘনীভূত করিবার হেতু মাত্র। দেশী কবিতায় আছে:—"দুঃখের সংসারে সুখ, দুঃখ দিতে আসে।" বিদেশী কবি, দান্তেও তাহাই বলিয়াছেন, "No greater grief, than to remember days of joy, when misery is at hand" টেনিসনেও তাহারি ভাষ্য, "A sorrow's crown of sorrow is remembering happier things." যদি সুখ নাই, কেবলি দুঃখ, তবে সেই দুঃখের উপর অল্প একটু দুঃখের মাত্রা চড়াইয়া, এই দুঃখের সংসারকে কদলি প্রদর্শন করায় ক্ষতি কি? মরণে আপত্তি কি? কিন্তু মরিতে এ প্রাণ চায় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

ঐ শোন, বুদ্ধি আমাকে বলিতেছে, "তুমি বড় দুঃখী, তুমি মর"। প্রাণ বলিতেছে, "এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে পরমাশ্চর্য্য এই মনুষ্য দেহ, আমি কেমন করিয়া ইহাকে অন্ধকারে ডুবাইয়া দিব?" বুদ্ধি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, "দেখ, ঐ প্রজাপতিটি কেমন সুন্দর! এবং সে যে ফুলটির উপর উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, সেই জড় ফুলটিও কেমন সুন্দর!" প্রাণ বলিল, "সেকি কথা! মানুষের সঙ্গে কাহার তুলনা সাজে? জ্ঞান, কর্ম্ম, মাহাত্ম্য, এত কাহার আছে? মানুষ সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ!" বুদ্ধি বিদ্রূপ করিল; বলিল, "তুমি প্রত্যূষে নিদ্রা যাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন শরৎকালটা বহিয়া গেলে, তুমি কি এক দিনও রাত্রিকালে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ নাই? দেখ নাই, কত অনন্ত লোক, তোমার মাথার উপর প্রতিদিন প্রভাসিত হইতেছে, এবং নিবিতেছে! এই অনন্ত সৃষ্টির তুলনায়, তোমার পৃথিবী রেণুর রেণু! সেই পৃথিবীতে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত, জটিল স্নায়ু-চক্র বিশিষ্ট দেহ পাইয়া, এত বড়াই কর?

এই অনন্ত লোকে কত অনন্ত সৃষ্টি আছে, তুমি জান? তোমা অপেক্ষা কত উন্নততর জীব সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহাব সন্ধান পাইবারও তোমার ক্ষমতা নাই।" কিন্তু প্রাণ নিরস্ত হইবার নহে। সে বলিল, "এ সংসারে কেহই তুচ্ছ নহে; সকলেরই সমান প্রয়োজন। শালগাছ অপেক্ষা একটা শুষ্ক তৃণ কম মূল্যবান, কে বলিবে? একটিতে এক কার্য্য, অন্যটিতে অন্য কার্য্য সাধিত হয়; একের কার্য্য অন্যে সাধন করিতে পাবে না। সুতরাং প্রয়োজনের হিসাবে বিভিন্নতা কই?" এ কথা শুনিয়া, বুদ্ধি যেন একটু খানি নাসিকা উত্তোলন করিয়া, ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল; "এমন করিয়া প্রবোধ দেওয়া মন্দ নয। কিন্তু দেখ, এই জগতে, হাম্‌বোল্ট মহোদয়ের গণনায়, লুপ্ত এবং স্থিত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর "জাতি" কোটি পরিমিত। প্রতি জাতিতে কত বর্ণ, বর্ণে বর্ণে কত গোত্র, প্রতি গোত্রে কত গোষ্টি, গোষ্টিতে গোষ্টিতে কত পবিবার, এবং প্রত্যেক পরিবারে কতগুলি তুমি এবং আমির সমষ্টি। গণনা এই খানেই শেষ হয় নাই। তোমার এই অতি ক্ষুদ্রতা, একবার সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্যে পৃথিবীর যে অতি ক্ষুদ্রতা, তাহার সহিত বিচার করিয়া লও। বল দেখি, এ গণনায় তুমি কোথায়? বাঁচিয়া আছ, না মরিয়াই আছ? যে সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্য হইতে তোমার সমগ্র সৌর জগৎখানি পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলে, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, হিসাব নিকাশ নাই, সেখানে তোমার কাতরোক্তি শুনে কে? হে নগণ্য, হে তুচ্ছ, তুমি মর।" প্রাণ যেন ইহার উত্তরে কহিল, "আমি নগণ্য, আমি তুচ্ছ, তাহা মানি! অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় আমি যাহা; অনন্ত পরমেশ্বরের তুলনায় তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাও তাহাই! সৃষ্টি বলিলেই বুঝিলাম, তাহার আদি আছে, কূল আছে। কাজেই সে যত বড় হইলেও সীমাবদ্ধ। স্রষ্টার করুণাসাগরে সেও এক বিন্দু। এ পৃথিবীর মধ্যে একটা পর্ব্বত, একটা বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া, গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যদি উর্দ্ধে উঠিয়া দেখ, যদি গ্রহান্তর হইতে দৃষ্টিপাত কর, তবে ক্ষুদ্র ও বৃহতে ভেদ বুঝিতে পার কি? হিমাচল ও বালুকা স্তূপ, কণার কণা হইয়া কোথায় মিশাইয়া যায়। সুতরাং স্রষ্টার কাছে আমি এবং এই অসীম সৃষ্টি, সকলেই বিন্দু। আর যিনি অনন্ত, যিনি স্রষ্টা, তিনি কি ক্ষুদ্র বলিয়া আমার প্রতি উদাসীন? "যত দূর শাসন করিতে পারিবে না, তত দূর রাজ্য বাড়াইও না।" এই কথা এক জন সামান্য স্ত্রী একজন সম্রাটকে বলিয়াছিলেন। যদি তত্ত্ব লইতে না পারিতেন, তবে কি সেই বিশ্বস্রষ্টা, তোমাকে কিম্বা আমাকে গড়িতেন? আরও শুন, তোমাকে সেই প্রাচীন কালের একটী কথা এই স্থানে বলি। দেখ, আমার অন্তরে কত আশা, কত স্নেহ! যেন ফুরায় না, ফুরাইতে চাহে না। আমি বিন্দু, কিন্তু ইহাদের এক এক বিন্দু, সিন্ধু অপেক্ষাও বৃহত্তর! আমার আশা এই ক্ষুদ্র জগতের চতুঃসীমায় বদ্ধ নহে। তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাকেও পদতলে দলিয়া এ উড়িতে চায়। এক হিসাবে আমি নগণ্য বটে; কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া দেখ, আমার মাহাত্ম্য বড় কম নহে।"

এবার বুদ্ধি রাগ করিল। ভ্রুকুটি করিয়া কহিল; তোমার বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তুমি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এ কথা

যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। তোমার মনে মনে, অজ্ঞাতে এই কুসংস্কারের বীজ এখনও অঙ্কুরিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী লইয়াই যত সৃষ্টি; এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তাহা না হইলে, মরণান্তেও তোমার আশা, ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, এমনটা ভাবিবে কেন? দেখ, তুমি এইমাত্র যে কাক জাতির উপর রাগ করিয়াছিলে, সে কাক জাতির পরিণামের কথা ত তুমি একবারও ভাব না? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির আশা ভরসা, যদি তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে, এমনটা ভাবিতে পার, তবে তোমার নিজের বেলায় এতটা বাড়াবাড়ি কর কেন? তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নততর জীব, এ সৃষ্টিতে থাকিতে পারে। অথবা তোমাদেরই ক্রমবিকাশে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যের সৃষ্টি হইবে। তুমি এই ক্ষুদ্র কাক বেচারীকে যে চক্ষে দেখিতেছ, তাহাদের দৃষ্টিতে, তুমি, তাহা অপেক্ষা আর কি বড় একটা কিছু? তোমার আশাই যদি অনন্তে ছুটিয়া যায়, তবে তাহাদের আশা কত দূর প্রসারিত হইবে? অনন্তের পর তো আর স্থান নাই! অত আত্মশ্লাঘায় কাজ নাই, তুমি মর।

এ কথা শুনিয়া প্রাণ যেন একটু বর্দ্ধিত তেজে, অধিকতর অনুরাগে কহিতে লাগিলঃ— "কাকের আশা, কাকের ভরসা কাক জানে। তুমি কিম্বা আমি তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে কথা কখনও বুঝিতে পারিব না। তবে সে কথায় তোমার আমার কাজ কি? আর তুমি যে উন্নততর জীবের কথা বলিতেছ, আমি তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু উন্নতের আশাও উন্নততর হইবে, এইরূপ বুঝি। আমি যে তৃপ্তির জন্য লালায়িত, আমি যে অনন্তের ভিখারী, তাহা হয়ত তাহার কাছে বড় ক্ষুদ্র। সুতরাং আমি যাহা চাই, তাহা আমার বিবেচনায় শেষ হইলেও, উন্নততর প্রাণের কাছে শেষ বলিয়া গণিত হইবে না। তুমি আমাকে নগণ্য বলিতেছ, অথচ এই নগণ্যের ক্ষুদ্র আশা ও কল্পনা লইয়া মহতের বুকে পুরিয়া দিতে চাও কেন? কাকের কাম্য কাকের কাছে, আমার কাম্য আমার কাছে; আর উন্নততরের কাম্যও তাহারই কাছে। সকলেরই আশার পরিতৃপ্তি হইবে। নচেৎ আশার উদয় হয় কেন? কিছুই যখন উদ্দেশ্য-বিহীন নয়, তখন, আমার ক্ষুদ্র আশা বেচারী মাঠে মারা যায় কেন?

দূর হউক ছাই! ভাবিতে ভাবিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি! আমার সেই প্রভাতের সপ্তবর্ণ-চিত্রিত মেঘ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সে অরুণ জ্যোতি নাই, সে স্নিগ্ধ সমীরণ নাই; সতেজ শ্যামল পত্রে, জল বিন্দু সম্পাতের সৌন্দর্য্য নাই। কাকের সেই দিক্‌ব্যাপী কর্কশ কণ্ঠও নাই। সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ, স্নিগ্ধপত্রে প্রতিফলিত হইতেছে; আকাশ আলোকে ভাস্বর; পৃথিবী কর্ম্ম কোলাহলে উদ্দীপ্ত! আর কাকগুলি? তাহারা এখন অতি দূরে বা অনতিদূরে, একটু নরম সুরে "কা কা" করিতেছে! কিন্তু এই ভাবনায় বুঝি আমার একটু উপকার সাধিত হইতেছে। সেই কাকের স্বর, সেই সূর্য্যের আলোক, সেই আকাশের মহিমা, পৃথিবীর সেই কর্ম্মময় উৎসাহ, এবং বৃক্ষের সেই উজ্জ্বল রূপ, সকলি যেন এক সঙ্গে, একই সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বর হইয়া, আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল! আমি যে দুর্বৃত্ত বাসনার বাধার কথা বলিতে-

ছিলাম, তাহারা আমার তন্ত্রীর সা, ঋ, গা, মা প্রভৃতির পরদা সাজিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন দেখিলাম, জগতের আদি অন্ত মধ্য কোথাও ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই, দুর্গতি নাই। অনন্ত লোক হইতে যেন একই শান্তির গীতি উত্থিত হইতেছে। আমি আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাম, আর কাকের ডাকে আমার অনিষ্ট হইবে না। অদ্য হইতে আমার প্রত্যুষ নিদ্রার পথ নিষ্কণ্টক হইল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্।

বাসন্তচূতমুকুলেষ্বলিঝঙ্কৃতেষু
কুঞ্জেষু মঞ্জুকলকোকিলকূজিতেষু।
সম্পূর্ণশারদসুধাকরমণ্ডলেষু
সৌন্দর্য্যসাগর হরে! তব মূর্ত্তিমীক্ষে ॥ ১॥

মধুমাসের চূতমুকুলে, অলিকুলের ঝঙ্কারে, নিকুঞ্জবনে, কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কুহুরবে এবং শারদীয় সুধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডলে, হে সৌন্দর্য্য-সাগর হরি! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১।

প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু
তারাবিচিত্রেষু নভস্তলেষু।
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্য চিত্তে
গোবিন্দ! পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ২ ॥

যখন কমলকুল প্রফুল্ল হইয়া সরোবরসকলকে সুশোভিত করে, যখন সুনীল নভোমণ্ডলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়, যখন স্নেহময়ী জননীর স্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যখন দয়ালুর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধুময় দৃশ্যমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ২।

বিচিত্রপুষ্পাসু বনস্থলীষু
সুগন্ধমন্দানিলবীজিতাসু।
বিহঙ্গসঙ্গীতনিনাদিতাসু
গোবিন্দ! পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥

যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুসুমমালায় সুসজ্জিত, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শান্তিময় দৃশ্যমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৩।

শিখণ্ডিকেকা নবমেঘশব্দে
ভেকালিকণ্ঠাশ্চ নবাম্বুপাতে।
ঝিল্লীরবাঃ সুপ্তজনে নিশীথে
উদ্বোধয়ন্ত্যঙ্গ তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৪ ॥

নব-মেঘ-গর্জ্জনে শিখিগণের কেকারব, নববর্ষাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে ঝিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি মূর্ত্তিকে উদ্বোধিত করে। ৪।

প্রত্যগ্রসিন্দূররসৈরিবার্দ্রে
বালাতপৈর্বিচ্ছুরিতেঽন্তরীক্ষে।
পশ্যামি সন্ধ্যাম্বুদবিভ্রমেষু
প্রেমাভিরামাং তব কৃষ্ণ! মূর্ত্তিম্ ॥ ৫ ॥

যখন উষাদেবী অভিনব সিন্দূররসের ন্যায় অপূর্ব্ব অরুণালোকে গগনতলকে সুরঞ্জিত করেন, যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আতাম্র কিরণমালা সান্ধ্য মেঘস্তবকে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাস-লহরী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই

ভুবনমোহন দৃশ্যপটে হে কৃষ্ণ! তোমারি প্রেমময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ৫।

উদ্ভিন্নগারুত্মতসুপ্রকাশৈঃ
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীনশস্যৈঃ।
স্নিগ্ধেষু পশ্যামি চ পল্লবেষু
বিশ্বাভিরামং তব কৃষ্ণ! রূপম॥ ৬॥

যখন মরকতমণির ন্যায় শ্যামল নবীন শস্যসকল সমুদ্গত হইয়া ক্ষেত্রমণ্ডলকে অপূর্ব্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরুলতা-সকল স্নিগ্ধ নবপল্লবে সুশোভিত হয়, তখন সেই কমনীয় দৃশ্যমধ্যে হে কৃষ্ণ! আমি তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬।

কঙ্কালমালাবহুলেঽতিরৌদ্রে
শ্মশানদেশে শবধূমধূম্রে।
প্রচণ্ডবাতক্ষুভিতেঽর্ণবে চ
প্রেক্ষে মহারুদ্র! তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ৭॥

চিতা-ধূমে ধূম্রবর্ণ শব-কঙ্কালে সমাকীর্ণ বিভীষিকাময় শ্মশানমধ্যে, এবং প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে হে মহারুদ্র! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৭।

গাঢান্ধকারাসু কুহূক্ষপাসু
দিগ্ব্যাপিঘোরাভ্রঘটাসু চৈব।
দম্ভোলিভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে
মহাবিরাজস্তু তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ৮॥

যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে দশ-দিক্ সমাচ্ছন্ন হয়, যখন ঘোরতর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়, যখন ভীষণ কড়-কড় শব্দে বজ্রাগ্নি স্ফুটিত হয়, তখন হে মহাবিরাট! আমি সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যমধ্যে তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৮।

শশাঙ্কতারাপ্রতিবিম্বগর্ভান্
তোয়াশয়ান্ স্বচ্ছজলান্ সমীক্ষ্য।
উদেতি চিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
অনন্তবৈচিত্র্যময়ী মুকুন্দ!॥ ৯॥

যখন চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাশ-পট স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, হে মুকুন্দ! আমার হৃদয়মধ্যে তোমার অনন্ত-বৈচিত্র্য-ময়ী এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। ৯।

পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনানি
দৃষ্ট্বা সরিৎসাগরসঙ্গমাংশ্চ।
নামাবশেষাংশ্চ পুরাণদেশান্
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং স্মরামি॥ ১০॥

পবিত্র তীর্থ সকল, তপোবন সকল, নদী সমুদ্রের সঙ্গম সকল, এবং নামাবশিষ্ট প্রাচীন স্থান সকল দর্শন করিয়া, হে পুরাণ পুরুষ! আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান করি। ১০।

লীলাঃ শিশূনাং গৃহচত্বরেষু
গবাং প্রচারেষু চ বৎসলীলাঃ।
জলেষু পশ্যন্ জলপক্ষিলীলাঃ
স্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাম্॥ ১১॥

গৃহপ্রাঙ্গণে মধুরমূর্ত্তি শিশুগণের লীলা দর্শনে, গোষ্ঠে গোবৎসগণের লীলা দর্শনে, জলাশয়ে জলপক্ষিগণের লীলা দর্শনে, হে ভগবন্! তোমার অনন্তলীলাময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে নৃত্য করিতে থাকে। ১১।

স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে।
দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে॥ ১২॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগ-বৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! আমি তোমারি করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ১২।

মাণিক্যখণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈর্নিচিতানগণ্যৈঃ।
বনদ্রুমান্ বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে
স্মরামি তে মূর্ত্তিমপূর্ব্বরূপাম্॥ ১৩॥

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বনবৃক্ষ-সকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন আমি হৃদয়ে [illegible] রূপ মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৩।

বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা
কূলে সমুদ্রস্য সরিত্তটে বা।
যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিঃ
তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ১৪॥

কি বনস্পতি, কি ভূধর, কি নির্ঝর কি সমুদ্রকূল, কি নদীতট, যে দৃশ্য দর্শনেই [illegible]ন ভক্তির উদ্রেক হয়, আমি সেই দৃশ্য[illegible]ই তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৪।

কীটে পতঙ্গে চ সরীসৃপে চ
মীনে পশৌ পক্ষিণি মানবে চ।
স্থূলে চ সূক্ষ্মে চ জলে স্থলে খে
পশ্যামি তে রূপমনন্তরূপ!॥ ১৫॥

কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, আকাশ, যাহা-তেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হে অনন্তরূপ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৫।

ভূতেষু সর্ব্বেষু চরাচরেষু
দূরে সমীপে চ পুরশ্চ পশ্চাৎ।
বিলোকয়াম্যূর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
হে কৃষ্ণ! তে রূপমনন্তরূপ!॥ ১৬॥

চরাচর সমস্ত পদার্থে, দূরে, সমীপে, অগ্রে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, তির্য্যক্ ভাগে, হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৬।

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব!॥১৭॥

অহো! আমি তোমার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না, আমি অবাক্ স্পন্দহীন ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছি; হে দেব! কে আমি? কোথা আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৭।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে!
নমস্তে নমস্তে হরেঽচিন্ত্যশক্তে!
নমস্তে নমস্তেঽখিলাশ্চর্য্যসিন্ধো!
মহাদেব শম্ভো! নমস্তে নমস্তে॥ ১৮॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার, হে অচিন্ত্যশক্তিধারিন্ হরি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে নিখিল আশ্চর্য্যের আধার! তোমাকে নম-স্কার নমস্কার; হে মহাদেব শম্ভো! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ১৮।

ইতি শ্রীতারাকুমারকবিরত্নকৃতং
শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্।

আমারি যে দোষ !*

(১)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে যে কুরুচির হাঁড়ি,
বাঙ্গালী কুলের নারী,
নিরালা একা না পেলে ফিরে নাহি চায় !
নয়নে নয়নে কথা,
বোঝেনা সে অশ্লীলতা,
বাঙ্গালীর বোকা-বউ বোঝান কি যায় ?
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(২)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে যে পরে শাড়ী, ধুতি,
ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি,
এলো মেলো চুল তার বাতাসে উড়ায় !
পান খায়—রাঙ্গা ঠোঁটে,
মুখ ভ'রে রক্ত ওঠে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুরুচি পলায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৩)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
শোনে না অপরে যথা,
কোণে-কাণে কয় কথা,
সে বোঝেনা অশ্লীলতা আছে ইসারায় !
ঘোমটার তলে হাসি,
চুরি করা জ্যোৎস্না রাশি
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৪)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
মনে মনে ভাল বাসে,
লুকায়ে নিকট আসে,
চুপে চুপে কাঁদে হাসে, পাছে শোনা যায় !
আদরে ধরিয়া গলা,
থাক্ দুটো কথা বলা,—
চুম্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যায় !
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় !

(৫)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
দিনে নাহি দেখি ঘরে,
রেতে আসে দু'পহরে,
সে বেরুলে তারি শোভা উষা পরে গায় !
সে কালে বিদায় দিতে,
একটুকু বুকে নিতে
শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায় !
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় !

(৬)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
ঘোমটা—লজ্জার লেপ,
খু'লে সে না পরে 'কেপ্,'
করুণ আঁখিতে সে যে অরুণ ভুলায় !
কচি—খুকি—কাচা হেম,
সংকোচে রাখে সে প্রেম,
বডি-ভরা-ভালবাসা লেডী সে না হায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৭)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে নয়নে ফুলবাণ,
ফুলের ধনুকখান,
ছি ছি ছি ! তারে কি আর চখে দেখা যায় ?

---

*"আমারি কি দোষ ?" কবিতাটী পড়িয়া কেহ কেহ "আমারি যে দোষ" বুঝিয়াছেন, তাহাই এই কবিতাটীতে লিখিত হইল।

সে পরেনা 'ব্লুম্ রোজ',
বাখেনা রুচির খোজ,
বদনে মদন-ভস্ম পৌডাব শোভায
সে করেনা কামজয়—দিগ্বিজয় হায়!

(৮)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়।
সে জানে না ভ্রাতৃ ভাব,
সে জানে না "ফিরি লাভ্"
পর পুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায়!
যায় না বাগান পার্টি,
ভেরি আগ্লি, ভেরি ডার্টি,
ইয়াবের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়!
কোণে ব'সে ভালবাসে—শীলতা কোথায়?

(৯)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়?
জোবে সে জানে না কথা,
লাজে গলে ননী যথা,
সার্ম্মন্ লেক্‌চার দিতে পারে না সভায়!
সে জানে না সাম্যনীতি,
প্রেমে ধর্ম্মে মাখা গীতি,—
ধর্ম্মে 'এক'—প্রণয়েতে 'অনন্ত' যথায়,—
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে,
পাপ অনুতাপ শোকে
পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চোখে চায়,
গেল না সে হতভাগী 'সমাজে' তথায়!
সেত অতি দূরে—দূরে,
স্বপনের মত ঘুরে,
নিজের চরণ শব্দে চমকিয়া যায়,
অতি আস্তে—চুপে চুপে,
আসে যেন কোন রূপে
চুরি করে শুধু সে যে চুমো খে'তে চায়!
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়!

(১০)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়!
সে করেনি বি এ পাশ্,
বেথুন-কেতনে বাস,
কবেছে 'বাসর' বাস বিয়ে ফাঁসে হায়!
সে জানে না ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী-এট্‌সেট্রা,
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায়?
সে লেখে "তোমারি আমি,
প্রাণময় প্রিয় স্বামি!"—
নাহি ঝরে অশ্রুকণা তার কবিতায়!
দেয়নি সে কোর্টসিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে,
ফাটণ্ট যৌবন—ভরা জ্যাকেটে জামায়!
সে বলেনা সাদা সিদে,
মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে,
দূরে দূরে চুরি করে দেখিতে সে চায়!
আঁধারে জোনাকী কিবে,
মনোহব জ্বলে নিবে,
কনকেব কণা যেন ক্ষণেকে হারায়।
বোঝেনা যে হতভাগী পাপ কত তায়!

(১১)

আমারি যে দোষ—ভালবেসেছি তাহায়!
কিনে দিনু উল সূতা,
না বুনিল মোজা যুতা,
যত করে ছল ছুতা কত কব তায়!
না পাইল পুরষ্কার,
না করিল থিয়েটার,
না গেল সে এক দিন মহিলা-মেলায়!
এত উন্নতির দিনে,
নাহি দেখি তারে বিনে,
ফিটেনে চড়িয়া যে না ইডেনে বেড়ায়!

সে আছে আঁধার কোণে,
কারো কথা নাহি শোনে,
ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায়!
কে জানে যে কত কুড়ি,
সে করেছে চুমো চুরি
দিন নাই-রাত নাই—প্রদোষ-উষায়!
আমারো কুরুচি বেশি,
তারি সনে মেশা মেশি
শুনিয়া সুরুচিদের সূচি বিঁধে গায়!
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়।

(১২)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়!
এবে সে যে দেশে আছে,
কয়ে দিব কার কাছে,
থাকিলে 'সমাজ' তথা সেথা যেন যায়!
এম্ এ, বি এ, পাশ হবে,
বিশেও আবিয়ে বরে,
বেথুনে মিথুন-মেলা—কোর্টসিপ্ তায়!
স্বর্গ মন্দাকিনী পাশে,
চৌরঙ্গির শ্যাম ঘাসে
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া বেড়ায়!
মেনকার নাচ ঘরে,
থিয়েটার যেন করে,
যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায়।
আর যেন দেবপুরী,
করে না সে চুমো চুরি,
কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায়!
যেন অশ্লীলতা দোষে,
আর নিন্দা নাহি ঘোষে,
ঠাকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায়!
কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায়!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

চাকুরি।

প্রভু ও ভৃত্য।

আমাদের সেই নগর প্রান্তস্থিত উদ্যান—অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র বালক কখন ফুল তুলিতে ছুলিয়া ছুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। বাগানী কাজ করিতেছে। সম্মুখে গৃহস্বামী দণ্ডায়মান, সেই দেবমূর্ত্তির কনক-কান্তিতে উদ্যানের শোভা যেন আরও ফুটিয়াছে। সেই মহিমাময় দেহ যেন পবিত্র পুষ্পচয় রচিত, অথচ কেমন দৃঢ় গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। চরিত্রের রাজশ্রী মুখে কেমন বিভাবিত। গৃহস্বামী মালীকে বলিলেন, "তোমার কাজ আজ ভাল হয় নাই, আমি তোমার কাজে অদ্য অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" মালী পরিণত বয়স্ক, নূতন এই বাগানে লাগিয়াছে, অধিক কথা কহে না, নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিয়া যায়। মালী প্রশান্তভাবে উত্তর করিল, "মহাশয় আমার ধর্ম্মে যেরূপ বলে, সেইরূপ আমি কাজ করিয়াছি, আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আপনার যদি অনুমতি হয়, কল্য হইতে আমি আর কাজ করিতে আসিব

না।” গৃহস্বামী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন “আচ্ছা”। মালী সে দিন কাজ করিয়া সায়াহ্নে বাটী যাইল। তাহার পর দিন আর আসিল না। গৃহস্বামী নিজে স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী, নিজে বহু সম্মান ও প্রভুত্বের পদ প্রভুর ঈষৎ অসন্তোষ বাক্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ব্যক্তি, তেজস্বিতার আদর করেন। গৃহস্বামী জানিতেন, মালী অতিশয় দরিদ্র, তাহার স্ত্রী আছে, সে রোজকার না করিলে তাহার সংসার চলে না। তথাপি সে কাজে আর আসিল না। অন্য কোন স্থানে কাজেও লাগে নাই। নিজের কুটীরে বসিয়া আছে। গৃহস্বামী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে আসিল। গৃহস্বামী বলিলেন, “তুমি আমার কাছে থাকিবে না কি?” মালী প্রশান্তভাবে বলিল, “আপনি দয়া করিয়া রাখিলেই থাকি।” “হাঁ তুমি থাক। আমি বুঝিয়াছি, তুমি খাটী লোক।” তাহার পর সেই মালী যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন সেই মুনিবের নিকটই সম্মান ও আদরের সহিত চাকুরি করিয়াছিল।

সে জাতিতে চণ্ডাল, বড়ই দরিদ্র, তখন বয়স হইয়াছিল, যৌবনের সামর্থ্য তখন ছিল না। তথাপি মনের তেজ যাইবার নহে। যোল আনা খাটিত, বৃথা বাক্য ব্যয় করিত না, কিন্তু কাহারও, মুনিবেরও চড়া কথা সহ্য করে নাই। কেহ কখন তাহাকে চড়া কথা বলিলে, তাহার প্রশান্ত, দৃঢ়, অথচ শিষ্ট উত্তরে তখনি বুঝিতে পারিত যে, মূর্খ “ছোট লোক” হইয়াও সে ভদ্র লোক, দরিদ্র হইয়াও তেজস্বী, চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণ, ভৃত্য হইয়াও প্রভু। অনেক দিন হইল সেই মালী মরিয়া গিয়াছে। যে বৃক্ষগুলি সে রোপণ করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও এখন নাই। তথাপি মানসনেত্রে সেই ভৃত্যের প্রশান্ত তেজস্বিতা, অনুকরণীয় মহত্ত্ব, আমার হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছে। তবে কে বলে, চাকুরিতে নীচতা, অনতিক্রমণীয় ভাবে সংলগ্ন আছে? চাকুরিতে নীচতা নাই। নীচতা লোভে, নীচতা ভয়ে। নীচতা, প্রভুর কাছে মান বেচিয়া টাকা উপার্জ্জন করা। নীচতা, পাছে চাকুরী যায়, এই ভয়ে;—মনুষ্য মাত্রই যে সম্মানের অধিকারী, তাহা ত্যাগ করা। নীচতা, দেহের বিকাশের জন্য মনকে সঙ্কুচিত করিয়া টাকা রোজগার করা। নতুবা চাকুরিতে কিছুমাত্র নীচতা নাই। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, প্রভু, ভৃত্য অপেক্ষা অধিক মাননীয় নহে। প্রভু টাকা দেন, ভৃত্য তাহার বিনিময়ে কাজ দেন। প্রভু হয়ত গণ্ডমূর্খ—পিতার সঞ্চিত টাকা চাকরকে দিতেছেন, ভৃত্য নিজের বুদ্ধি বিদ্যা বল দিতেছেন। প্রভুর টাকার অপেক্ষা ভৃত্যের কার্য্যের কম মূল্য, কে বলিল? প্রভুও দান করিতেছেন না, ভৃত্যও দান করিতেছেন না—কেবল বিনিময় মাত্র। এক জন একটী দোকান করিল, দোকান চালাইবার জন্য এক জন চাকর রাখিল। তাহাতেই কি দোকানী তাহার চাকরের অপেক্ষা বড়লোক হইল? ধর, দোকানী মাসিক বেতন না দিয়া চাকরকে বলিল, “দেখ, তুমি লাভের অর্দ্ধেক পাইবে। আমার মূলধন, তজ্জন্য আমি লাভের অর্দ্ধেক পাইব, তোমার পরিশ্রম, তুমি তজ্জন্য লাভের অর্দ্ধেক পাইবে।” চাকর এখন অংশীদার। বুঝিয়া দেখিলে, চাকর সকল সময়ই প্রভুর অংশীদার—প্রভুর সাহায্যকারী মাত্র। ধর, আমি ধনী জমীদার, তুমি আমার শিক্ষিত কর্ম্মচারী—এখানে আমি নিজে একক যদি সমুদয় কর্ম্ম করিতে

পারিতাম, তাহা হইলে কর্ম্মচারী রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, রাখিতামও না। অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন, তাই তোমাকে চাহি। আমার সুবিধার জন্য তোমার বিদ্যা বুদ্ধি চাহি, তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির বিনিময়ে আমার টাকা চাও। সুতরাং অর্থও বিদ্যার বিনিময় মাত্র। শিক্ষিত কর্ম্মচারী সম্বন্ধে যে যুক্তি, অশিক্ষিত খানসামা ইত্যাদি সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটে এবং সেখানেও চাকুরী বিনিময় মাত্র, সাহায্য প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সাহায্য দান মাত্র। যখন চাকরের সংখ্যা অধিক, মুনিবের সংখ্যা কম, তখন মুনিবের গৌরব অধিক। যখন চাকরের সংখ্যা কম, মুনিবের সংখ্যা অধিক, তখন চাকরের গৌরব অধিক। এখন, বিশেষতঃ মফঃস্বলে, দিন দিন চাকর চাকরাণী দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, তাই চাকর চাকরাণীর গৌরব দিন দিন অধিক হইতেছে। এমন কি, অনেক স্থানে মুনিব তাহাদের অপমান করা দূরে থাকুক, তাহারা মুনিবকে অপমান করিয়া তাহার পর দিন আর কাজে আসে না। আমার পরিচিত একটী রায় বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাটীর এক জন দাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত অতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কলহ করে, এবং তাহার পর দিন আসে নাই। তাহার মত কার্য্যে সুপটু অন্য একটী দাসী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, তাহাকে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পর দিন ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি কাজ কর। (হাসিতে হাসিতে) তুমি আবার আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিও।" তুমি হয়ত বলিবে, "সামান্য একটা চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা কত দেখ।" চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা নহে, Law of Supply and demand, প্রয়োজন অপেক্ষা আয়োজন কম। প্রয়োজন মত দাসী পাওয়া কঠিন, তাই দাসীর এখন এত আদর।

বুঝিয়া দেখিলে সংসারে কেহ কাহারও প্রভু নহে, কেহ কাহাও ভৃত্য নহে। এক মাত্র প্রভু ভগবান, কেবল তাঁহারই ভৃত্য আমরা সকলে। মানুষ মোহে যখন অন্ধ হয়, তখনই সে আপনাকে কাহারও প্রভু মনে করে। তথাপি কোনও মানুষকে যদি প্রভু বলিতে চাহ, তবে তাঁহাকে প্রভু বলিও, যিনি আপনার রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছেন—যিনি লোভে ভয়ে মোহে কখন অভিভূত হন না—যিনি আত্মাকে হৃদয়ের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন, —যিনি মনুষ্য মাত্রতেই নারায়ণের অংশ দেখিয়া ভৃত্যকেও সম্মান ও ভক্তি করেন। তিনিই প্রভু,—যাঁহার হৃ[illegible] শ্রীক্ষেত্রে, [illegible] মহোৎসবে, [illegible] ভৃত্যের, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের, [illegible] শত্রুর মধ্যে ভেদ নাই, সকলই একাকার, প্রেমের প্লাবনে সকলই একাকার, সকলই প্রাণের ভাই। তাই চৈতন্যদেব, প্রভু।

আমি চাকুরিকে বিনিময় বলিয়াছি। টাকার ও শ্রমের বিনিময়—অথবা ভূতকালের শ্রমের (অর্থাৎ ভূতকালের শ্রমে অর্জ্জিত টাকার) এবং বর্ত্তমান কালের শ্রমের বিনিময়। আমার অর্থ এমন নহে, চাকুরিতে কেবল অর্থ ও শ্রমের বিনিময় মাত্র থাকা উচিত। না, ইহার সহিত হৃদয়ের বিনিময় থাকা উচিত। প্রভু ও ভৃত্যের ভিতর এদেশে পূর্ব্বে যে একটী পারিবারিক ভাব ছিল, একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল, তাহা বিলাতী সভ্যতার

হেয় অনুকরণে নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ধোপা নাপিত ভাণ্ডারী প্রভৃতি যেন পরিবারের ন্য গণ্য হইত। তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা হইত না। মামা, দাদা, খুড়া প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান হইত এবং তাহা বলিয়া ডাকা হইত। আমি এবং আমার সহোদরগণ বাল্যকালে বাটীর গোয়ালা ভাণ্ডারিকে "গিরীশদাদা" বলিয়া ডাকিতাম, মনে আছে। গিরীশদাদাকে আমরা খুব ভয় করিতাম, ও সম্মানও করিতাম। তাহার শাসনে আমাদের বাল্যলীলার ধ্বংসপ্রিয়তা অনেকটা দমিত হইত। সে আমাদের কত ভাল বাসিত। আমাদের পরিবারের বিপদ ও অনিষ্ট নিজের বিপদ ও অনিষ্ট মনে করিত। এ বিষয় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কর্ত্তারা চাকরদিগকে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাহাদের সন্তানগণকে কোলে লইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, নব্য বাবুরা কুকুর কোলে করিতে পারেন, কিন্তু চাকরের পুত্র কখন কোলে করিতে পারেন না, যেন কোলে করিলে দেহ অশুচি হয়। প্রভু ও ভৃত্যে আজি কালি হৃদয়ের বিনিময় নাই। বড় দুঃখের বিষয়। আজ কাল—কাজ করিলে টাকা দিলাম চুকিয়া যাইল, —ভাব এই রকম। এটা একটা সামাজিক বিকার। টাকাতে ঋণ শোধ হয় না। টাকার সম্বন্ধে ছাড়া আরও সম্বন্ধ আছে, তাহা উচ্চতর পবিত্র সম্বন্ধ।—"We have profoundly forgotten everywhere that *Cash-payment* is not the sole relation of human beings; we think nothing doubting, that *it* absolves and liquidates all engagements of man." প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে সখা—উভয় উভয়ের মঙ্গলের জন্য দায়ী। প্রত্যেক প্রভুর জানা উচিত, ধনে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ক্রয় করা যায় না, ধনে শ্রম ক্রয় করা যায় মাত্র। এমন কি, ধন বিতরণ করিলেও ভালবাসা পাওয়া যায় না। ভালবাসা, ভক্তি, হৃদয়ের ধন। হৃদয় না দিয়া কেমন করিয়া তাহা পাইবে?

"স্বর্গের জ্যোতি যাহা
মৃত্তিকায় কেমনে রচিবে তাহা।"

"ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"

একটা গল্প আছে, মিলিসে নামক একজন ধনী ব্যক্তি খুব দান খয়রাৎ করিত, লোক জনকে খুব খাওয়াইত। গৃহে নিত্য ভোজ দিত। তথাপি সে দেখিল, কেহ তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিত না। সে বিষণ্ণ হইয়া জেরুজিলামে জ্ঞানী সালিমান সম্রাটের নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিল। প্রবুদ্ধ সালিমান কেবল মাত্র বলিলেন, "যাও, ভালবাসিও।" যার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে প্রভু হউক, ভৃত্য হউক, সে একটা পশু বিশেষ। এমন ভীষণ নরহত্যা নাই যে সে তাহা করিতে পারে না। আর যাহার হৃদয় ভালবাসার বীণার ধ্বনিতে নিত্য সঙ্গীতময়, ভৃত্য হইলেও সে বৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রভুর প্রসাদে নিত্য নিত্য নূতন প্রভুত্ব লাভ করিতেছে। জগতে যিনি হৃদয়ের সহিত বহু লোকের সেবা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রভু,—যিনি লক্ষ জনের পদরেণু প্রেমে ভক্তিভরে প্রণতশিরে বহন করেন; তিনি যথার্থই লক্ষপতি,—যিনি মহাসেবক, তিনিই মহাপ্রভু।

গরিব ব্রাহ্মণ।

তত্ত্বকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১০১। তুমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া যাহাদিগকে তৃণতুল্য গণনা করিতেছ, সর্ব্বদা যাহাদের প্রতি কতই না অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছ, মৃত্যু হইলে তাহাদের দেহও মাটীই হইবে, তোমার দেহও মাটীই হইবে। তুমি স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজত্বই কর, আর অন্যে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাই করুক, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমারও যে দশা, অন্যেরও তাহাই। সেই বিচারকের নিকট গেলে সকলকেই সমভূমিতে আসিতে হইবে। ধনী বলিয়া তুমি কিছু দরিদ্র হইতে অধিক সম্মান পাইবে না। এখন তুমি যে সমস্ত বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভোগ সুখে মত্ত আছ, সে সমস্তই তোমার পড়িয়া থাকিবে। দাস দাসী, পুত্র কন্যা, কেহই তোমার সঙ্গী হইবে না। তুমি যেমন উলঙ্গ অবস্থায় একাকী পৃথিবীতে আসিয়াছ; বিদায়ের সময়েও তেমনি উলঙ্গ শরীরে একাকীই তোমাকে যাইতে হইবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বিক্রম, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা প্রভৃতি যাহারা এক্ষণে তোমার বক্ষ স্ফীত করিয়াছে, যাহারা এতদিন তোমাকে অহঙ্কারের স্কন্ধে চড়াইয়া উচ্চে উঠাইয়াছে, দেখিবে, তাহারাই একত্র হইয়া শেষে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়া নরকের পথে টানিবে। এখন তুমি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে যে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছ, সেই রসনা দ্বারাই অতি কর্কশ ও কঠোর বাক্যে অপরকে মর্ম্ম পীড়া দিতেছ। সেই রসনা তোমার কীটের আহার্য্য হইবে। এই বেলা রসনায় ঈশ্বরের গুণানুবাদ গান করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদন কর। যে চক্ষুর ক্রোধ-রঞ্জিত বক্রাক্ত দৃষ্টিতে অপরকে ভস্মীভূত প্রায় করিয়াছ, যাহা কুচিন্তার সাহায্যে কুদৃশ্য ব্যতীত দেখে নাই, তাহা পিপীলিকার উদরস্থ হইবে। সময় থাকিতে সেই চক্ষুকে ভক্তি রসার্দ্র ভাবে ঈশ্বরের সুকৌশল পূর্ণ সৃষ্টি দর্শন করিতে শিক্ষা দেও। যে কর্ণ মিথ্যা স্তুতিবাদ শুনিতে সন্তুষ্ট ও সত্য কথা শুনিতে কষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমের কীর্ত্তন শুনিতে নিযোজিত কর। যে নাসিকায় বিবিধ সৌগন্ধ পূর্ণ বিলাস দ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়াছে, তাহার প্রতি নিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম হৃদয়স্থ কর। যে ত্বকে, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সুকোমল শয্যা ও কোমলাঙ্গী সুন্দরী কামিনীর স্পর্শ সুখ লাভে নিয়োজিত ছিল, তাহাকে কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা শয়নে অভ্যস্ত কর। হস্তকে দুঃখীর দুঃখ মোচনে মুক্ত করিয়া দেও। পদকে পাদুকাহীন করিয়া ঈশ্বরের নাম বিস্তার করিতে ভ্রমণে নিযুক্ত কর। তোমার সকল ইন্দ্রিয় তাঁহারই কার্য্যে খাটিতে শিক্ষা করুক।

মোস্ নবীতে উক্ত আছে—

১০২। তুমি কারুণের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ও আলেক্‌জাণ্ডারের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্ বিজয়ী ভূপতি হইলেও তোমাকে গোরে যাইতে হইবে। আলেক্‌জাণ্ডার নিজ বাহু বলে পৃথিবীর বহুতর জনপদ করতলস্থ ক-

বিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে কিছুই সঙ্গে লইতে পারেন নাই। তিনি মুমূর্ষু সময়ে অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যু হইলে যখন তোমরা কাফন (শবাচ্ছাদিত বস্ত্র) পরাইয়া গোরের সমীপে লইয়া যাইবে, তখন আমার হস্ত কাফনের বাহিরে রাখিবে। কেন না, তাহাতে লোকে জানিতে পারিবে যে, সম্রাট লোভ পরবশ হইয়া দুর্ব্বল রাজগণের রাজ্য সকল তাঁহাদিগের হস্ত হইতে অচ্ছিন্ন করিয়া স্বকীয় রাজ্যে সংযোজিত করিয়াছিলেন, অপরিসীম ধন রাশি লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত কোথায় রহিল? মাতৃগর্ভ হইতে যেমন খালি হাতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই রূপ খালি হাতেই যাইতে হইল?

এ সংসারে ধন, বিক্রম, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য মান, অভিমান, গর্ব্ব কয় দিনের জন্য? সকলেরই পরিণতি আছে। সকলেরই বিকাশ ক্ষণকালের জন্য। তবে কেন লোকে অসার গর্ব্বোন্মত্ত হইয়া এত আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। মহম্মদ গজনবী (সুলতান মামুদ) দেশ লুণ্ঠন করিয়া রাশিকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চরম সময়ে তাঁহার অমাত্যবর্গকে সেই পর্ব্বত প্রমাণ ধন রাশী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলেন। মামুদ তত্তাবৎ অবলোকন করিয়া অনুতাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কোহিনুর, তুমি কত অতীত ঘটনার সাক্ষী! যখন যাহার প্রবল প্রতাপ, তুমি তখনই তাহার শীর্ষ দেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছ। আবার তাহাকে ভিখারী সাজাইয়া তুমি আর এক গৌরব-বাঞ্ছিত ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তির চূড়ায় আরোহণ করিয়াছ। তোমার লোভে ধরণী রক্ত-স্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। তুমি অগণিত নব-শোণিতে স্নান করিয়া দিগ্বিজয়ী রাজার মাথায় গিয়া বসিয়াছ। এখন সাত সমুদ্র পারে গিয়া যাঁহার মস্তকের শোভা সম্পাদনে নিযুক্ত আছ, তাঁহারই বা এ গৌরব কয় দিনের জন্য? তুমিই তাহার সাক্ষী!! তুমিই তাহার সাক্ষী!! তুমি ইতিহাস, তুমি শিক্ষক। তোমাকে অধ্যয়ন করিলে অনেক গর্ব্বিত রাজার পরিণাম স্মরণ হয়। পৃথিবীর ক্ষমতা দম্ভ প্রভৃতির অসারত্ব প্রতীয়মান হয়। তুমি সকলের শিক্ষাগুরু। যে সাহাজান বাদসাহ ময়ূর সিংহাসনে বসিয়া তোমাকে মস্তকে ধারণ করত পৃথিবীতে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিতেন, যাঁহার নিৰ্ম্মিত তাজমহল এখনও পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য দ্রব্যের একটী, সেই জাঁকজমকশালী সম্রাটের শোকসূচক স্মরণচিহ্ন ব্যতীত আর কি আছে? কোহিনুর, তুমি গম্ভীর স্বরে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতেছ, সকলই ক্ষণভঙ্গুর। সকলই ক্ষণভঙ্গুর!! সকলই ক্ষণভঙ্গুর!!!

১০৩। তুমি ঐশ্বর্য্যশালীর দুর্গতি বুঝিতে পারিলে আর কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুঃখিত হইও না। অভাবকে অভাব বোধ করিও না। সাংসারিক অভাবের মোচন হয় না।

তুমি যে ধনে বঞ্চিত, অভাব-সাগরে ডুবিয়া সেই রত্নের উদ্ধার কর। আত্মার অভাব পূর্ণ হইলে পার্থিব কোন অভাব থাকে না। তখন লোষ্ট্র কাঞ্চন, বিষ্ঠাচন্দন, সদন্ন কদন্ন সমান হয়। সকল আশা আকিঞ্চন মিটিয়া যায়। এক মাত্র ভগবানই

তোমার অন্তরে আনন্দময়রূপে দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপন করিবেন।

হাফেজ বলিয়াছেন—

১০৪। এক দিন পাদুকা না থাকায় দুঃখিতান্তকরণে বেড়াইতে বেড়াইতে কোন পান্থ নিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, এক ব্যক্তির পা-ই নাই, তখন আমার মনের ক্ষোভ দূরীকৃত হইল। সেই ব্যক্তির গলিত চরণ আমার জ্ঞান নেত্রের বিকাশ করিয়া দিল। তখন আমি ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম, হে ঈশ্বর, তোমার দয়ায় হাফেজের কোনই অভাব নাই। যাহাকে অভাব মনে করিয়া হাফেজ দুঃখিত হইতেছিল, তোমার রাজ্যে শত সহস্র লোকে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ অভাব ভোগ করিতেছে। হাফেজ, তুমি ধন্য! তুমি জন্ম মাত্র জননীর সুকোমল স্তন পান করিতে পাইয়াছ; পৃথিবীর জল, বায়ু, তাপ, শৈত্য, ফল শস্য সকলে তোমার জীবন রক্ষার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিয়াছে। তুমি আজি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরে পরম পিতার সম্পূর্ণ দান গ্রহণ করিতে সমর্থ আছ, তোমার তুল্য ভাগ্যবান কে? হে মহিমাসাগর ভগবন্! তোমার মহিমা বুঝা কাহার সাধ্য।

১০৫। এব্রাহিমকে নমরুদের অগ্নি মধ্য হইতে, যোসেফকে কেনাণের অন্ধকূপ হইতে, ইউনসকে মৎস্যের উদর গহ্বর হইতে, আয়ুবের গলিত শরীরকে তাহার মস্তিষ্ক স্থিত কীটের দংশন হইতে, মুষাকে নীলনদ হইতে যিনি উদ্ধার করিলেন, যিনি প্রহ্লাদকে হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপের সময়ে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রক্ষা করিলেন, সেই অনন্ত শক্তিময় দয়ার সাগর পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে, তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করিলে, পৃথিবীর সমস্ত বিপদরাশি একত্র হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারে না। ভক্তবৎসল হরিভক্তের কাতর আহ্বানে কর্ণ না দিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তের মান, ভক্তের আবদার রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান ভক্তের অনুগত, যে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া ডাকে, তাহাকেই তিনি দর্শন দেন। তাঁহার নিকটে জাতির বিচার নাই, ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই, সকলেই তাঁহার স্নেহের সন্তান। তাঁহার অভয় হস্ত সকলেরই মস্তকের উপর প্রসারিত আছে। তাঁহার অবাধ্য পাপী সন্তানও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া পাপভার হইতে উন্মুক্ত হয়। তিনিই দস্যু রত্নাকরের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনিই পাপী জগাই মাধাইয়ের মুক্তিদাতা।

১০৬। পরম গুরু প্রেরিত মহম্মদ তাঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শিষ্যবর্গকে মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ, যে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করে। মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যাহাতে নামের গৌরব নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

মুসলমান শব্দের অন্য অর্থ, প্রেমপূর্ণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই বিবেকবাণীতে কোরাণ পরিপূর্ণ। তিনি অতি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু ভগবানের অনন্ত কৃপায়, জ্ঞানের মহিমায়, পরম পণ্ডিতের ন্যায় মহামূল্য উপদেশ সমস্ত প্রদান করিয়া ভগবৎ কৃপার মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। মহম্মদ তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম চারি শাখায় বিভক্ত করেন। সরিয়ত,

তরিকত, হকিকত এবং মারফত। সরিয়ত অর্থ, সাধারণ মুসলমানী সমাজ। তরিকত (সত্যপথাবলম্বনে অলৌকিকতা প্রকাশ) হকিকত (তত্ত্বজ্ঞান), মারফত (দর্শন)।

১০৭। মুসলমান ধর্ম্মের পাঁচটী সোপান;—

১। কল্‌মা। মহম্মদকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া এবং ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করা।

২। নামাজ। দিবা রাত্রে পাঁচবার প্রেমপূর্ণ স্বরে তাঁহার উপাসনা করা।

৩। রোজা। বৎসরে এক মাস সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া ভগবানের উপাসনা ও উৎসব করা।

৪। জাকাত। অর্জ্জিত সম্পত্তিতে অংশ দান করা এবং দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করা।

৫। হজ্জ। জীবনের মধ্যে অন্ততঃ এক বার মক্কায় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আরফত পর্ব্বতের শিখরে নবলক্ষ লোকের সহিত যোগ দিয়া উপাসনা করা।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উপদেশ আছে, তাহা মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

সত্যধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিবেক-বাণীতে বিশ্বাস এবং আদম হইতে মহম্মদ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবী, এক কালে বিলয় হইবে। পৃথিবীতে মন্দ করিলে পরকালে মন্দ এবং ভাল কার্য্য করিলে ভাল ফল ভোগ করিতে হয়। আত্মা নিত্য, ইহা অনন্তকাল আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে।

১০৮। আজ যাহাকে শিশু দেখিতেছি, যে অর্দ্ধ-মুকুলিত-দশন বিকাশ করিয়া মধুময় হাসিতে জনক জননীর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে, যাহার আধ আধ কথায় জনক জননীর প্রাণে সুধার উৎস উঠিতেছে, সেই শিশু দেখিতে দেখিতেই শৈশব সীমা উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল। এখন সে হাস্য নাই, সে প্রাণস্পর্শী কথা নাই, এখন বালক বিদ্যা শিক্ষায় নিপুণ। এখন তাহার মনে চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে কৈশোরও চলিয়া গেল। সে শিশু আজ যুবা। আজ তাহার মনে কত ভাবনা, চিন্তা, কে তাহার অন্ত করে? সংসার সুখের অনন্ত বাসনা তাহাকে নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছে। কখনও হতাশার কালিমা তাহার উৎসাহোৎফুল্ল বদন মেঘাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় মলিন করিতেছে। কখনও স্ত্রী পুত্রের সম্মিলনে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। পরক্ষণেই অন্ন চিন্তা, পুত্রের পীড়ার চিন্তায় মুর্ম্মুর দাহনে বিদগ্ধ হইতেছে। কাল যে পিতা মাতা সতত মুখ চুম্বন করিয়াছেন, যাঁহাদের কৃপায় একটুও ভাবিতে হয় নাই, আজ তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া যুবা পুত্রের চিন্তা বৃদ্ধি করিতেছেন। যুবা আজ চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত, খাটিতে খাটিতে অবসন্ন। কপালে চিন্তার রেখা পড়িল। অলক্ষিত ভাবে এক দুই করিয়া কেশগুলি শাদা হইয়া উঠিল। দন্তগুলিও বিদায় গ্রহণ আরম্ভ করিল। চক্ষুর দৃষ্টি কমিয়া আসিল। চর্ম্ম লোলিত হইল। আজ সেই কন্দর্প-নিন্দিত সুন্দর পুরুষ কুৎসিতের একশেষ। বলবীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ, সকলই হত। বৃদ্ধ ক্রমে সম্পূর্ণ পরবশ হইয়াছেন। এখন কবে পৃথিবী হইতে বিদায় হইবেন, সেই শেষ দিন গণনা করিতেছেন। এখন বৃদ্ধ যৌবনের পাপরাশি স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। পরকাল ভাবিয়া

ভয়ে কম্পবান হন। যৌবনের দুর্দ্দমনীয় লালসায় কত কি করিয়াছেন। এখন সেই সকল মনে হইয়া অন্তরে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা প্রদান করে। পূর্ব্বে অম্লান বদনে পাপ কার্য্য করিয়াছেন, এখন পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বদা ভয়ত্রস্ত চিত্তে পুত্রকে উপদেশ দেন। দেখিতে দেখিতে সে জরা-জীর্ণ শরীর খানিও বিলয় হইল। আত্মীয় স্বগণবর্গ একবার কাঁদিয়া বিস্মৃত হইলেন। পৃথিবীতে কালকার সেই শিশুর অস্তিত্ব আর নাই। তাহা কালের অনন্ত উদর-কন্দরে মিশিয়া গিয়াছে।

একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প কিয়ৎ কাল হাতে করিয়া রাখ। তোমার চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে তাহার সুশোভন দল গুলি কুঁকড়িয়া যাইবে। মনোহর সুরভি গন্ধের স্থানে দুর্গন্ধ জন্মিবে। মনোজ্ঞ শোভা সৌগন্ধের বস্তুটীর কোনই আদর থাকিবে না। তুমি আমি, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা বন্ধু, ফল পুষ্প, বৃক্ষ লতা, সকলেরই একই দশা। জগতের এই অস্থায়িত্ব সর্ব্বদাই দেখিতেছ, কিন্তু দেখিয়াও দেখ না। ঘোরতর অজ্ঞানতা এককালীন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, দেখিবে কি? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, জগতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবে। দেখিবে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সেই হরি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমি যাহাদিগকে তোমার বলিয়া কতই না অহঙ্কার করিতেছ, যাহা-দের জন্য জীবন ক্ষয় করিতেছ, চৌর্য্য, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়া প্রভৃতি বিবিধ পাপের ভার মস্তকে ধারণ করিতেছ, তাহারা কেহই তোমার নয়। কেহই তোমার পাপের অংশী হইবে না। তখন অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবে। তোমার এ জীবন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায়। একটু বাতাসেই ইহার পতন হইবে। এই বেলা সময় থাকিতে সেই করুণাময়ের নিকটে আত্ম দুঃখ জানাও। তোমার পাপরাশির জন্য তাঁহার নিকটে কাতরভাবে প্রার্থনা কর। তিনি কৃপা করিয়া তোমার সকল পাপ মোচন করিবেন। শৈশবকাল ক্রীড়া কৌতুকে, যৌবন ভোগ সুখে মত্ত হইয়া কাটা-ইলে। এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত। এখনও যদি বিষয় লালসাতেই মত্ত থাক, তবে তোমার বিষম সঙ্কট। আর দুই দিন পর তোমার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইবে। চক্ষু দেখিবেনা, কর্ণ শুনিবেনা, রসনা বলিবেনা। সুধা য় হরি নামের মধুর আস্বাদ তোমার পশু জীবনে ঘটিবেনা।

দেখ, তোমার ভোগ বাসনার তৃপ্তি হইল না, কিন্তু তুমি কালের গ্রাসভুক্ত হইতেছ। তপশ্চরণ করিলে না, কিন্তু তুমি তপ্ত হই-তেছ। কাল যাইতেছে না, কিন্তু তুমি যাইতেছ। তৃষ্ণা জীর্ণ হইতেছে না, তুমি জীর্ণ হইতেছ। তুমি যে তৈমুর সাহের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যে দিগ্‌বিজয়ী মোগল বীরের বংশে, বাবর, হুমায়ুন, আক-বর, জাহাঙ্গীর সাহ জাহান প্রভৃতি সম্রাটগণ পৃথিবীতে শৌর্য্য বীর্য্য ক্ষমতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এক কালে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" সম্মান পাই-য়াছেন, তাঁহারাই যদি না ভোগ বাসনায় তৃপ্ত হইলেন, তবে তুমি ত কীটাণু কীট। তাঁহারা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়াও লালসা জয় করিতে পারিলেন না, তুমি ত পরের দাস। ভোগ লালসার পার নাই, অন্ত নাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার পৃথিবী জয় করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,

তাঁহার আর জয়ের স্থান নাই! তাঁহারই আশার অবধি হইয়া ছিলনা, তুমি কি চাও? একবার জ্ঞাননেত্রে তোমার পূর্ব্ব পুরুষ মোগল সম্রাটগণের দিকে তাকাও, তোমার দম্ভ, অহঙ্কার, মান, অভিমান, আশা লালসা সমস্ত চূর্ণীকৃত হইবে। যিনি রাজার রাজা, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সেই রাজার শরণাগত হও। যাঁহার কটাক্ষে অনন্ত কোটী জগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইতে পারে, সেই মহান ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কর। তিনি যেমন মহান, তেমনি দয়ারও সাগর। তিনি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তোমার কাতরোক্তিতে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহার অভয় ক্রোড়ে তোমাকে স্থান দিবেন। তোমার মনের ব্যথা তাঁহাকে জানাইও, হৃদয়ে বল পাইবে, শান্তি পাইবে। প্রাণ ভরিয়া বদন ভরিয়া তুমি নিজে মাতিয়া জগতকে মাতাইয়া একবার হরি * বল। হরির অমৃতময় নামে জগৎ অমৃতময় হইবে। পাপ তাপ দূরে পলায়ন করিবে। অতএব হৃদয় খুলিয়া হরি বল। (সমাপ্ত)

শ্রীমির্জ্জা আমিনউদ্দিন আহাম্মদ।

* যিনি পাপ হরণ করেন, তিনিই হরি।

ভারতীয় মুদ্রা।

(প্রথম প্রস্তাব)

বকল্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত তাঁহার "সভ্যতার ইতিহাস" নামধেয় জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কোনও পতিত জাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে, অতীত ইতিহাসের আলোচনা করা সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজন। সেই পরপদানত পতিত জাতির পূর্ব্ব গৌরব বা পূর্ব্ব মহিমার যদি কিছু লিপিবদ্ধ বিবৃতি থাকে, তাহা হইলে সেই মহামূল্য বিবৃতির সমালোচনা ও শিক্ষা দ্বারা, পতিত জাতিকে উত্তেজিত এবং স্বদেশবৎসলতায় অনুপ্রাণিত করা উচিত; ইহাই ইতিহাসের মহাফল এবং ইহার জন্যই ইতিহাসের প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন।" বকলের এই মহামূল্য বচন গুলি কত দূর সমিচীন এবং সূক্ষ্মদর্শিতা পরিপূর্ণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের অর্দ্ধমৃত ও অধঃপতিত জাতিদিগের পক্ষে এই কথা গুলি সঞ্জীবক মহামন্ত্র স্বরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি পতিত মানবের কোনও ইতিহাস নাই; ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা কেবল বালক শিক্ষার পক্ষেই শোভা পায় বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ এত দূর স্বার্থান্ধ, স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-পক্ষপাতী এবং বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী যে, অনেক সময়ে জলন্ত ও জীবন্ত সত্যকেও অপলাপিত করিয়া আপনার স্বার্থ এবং আপনার ভ্রান্তমতকে রক্ষা করিতে অসম্মত হয়েন না।

আমি নিজে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় দুই

বার পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি; বোধ হয়, ভারতের এমন কোনও প্রাচীন বা আধুনিক ঐতিহাসিক স্থান নাই, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। বম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-ভারত, মালোয়া, মারোয়ার, মেওয়ার, নিমার, খান্দেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতির অন্তর্গত প্রয়োজনীয় স্থান ও দৃশ্য সমূহ আমি নানা কারণে অনেক দিন ব্যাপিয়া বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। ভ্রমণ কালে একটি বড় ভাল কাজ করিযাছি; বহুস্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। ভারতেব অনেক স্থানে এমন কত শত প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক স্থান ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব রহিযাছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসের বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস বা ভূগোল নাই, কিন্তু কোন মনিষী ব্যক্তি প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিলে, আমার বহু চেষ্টায় সংগৃহীত বিবরণ সমূহ বোধহয় ভারতের প্রকৃত ইতিহাস-শরী-রের কঙ্কালার্দ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিবে। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভারতের যে সকল ইতিহাস নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা মাত্র। যাহাই হউক, ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিরপেক্ষ ইতিহারের যে সম্যক প্রয়োজন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

বহু দিনের চেষ্টা, বহু অর্থব্যয়, বহুবিধ গ্রন্থাদির পাঠ, বহুসংখ্যক সুযোগ্য মনিষীর প্রতিভার একত্রে সংযোগ এবং আমার ন্যায় নানাস্থান পরিভ্রমণ ব্যতীত এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। এবম্প্রকার উপা-য়াদির দ্বারা উদ্যম সফল হইলেও, চারিটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সহায়তার আবশ্যক। প্রথম,—অপ্রকাশিত দস্তাবেজ, গুপ্তলিপি, নীলপীঠ, সেরেস্তা, দপ্তরনামা, রোবকারী, ফার্খৎ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পাঠ। দ্বিতীয়,—ঐতিহাসিক স্থান সমূহে প্রচলিত মৌখিক ইতিহাস ও জনপ্রবাদাদির সংগ্রহ। তৃতীয,—প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, কূপ, দুর্গ ইত্যাদির গঠন দর্শন। চতুর্থ,—মুদ্রা ও তাম্রফলক।

আমার সুদীর্ঘ ভ্রমণ কালে, আমি আর একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছি। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় দুই শত পঞ্চত্রিংশ প্রকার মুদ্রা এবং তৎসহ চারি পাঁচটি অতি প্রাচীন তাম্র ফলক সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সকল প্রয়োজনীয় প্রাচীন মুদ্রা এবং তাম্রফলক আমার নিকটে আছে, এবং ভরসা করি এক সময়ে পুরাতত্ত্বানু-সন্ধায়ী মহাপুরুষদিগেব মহা প্রয়োজনে আসিবে। ভারতের মুদ্রা সকলের ধাতু বিবেচনা করিলে, তাহাদিগকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করা যায়, তদ্যথা (১) সুবর্ণ মুদ্রা (২) রৌপ্যমুর্দ্রা (৩) তাম্র মুদ্রা (৪) রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা, এবং (৫) উত্তরা খণ্ডী মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকারের মুদ্রার ধাতু ঐ কয়েক প্রকার ধাতু হইতে ভিন্ন; তাহা পরে বলিব।

রাজনৈতিকভাবে বলিতে গেলে, ভার-তের মুদ্রা সমূহকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ২। হিন্দু রাজাদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ৩। মুস-লমান শাসকদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ৪। ভার-তবর্ষস্থ ফরাসি গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা। ৫। ভার-তবর্ষস্থ পর্টুগীজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা। ৬। স্বল্প কালের জন্য ভারতবর্ষীয় ওলন্দাজদিগের প্রব-

র্ত্তিত মুদ্রা। ৭। স্বাধীন রাজ্যের মুদ্রা। এদেশে জৈনেরা কখনও প্রকৃতরূপে রাজত্ব করিতে পায় নাই, সুতরাং তাহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা নাই; বৌদ্ধেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক প্রকারের তাম্রফলক ব্যতীত তাঁহাদের কোনও প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায় না। গ্রীকোবাকট্রিয়ান সমসাময়িক কয়েক প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণ কালে সৈন্যপুঞ্জের দ্রব্যাদি সহ আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষস্থ গোয়া প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজদিগের এবং পণ্ডিচারী প্রভৃতি নগরীতে ফরাসীদিগের মুদ্রা প্রচলিত আছে। এই সকল স্থানের মুদ্রা বৃটীশ ভারতে প্রচলিত হয় না, কিন্তু বৃটীশ ভারতের মুদ্রা, এই সকল স্থানে বাজারের উট্‌তী কম্‌তী দর হিসাবে, কখনও ইংরেজী মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে অল্প বা অধিক মূল্যে বিনিময়িত হইয়া থাকে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত রৌপ্য, তাম্র এবং সুবর্ণ মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা পাঠকবর্গের সকলেই বোধ করি অবগত আছেন। এদেশে নেপাল ও ভোটান ভিন্ন আর কোনও স্বাধীন রাজ্য নাই; বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটী রাজ্যকেও "স্বাধীন" বলিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, ইহাঁদের মুদ্রা ইহাঁরা নিজেই প্রস্তুত করেন। করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহে ইংরাজের মুদ্রা চলিয়া থাকে, কিন্তু বাজারের উট্‌তী কম্‌তী হিসাবে কখনও মূল্যের তারতম্য হয়। একটী "দেশীয় রাজ্যের" মুদ্রা অন্য একটী "দেশীয় রাজ্যে" (Native State) প্রায় চলেনা। অনেক করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজা বা নবাবেরা আপনাপন টাকশালা হইতে আপনাপন রাজ্যের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা (যথা আলোয়ার, দেওয়াস প্রভৃতি) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের টাকশালার দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া লয়েন। কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র মুদ্রা নাই; নিকটবর্ত্তী কোনও প্রবল রাজা বা নবাব থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রায়ই প্রবল রাজা বা নবাবের মুদ্রা চলিয়া থাকে, কোথাও বা স্বতন্ত্র মুদ্রারও প্রচলন দেখিয়াছি। কখনও কখনও এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় ইংরাজ রাজ্যের স্থান বিশেষে ইংরেজ মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মুদ্রাও প্রচলিত হইয়া থাকে; আবার এমনও হইয়া থাকে যে, দেশীয় রাজার বংশ, রাজ্য, চিহ্ন প্রভৃতির কিছুই অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাঁহার নামের মুদ্রা এখনও চলিয়া যাইতেছে! প্রথম পক্ষের দৃষ্টান্ত ডুমরাউন, বক্সার, মুঙ্গের, আরা প্রভৃতি "ঢেউয়া" বা "ডেপুয়া" মুদ্রা; দ্বিতীয় পক্ষের দৃষ্টান্ত, পুনা, সোলাপুর প্রভৃতিতে প্রচলিত মহারাষ্ট্র রাজা রাজা'রাও পেশোয়ার প্রবর্ত্তিত মুদ্রা।

বেদাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ নাই, মনু সংহিতায় মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মনু যে ভাবে মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন, এখনকার সভ্য জাতিরা তাহাকে "মুদ্রা" বলিয়াই গণ্য করেন না। রামায়ণে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং প্রস্তর মুদ্রার বহুল উল্লেখ আছে এবং বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেণ্টে "সেকেল" নামক এক প্রকার মুদ্রার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিসর, গ্রীশ ও রোমে বহুকাল পূর্ব্বে নানা প্রকার মুদ্রা প্রচ-

লিত ছিল, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, আমি যে সকল তাম্রফলক ও মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদিগের বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদত্ত হইতেছে বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহা হইতে অনেক কথা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন। সর্ব্ব প্রথমে আরও কতকগুলি কথা বলিয়া রাখা উচিত। বৃটীশ ভারতের কোনও কোনও দেশীয় রাজারা রৌপ্য এবং তাম্র, এতদুভয় প্রকারেরই মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার পাইয়াছেন, যথা জয়পুর, গোয়ালিয়র, ইত্যাদি। কেহ কেহ কেবল তাম্রের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারেন, যেমন মধ্যভারতের রট্‌লাম, প্রতাপগড় ইত্যাদি। কোনও কোনও রাজা বা নবাব কেবল রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকারী, যথা মালোয়ার অন্তর্গত জাওরা। ইংরাজাধিকৃত ভারতের কোনও কোনও স্থানে এমন নিয়ম আছে যে, তদ্দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা এখন চালাইবার কেহ চেষ্টা করিলে গুরুতর রূপে অর্থদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ শাসনে ভারতের কোনও রাজাই স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করণের অধিকার পান নাই। ইরেজের নিজের মুদ্রা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, কোনও প্রজা কোনও ধাতুর সহযোগে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ব্রিটীশ মুদ্রা প্রস্তুতের চেষ্টা করিলে যাবজ্জীবন কালের জন্য দ্বীপান্তরে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারিবে, অথবা অন্য কোনও বস্তুকে ব্রিটীশ মুদ্রার ন্যায় প্রতিপন্ন করাইয়া বিনিময় বা বিক্রয় করিলে ঐ দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ভারতের মুদ্রা সমূহ দেখিতেও অতীব কৌতুককর; কোনও মুদ্রায় হনুমানের চিত্র, কোনও মুদ্রায় গাভী, কোনও মুদ্রায় হস্তী, কোনটাতে শিবের ত্রিশূল, কোনটাতে চন্দ্র সূর্য্য, কোনও মুদ্রায় মন্দির ও মস্‌জিদ, কোনটাতে তরবারী, কোনও মুদ্রায় বা ভগবতীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রা সকলের আকারও নানা প্রকার, যথা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার, ইত্যাদি। রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক স্বর্ণ মুদ্রা বা "রামচন্দ্রী মোহর" খুব কম মিলে, ইহাদের এক একটা কখন কখনও দশ সহস্র টাকায় বিক্রীত হয়, রামচন্দ্রী মোহর ওজনে প্রায় দেড় তোলা হইতে অধিক নহে, কিন্তু হিন্দুর নিকটে ইহা পবিত্রতম এবং মহাপূজ্য। একমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্তী শঙ্খ, চিত্রকূটের দশ সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম, কিম্বা লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি হইতেও ইহা অধিকতর রূপে শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এই যে, যাহার গৃহে রামচন্দ্রী মোহর থাকে, তাহার গৃহে ধনদেবী লক্ষ্মী কখনও চঞ্চলা হয়েন না। হিন্দু গৃহস্থ রামচন্দ্রী মোহর পাইলে তাহার দুই পৃষ্ঠায় সিন্দূর মাখাইয়া রাখে এবং প্রতিদিন স্নানান্তে তাহার পূজা করে। আমি রামচন্দ্রী মোহর চক্ষে কখনও দেখি নাই, কিন্তু জৌনপুরে এক জাঠের নিকট "রামচন্দ্রী রৌপ্যমুদ্রা" দেখিয়াছি, ইহার এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার মূর্ত্তি; রামের পদতলে হনুমান উপবিষ্ট এবং সীতার পদতলে ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণ বক্রভাবে শায়িত। অপর পৃষ্ঠে দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায়

* মৎ প্রণীত "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" নামক পুস্তক দেখুন।

গোলাকারে কতকগুলি শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক পড়া যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে সাহ আলম ও আকবর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মোহর বা স্থবর্ণ মুদ্রা এখনও অনেক পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাচীন কালে অথবা ভারতের বর্ত্তমান "দেশীয় রাজ্য" সমূহে বর্ত্তমান কালে যে প্রকারের বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রায় সেরূপ পাওয়া যায় না। ইংরাজের স্বর্ণ ও রৌপ্যে অনেকটা খাদ মিশান থাকে, এইজন্য কোনও কোনও দেশীয় রাজার টাকশালাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন "ইংরাজের যাহা কিছু দেখ, তাহাতেই 'খোটা' ও 'খাদ' মিশান থাকে।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(৩)

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিজ্ঞ প্রিন্সেপ সাহেব মহীপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহার বহুকাল পরে জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক বিগ্রহ পালের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ কর্ণেল কিটো সাহেব বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পেসিরোযা নামক স্থানে যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা দেব পালের নাম উল্লিখিত হয়। গযাতে নারায়ণ ও নবপালের নামাঙ্কিত দুই খানি ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া গিযাছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত ব্রাড্‌লি সাহেবের প্রযত্নে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি পাল রাজগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় তাম্রশাসনাদি বিহারে আবিষ্কৃত হয়। নালন্দায় যে এক খানি প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব বল্লভী দেশীয় রাজতনয়া বাগীশ্বরী দেবীর পানিগ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বর্ষে ৮ই আশ্বিন তারিখে লিখিত হয়। তথায় এক বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে তৈলিক জাতীয় হরদত্তের পৌত্র ও গুরু দত্তের পুত্র কৌশাম্বীবাসী বৌদ্ধ বালাদিত্যের নামাঙ্কিত যে লিপি পাওয়া যায়, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপালভণ্ডার করের মতে তাহা রাজা মহীপাল দেবের রাজত্বের একাদশতম বর্ষের ৩রা বৈশাখ লিখিত হয়। বিহারে বৌদ্ধদেবের অঙ্কিত প্রতিকৃতির নিম্নভাগে যে লিপি পাওয়া যায়, তাহা রাজা মদনপাল দেবের সময়ে ২৪শে বৈশাখ তারিখে সাময়িক নামে বৌদ্ধ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। তথায় অপর এক লিপি বিগ্রহ পাল দেবের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ১৯শে বৈশাখ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেবাহ্নু স্বর্ণকারের পুত্র কর্ত্তৃক লিখিত হয়। তিত্রাবন নামক স্থানে পুণ্ড্রেশ্বর সৈমহানিকের (মহীপাল ?) সময়ে বিষ্ণুর পুত্র গোপতিচন্দ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র এক খণ্ড লিপি পাওয়া গিয়াছে। তথায় বৌদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর প্রতি-

মূর্ত্তির নিম্নভাগে অপব যে এক লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা বামপতি (বামপাল ?) দেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ২৮শে বৈশাখ ভট্ট নহোব পুত্র ভট্টইচ্ছ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই বাজা সম্ভবতঃ ১০৫০ খ্রীষ্টীয়াব্দে বিহাবে রাজত্ব কবিতেছিলেন। ঘোশ্রাবণ নামক স্থানে যে এক প্রস্তবলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে বাজা দেবপালেব নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্জাবেব অন্তর্গত নাগবহাবনিবাসী ইন্দ্রগুপ্তেব পুত্র বৌদ্ধভিক্ষু বীবদেব কনিষ্কেব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহাবে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ কবিযা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কবেন। তিনি পর্য্যটন কবিতে কবিতে নালান্দায় উপনীত হইযা, বহুকাল তথায অবস্থিতি কবেন। নালন্দায আগমনেব পূর্ব্বে যশোবর্ম্মপুবেব বিহারে অবস্থান কালে তিনি বাজা দেবপাল হইতে বিশেষ সমাদব প্রাপ্ত হন।† গযাতে গোবিন্দপালেব যে দুই খানি শাসনলিপি ব্রাড্‌লি সাহেব প্রাপ্ত হন, তাহাব একখানি ১২৩৩ সংবতাব্দে (১১৭৬ খ্রীঃ) এবং অপব খানি ১২৩৫ সংবতাব্দে (১১৭৮ খ্রীঃ) লিখিত হয। বিহাবে বাজা মদনপালেব বাজত্বেব তৃতীয বর্ষে লিখিত এবং লক্ষীসবাই ষ্টেসনেব নিকটবর্ত্তী জযনগবে তাঁহাব শাসনকালেব ঊনবিংশতম বর্ষে লিখিত দুই খানি লিপি পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের গবেষণা ও অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়। মজফবপুব জিলাব অন্তর্গত ইমাদপুবে লিঙ্ক নামে জনৈক সাহেব যে দুই খানি ক্ষুদ্রলিপি প্রাপ্ত হন, তাহা বাজা মহীপালেব বাজত্বেব অষ্টচত্বাবিংশতৎতম বর্ষে ২বা বৈশাখ তাবিখে লিখিত হয।

পুবাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণেব গবেষণায গৌডেশ্বব পালবাজগণেব যে সকল শাসনপত্র ও প্রস্তবলিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল শাসনলিপি হইতে স্পষ্টই বোধ হয যে, বাবাণসী, মগধ, ত্রিহুত, গৌড (পশ্চিমবঙ্গ) পৌণ্ড্র বর্দ্ধন (উত্তববঙ্গ) এবং সম্ভবতঃ বুডীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীব উত্তব তীববর্ত্তী পূর্ব্ব বঙ্গেব অংশ পর্য্যন্ত পবাক্রান্ত পালবাজগণেব শাসন প্রভাব বিস্তৃত হইযাছিল। ডাক্তাব হাবনলি সাহেব অনুমান কবেন যে, অযোধ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদেব আধিপত্য বদ্ধমূল হইযাছিল। তাঁহাদেব বাজত্বকাল সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচাবিত হইযাছে, এক্ষণে তাহাব উল্লেখ কবা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাবনাথেব প্রস্তবলিপি ১০৮৩ সংবতাব্দে (১০২৬ খ্রীঃ) স্থিবপাল ও বসন্তপালেব আদেশে লিখিত হয। তাঁহাবা সম্ভবতঃ বিহাব প্রদেশে স্বাধীনভাবে বা গৌড়েশ্বব পালবাজন্যবর্গেব অধীনে বাজত্ব কবিতেন। এই প্রস্তব লিপিতে গৌডেশ্বব মহীপালেব উল্লেখ দৃষ্টে, পুবাতত্ত্ববিৎগণ পালবংশীয় নৃপতিদিগের বাজত্বকাল নির্দ্ধাবণ কবিতে প্রযাস পাইয়াছেন। ইহা হইতে সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দী

† সংস্কৃতজ্ঞ পাঠাকগণেব অবগতির জন্য ঘোশ্রাবণের প্রস্তরলিপি হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

বজ্রাসনং বন্দিতুমেকদাথ
শ্রীমন্মহাবোধিমুপাগতোহসৌ (বীরদেবঃ)।
দ্রষ্টুং তথাগাৎ সহদেশিভিক্ষূন্
শ্রীমদ্‌যশোবর্ম্মপুরং বিহারং ॥৮
তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবপাল ভুবনাধিপ লব্ধপূজঃ।
প্রাপ্তপ্রভঃ প্রতিদিশোদয়পূরিতাঙ্গঃ
পূষেব দারিততমঃ প্রমাদো ববাক্ত ॥৯

হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজগণের রাজত্বকাল বলিয়া অনুমান করেন, সুবিজ্ঞ উইলসন সাহেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ জন পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিহার ও বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করেন। তিনি গড়ে প্রত্যেক রাজার রাজত্ব সময় ২৫ বৎসর ধরিয়া, রাজা মহীপালের সময় ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধারণ পূর্ব্বক তাঁহার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের কাল নির্ণয় করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকাল গণনা করিয়া ভারতীয় প্রত্যেক নরপতি গড়ে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন বলিয়া অবধারণ করেন। এই অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র পালরাজগণের রাজত্বের আরম্ভ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে পালবংশীয় একাদশ জন রাজা পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। আমগাছির শাসনপত্রে এই একাদশ জন নরপতির মধ্যে দশ জনের নামই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সারনাথের প্রস্তরলিপি গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে লিখিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত একাদশ জন রাজার প্রত্যেকে গড়ে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন, এই অনুমানের বলে বহুমানাস্পদ ডাক্তার মিত্র মহোদয় খ্রীষ্টীয় ৮৫৫ হইতে ১০৮০ অব্দ পর্য্যন্ত পালরাজগণের পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে রাজত্বের আনুমানিক সময় নিরূপণ করিয়াছেন।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার হারন্লি সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত (৯০৬-১০২৬ খ্রীঃ) ১২০ বৎসর কাল মাত্র ছয় জন পালবংশীয় রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। গড়ে এক এক পুরুষে ২৪ বৎসর ধরিয়া, তিনি পাঁচ পুরুষে ১২০ বৎসরকাল গোপাল হইতে নারায়ণ পালের রাজত্ব সময় অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গোপালদেব (৯০৬-৯২৬ খ্রীঃ), ধর্ম্মপাল (৯২৬—৯৫৬ খ্রীঃ), দেবপাল বা নয়পাল (৯৫৬—৯৯১ খ্রীঃ), বিগ্রহপাল বা শূরপাল (৯৯১--১০০৬ খ্রীঃ), এবং নারায়ণ পাল (১০০৬—১০২৬ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যপালকে দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহীপালের পিতা বলিয়া অনুমান করেন। যে সময়ে নারায়ণপাল বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মহীপাল বা ভূপাল বারাণসী ও অযোধ্যাতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মহীপাল ১০০৬—১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎবর্ষকাল বিহার ও বারাণসীতে রাজত্ব করেন। নারায়ণপালের মৃত্যুর পর কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশে মহীপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা নারায়ণপাল পৈতৃক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা মহীপালের শাসনাধীন বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকে। সম্ভবতঃ তাঁহার অধীনস্থ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত সামন্ত ও হেমন্ত সেনের সাহায্য ও প্ররোচনায় রাজা নারায়ণপাল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ

করেন। তাঁহার নাম এবং বুদ্দল ও ভাগলপুরের শাসনলিপি হইতে ডাক্তার হারনলি কি রূপে নারায়ণ পালের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পরিচয় পাইলেন, স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাহা কোনও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি না। এই নারায়ণ পালের বংশধরই ১০৩০ খ্রীষ্টীয়াব্দে বিজয়সেন বা সুখসেন কর্তৃক বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হয়। বীরসেন বা আদিশূর এই বিজয় সেনেরই নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধ মহীপালের বংশধরগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিহার ও বারাণসী শাসন করিতে থাকেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের অন্যতম চন্দ্রদেব হৈহয় বংশীয় চেদিরাজ কর্ণদেবকে (১০২৫ ৫০ খ্রীঃ) দূরীভূত করিয়া কান্যকুব্জে গাহড়বাড়বংশীয় পালরাজন্যবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কনোজরাজ চন্দ্রদেবের পিতা মহীচন্দ্র ও পিতামহ যশোবিগ্রহকে তিনি যথাক্রমে মহীপাল ও বিগ্রহপাল বলিয়া কল্পনা করেন। আমরা ডাক্তর হারনলির অনুমিত কোন মতেরই পক্ষপাতী নহি।

চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ ১০৯৩ খ্রীষ্টীয়াব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বর মহীপালকে পরাজিত করেন,—এই মর্ম্মের এক খানি শাসনলিপির বিবরণ ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার বার্ণেল সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বারা কানিংহাম, ডাক্তার মিত্র ও হারনলি প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎগণের সকলের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ ইহারা সকলেই সারনাথের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত ১০৮৩ সংবতাব্দ (১০২৬ খ্রীঃ) মহীপালের রাজত্বকালের মধ্যভাগ অনুমান করিয়া পালরাজগণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এই ঘটনা ১০৯৩ সংবতাব্দে ঘটিয়া থাকিলে, সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। কারণ ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় সেন বংশের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় এবং পাল রাজগণ সেনবংশীয়দিগের পরাক্রমে বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়া বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন রামপালে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন।

আমগাছির শাসনপত্র হইতে গৌড়েশ্বর পালরাজগণের নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যাইতেছে। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে যে সুরপালের উল্লেখ আছে, পালবংশের অপর কোনও শাসনলিপিতে তাঁহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে, মুঙ্গেরের শাসনপত্রে যে যুবরাজ রাজ্যপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি দেবপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সুরপালের জ্যৈষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। রাজা দেবপালের মৃত্যুর পর পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সুরপাল ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। এই উক্তি কি কি যুক্তি ও প্রমাণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত, কানিংহাম সাহেব তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। ডাক্তার হারনলি সাহেব সুরপালকে বিগ্রহপাল (প্রথম) হইতে অভিন্ন ব্যক্তি ও রাজ্যপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া বিবেচনা করেন। যদি মিশ্রবংশ পুরুষানুক্রমে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব পদে বৃত হইয়া থাকে, যদি রাজা দেবপালের অতিদীর্ঘ রাজত্বকালে দর্ভপানি ও তাঁহার পৌত্র কেদারনাথ মিশ্রের দেবপালের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা কোনও ক্রমে সম্ভবপর না হয়, যদি সুরপাল

দেবপালের নামান্তর না হয়, তাহা হইলে ডাক্তার হারনলির মতে সুরপালকে বিগ্রহ পালের নামান্তর বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(১) গোপাল দেব, পত্নী বল্লভীদেশীয়া রাজতনয়া বাগীশ্বরী দেবী

(২) ধর্ম্মপাল — বাক্‌পাল পত্নী রন্না দেবী

(৩) দেবপাল — জয়পাল

(৪) বিগ্রহপাল (সুরপাল) (প্রথম) পত্নী হৈহয়দেশীয়া রাজপুত্রী লজ্জাদেবী

(৫) নারায়ণ পাল — (৬) রাজ্যপাল পত্নী রাষ্ট্রকোটার ভাগ্যদেবী

(৭) শ্রী (——) পাল

(৮) বিগ্রহ পাল (দ্বিতীয়)

(৯) মহীপাল

(১০) নয়পাল

(১১) বিগ্রহপাল (তৃতীয়)
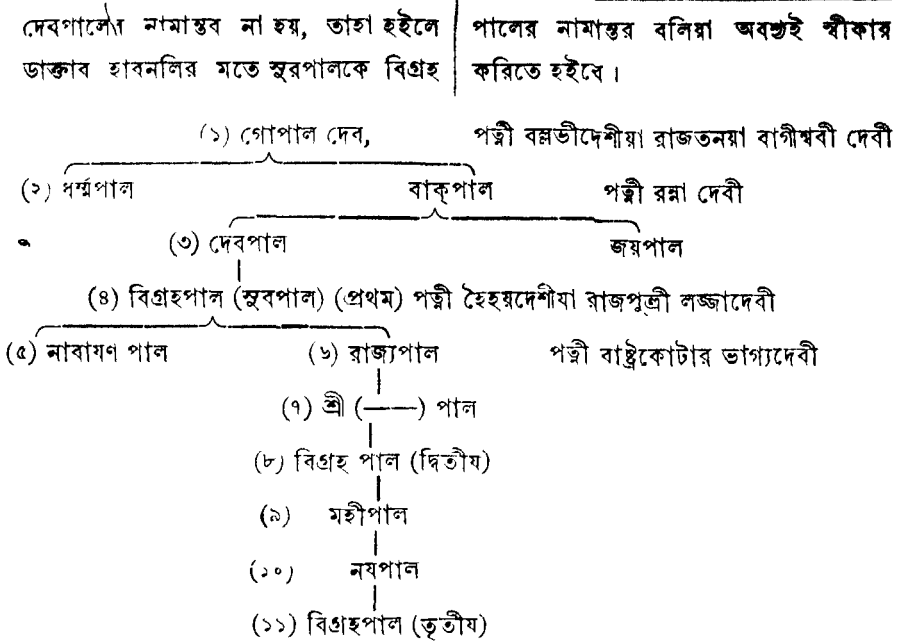
এই সকল রাজার রাজত্বকাল নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামাঙ্কিত যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা হইতে তাঁহাদের রাজ্যকালের নিম্নতম সীমা অনায়াসেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনুমানের সাহায্য ভিন্ন তাহার ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

নালন্দায় গোপাল দেবের রাজত্বের সপ্তম বর্ষের একখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, প্রবাদ আছে, পালবংশের আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা অতি দীর্ঘকাল (৪৫ কি ৫৫ বৎসর) রাজত্ব করেন। ডাক্তার মিত্রের মত অনুসারে তিনি সম্ভবতঃ (৮৫৫–৮৭৫ খ্রীঃ) এবং ডাক্তার হারনলির মতে (৯০৬–৯২৬ খ্রীঃ) ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ডাক্তার হারন্‌লি বলেন যে, ধর্ম্মপালের রাজত্বের ষড়বিংশতম বর্ষে লিখিত একখানি লিপি ১৮৮০ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। মুঙ্গেরের শাসনপত্র দেবপালের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার হারনলির মতে তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ডাক্তার হল সাহেব গোয়ালিয়র হইতে যে এক খণ্ড প্রস্তরলিপির বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে দেবপালের নামে এক জন রাজার উল্লেখ আছে। ইহা ১০২৫ সংবতাব্দে (৯৬৮ খ্রীঃ) লিখিত হয়। ডাক্তার হারনলি অনুমান করেন যে, এই দেবপাল গৌড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। বুদ্দলের শাসনলিপির উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া পরিগণিত না হইলে, দেবপাল পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালদেব গুজ-

রাটের বল্লভীবংশীয় রাজতনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। গুজরাট পর্য্যন্ত যে পালবংশ কুলমান ও ক্ষমতায় সুপরিচিত ছিলেন, সেই বংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতির নাম গোয়ালিয়রের প্রস্তরস্তম্ভে অঙ্কিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দিগ্বিজয় উপলক্ষে মধ্যভারতের অন্তর্গত চেদিরাজ্যের হৈহয়বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া, রাজতনয়া লজ্জা দেবীকে যুবরাজ বিগ্রহপালের সহিত পরিণীত করা দেবপালের পক্ষে অসম্ভব নহে। বিহারে বিগ্রহপালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে লিখিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইনি তিন বিগ্রহপালের মধ্যে কোন্ বিগ্রহপাল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ডাক্তার হারনলির মতে বিগ্রহপাল বা সুরপাল ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইমাদপুরে মহীপালের রাজত্বের অষ্টচত্বারিংশৎতম বর্ষে লিখিত দুই খানি ক্ষুদ্র লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ ও কানিংহাম সাহেবের মতে তিনি ৫২ এবং ডাক্তর হারনলির মতে ৫০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসন রাজা নারায়ণ পালের রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার মিত্র ও হারনলি সাহেবের মতে তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। আমগাছির শাসনপত্র নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার মিত্রের অনুমান মতে তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

কালক্রমে বৌদ্ধ পালরাজগণের অধঃপতন সংঘটিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে এক অভিনব রাজবংশ দক্ষিণাপথবাসী কর্ণাট রাজবংশীয় বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপালে সেনবংশের রাজধানী সংস্থাপিত হইল। বিজয় সেনকে হিন্দুধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রজাবর্গের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিজয়সেন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রজাপুঞ্জের হৃদয় সবিশেষ আকৃষ্ট করিলেন। পালরাজগণের শাসিত প্রদেশের হিন্দু প্রজাগণও সর্ব্বান্তঃকরণে বিজয়সেনের বিজয় কামনা করিতে লাগিল, এবং দলে দলে তাহারা বিজয়সেনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতে লাগিল, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রবল সংঘর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় সাধিত হইল। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পালরাজগণ নব প্রতিষ্ঠিত সেনরাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় অঞ্চল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। প্রাচীন রাজধানী মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের একমাত্র আবাসস্থল উঠিল।

পালরাজবংশের এক শাখা করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া, কামরূপের দক্ষিণ ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী বর্দ্ধনকুঠীর সপ্ততি মাইল উত্তরে পালবংশীয় যে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ডাক্তার বুকানন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, প্রবাদ আছে যে, তাঁহার রাজ্য তেজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল *। এই পালবংশীয় শেষ রাজাকে নিহত করিয়া থায়েন

* সুপণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব বলেন যে, এই ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে করতোয়ার পূর্ব্বতটে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জিলায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ধর্ম্মপুরে

বংশীয় নীলধ্বজ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক কোমতাপুরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তথায় প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব আলাউদ্দিন হুসেন সা কোমতাপুর বিধ্বস্ত করিয়া, কামরূপ ও আসাম কিছু কালের নিমিত্ত বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন।

যে সময়ে পালবংশের এক শাখা সেনরাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ ও নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে তাহার প্রধান মূল শাখা বিহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। বাণপাল, উষাপাল, চন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জিলায় যেমন বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ বিহারের দক্ষিণাংশে স্থিরপাল, বসন্তপাল, ভূমিপাল, কুমারপাল, মদনপাল ও মহেন্দ্রপালের শাসন কালের পরিচায়ক কতিপয় শাসনলিপি বিহার, নালন্দা, গয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঙ্গালা ও ত্রিহুত (উত্তরবিহার) তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে পর তাঁহারা বারাণসী ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া থাকিবেন। সারনাথের শাসনলিপি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তারের পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই সেনরাজগণের শাসন প্রভাব প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। রামপাল নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী সংস্থাপিত হয়। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ)। গৌড় (পশ্চিম বঙ্গ) ও ত্রিহুত (উত্তরবিহার) সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার ভুক্ত হয়। পালবংশীয়দিগের আধিপত্য দক্ষিণবিহারে নিবদ্ধ হয়। সুবিজ্ঞ ব্রড্‌লি সাহেব অনুমান করেন যে, রামপতিপাল সম্ভবতঃ ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ কালক্রমে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, তাঁহারা বিহার নগরীতে আপনাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৭৬ এবং ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত গোবিন্দপালের নামাঙ্কিত লিপি ব্রড্‌লি সাহেবের যত্নে গয়াতে আবিষ্কৃত হয়। এতদ্দ্বারা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী বিহার নগরীর সহিত দক্ষিণবিহার অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজগণই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী সসৈন্যে বিহার আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, কাপুরুষ পালরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মুসলমান সেনাপতি দুই শত সেনা

তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মপাল বঙ্গের পালবংশীয় রাজগণেরই বংশধর হইবেন। তাহার রাজধানীর অনতিদূরে মাণিক চন্দ্র নামে বণিক এক সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিত। ধর্ম্মপালকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মাণিক চন্দ্র ধর্ম্মপুর অধিকার করে। ইহার দুই মাইল পশ্চিমে মাণিকচন্দ্রের আবাসবাটী তাহার সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীর নাম অনুসারে ময়নামতীর কোট নামে এক্ষণে পরিচিত। গ্রিয়ারসন সাহেব এই মাণিকচন্দ্রের (রঙ্গপুর জিলার প্রচলিত) গান প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপালের সময় নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত রাজনামাবলী রঙ্গপুর হইতে সংগ্রহ করেন।

(১) ধর্ম্মপাল, (২) মাণিক চন্দ্র, (৩) গোপী চন্দ্র, (৪) ভব চন্দ্র, (৫) এক জন অজ্ঞাত নামা পালবংশীয় রাজা, (৬) অরাজকতার সময়, (৭) নীলধ্বজ, (৮) চক্রধ্বজ, (৯) নীলাম্বর (কোমতাপুরের শেষ রাজা)।

জন প্রবাদ অনুসারে রঙ্গপুরের রাজা ভবচন্দ্র ও তাহার মন্ত্রী গবচন্দ্র অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছিলেন।

সঙ্গে লইয়া অনায়াসে বিহার নগরী অধিকার করে। ভয়ত্রস্ত নগরবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, এবং নিষ্ঠুর মুসলমান সেনার হস্তে তাহাদের অধিকাংশ নিরপরাধে নিহত হয়, এই ঘটনার দুই বৎসর পরে বিজয়ী বক্তিয়ার লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের কিয়দংশ উপহার রূপে লইয়া দিল্লীশ্বর কুতুব উদ্দিনের সমীপে উপস্থিত হন এবং বহু সমাদরে গৃহীত হইয়া বিহারের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হন।

পালরাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের শাসনলিপি স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ব্ববিধ প্রজাবর্গকে সমান ভাবে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশাসন্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজার সমদর্শিতা ও অপক্ষপাতিতা ও ন্যায়বিচারে বৌদ্ধ হিন্দুকে ভ্রাতৃভাবে দর্শন করিত। এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুর আচার ব্যবহারাদি বিষয়ের বিরোধ এবং পার্থক্যও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বাঙ্গলায় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনও যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, পালরাজগণের শাসনপত্রেই তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে। এই সময়ে সমস্ত রাজকার্য্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত. রাজকর্ম্মচারীদিগকে রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইত ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কবিতা রচনা অভ্যাস করিতে হইত। সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিতেন। ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, রাজা নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র স্বয়ং বুদ্দল ও ভাগলপুরের শাসনলিপির শ্লোক রচনা করেন। তিনি বেদবেদান্ত ও কাব্যজ্যোতিষ প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি গৌড়েশ্বর মহারাজ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি দত্ত এক জন অতি প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার। তিনি তত্ত্বচন্দ্রিকা, চিকিৎসাসংগ্রহ (গূঢ়বাক্যবোধক), চরক-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও শব্দচন্দ্রিকা নামে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি বৈদ্য ও নারায়ণের পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দেবং প্রণম্য হেরম্বং, বৈদ্যশ্রীচক্রপাণিনা।
ভৈষজ্যশব্দবোধায় ক্রিয়তে শব্দচন্দ্রিকা॥
(শব্দচন্দ্রিকা)

গৌড়াধিনাথরসবত্যাধিকারি-পাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়ো দন্তরঙ্গাৎ (?)।
ভানোরনুপ্রথিত-লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপানিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥

চক্রপাণির তত্ত্বচন্দ্রিকা গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন যে, এই 'গৌড়াধিনাথ' শব্দের লক্ষ্য গৌড়েশ্বর নয়পাল দেব। এই কথা কত দূর প্রামাণিক, তাহা বলিতে পারি না।

পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার স্বপ্রকাশিত চণ্ডকৌশিক নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ক্ষেমীশ্বর নামে জনৈক সুকবি ও সুপণ্ডিত গৌড়েশ্বর মহীপালের সভাসদ ছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের প্রসিদ্ধ করুণরস পূর্ণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে চণ্ডকৌশিক নাটক রচনা করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কোন্ স্থান

হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, জানিনা।

পালরাজগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতীয় ইতিহাসবিৎদিগের মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও, তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। আবুল ফাজলের মতে তাঁহারা কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের লেখকগণ বিগ্রহপালের পত্নী লজ্জা দেবী যে হৈহয বংশীয় রাজতনয়া ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া পালরাজগণকে হৈহয়জাতীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী অস্পষ্ট জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া কানিংহাম ও ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব তাঁহাদিগকে ভুঁইহার বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। ডাক্তর হারনলি তাঁহাদিগকে গহড়বাড় বংশীয় ক্ষত্রিয় কল্পনা করিয়া রাঠোরবংশীয় কনোজরাজ চন্দ্রদেবকে পালবংশীয় বৌদ্ধ মহীপালের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তার হারনলির এই স্বকপোল-কল্পিত অনুমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় পুচ্ছগ্রাহিতা ও অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। পালরাজগণের শাসনপত্রে যদিও তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি বল্লভী ও হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের এবং রাজ্যকূটাপতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বন্ধন দৃষ্টে, পালবংশের ক্ষত্রিয়ত্বে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

পালবংশীয় নৃপতিবর্গের সহিত ঢাকার ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। জনপ্রবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা শিশুপাল, যশপাল ও হরিশ্চন্দ্র পালকে বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উর্দ্ধর তীরস্থিত ভূভাগের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের 'পাল' উপাধি ভিন্ন তাঁহাদিগকে জনশ্রুতি অনুসারে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করার অন্য কোনও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আমরা এখানেই পালরাজগণের অসম্পূর্ণ বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। ভবিষ্যতে আদিশূর ও সেনরাজগণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

কৌলিন্য ও কুসংস্কার।

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া অতীত সাক্ষী ইতিহাসের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। সময়ের যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া বাঙ্গালীর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনের ক্রমোন্নতি প্রদর্শনও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সমাজরূপ বিশালক্ষেত্রে কত কণ্টক বৃক্ষ জন্মিয়া কাল সহকারে আপনি লয় পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কিন্তু ভগ্নমূলাবশেষ বৃক্ষের ন্যায় যে গুলি অদ্যাপি সমাজক্ষেত্রে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল অথবা উন্নতিশীল কোন্ মতের অধিক পক্ষপাতী, স্থির করা আবশ্যক।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অধিকাংশই যে রক্ষণশীলতা মতের অনুমোদন করেন, বোধ হয় ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যে নিয়ত অন্ধকারে বাস করে, সে যেমন অন্ধকার প্রিয় হয়, আলোক সহ্য করিতে পারে না, আমরাও যে তথাবিধ কারণে কুসংস্কার-প্রিয় হইব, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা প্রাচীন তাহাই যে মৌলিক ও সর্ব্বথা দোষস্পর্শ-শূন্য, ইহার তুল্য অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। প্রাচীনতার প্রতি এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বস্তুতঃ শিক্ষা ও সভ্যতালোক বিস্তার ভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজের গতি দেশ কালের আবরণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের সংকীর্ণ সীমায় নিবদ্ধ। সুতরাং কোন দেশে কোন কালে কুসংস্কারের আধিপত্য সহসা এক দিনে বিলুপ্ত হয় না। অপিচ, প্রাচীন আচার ব্যবহার ও নিয়মাবলীর প্রতিও লোকের অন্ধ বিশ্বাস সহসা তিরোহিত হয় না। ইংরেজী শিক্ষার আলোকে এ দেশ আলোকিত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি যে সুদূর-পরাহত হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী কুসংস্কারগুলি অদ্যাপি সমাজে বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধেই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কৌলিন্য প্রথার মূল সূত্রটী এই ছিল :—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং,
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং।"

এই সমস্ত লক্ষণ অনুসারেই কুলীন ও অকুলীনের প্রভেদ স্থাপিত হইত। (১) সদাচার সম্পন্ন, (২) বিনয়ী, (৩) বিদ্বান, (৪) গৌরবান্বিত ও (৫) তীর্থ দর্শন-পরায়ণ এবং (৬) ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, (৭) সৎপথে অর্জ্জনশীল ও সৎপাত্রে দানশীল এবং (৮) তপোনিষ্ঠ ও (৯) দাতা, এই নব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন পদবাচ্য ছিলেন। পাঠক এখন বলুন দেখি, ইহা কি ব্যক্তিগত, অথবা গুণগত, না বংশগত উপাধি? সামান্য পাঠশালার ছাত্রও বোধ হয় এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, ইহা যদি বংশগত উপাধি হয়, তবে বি এ, এম, এ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধিগুলি বংশগত হইলে হানি কি? কেহ কেহ এই কুসংস্কার প্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নানাবিধ অপসিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া থাকেন, সে গুলিও প্রস্তাবিত প্রবন্ধে অবশ্য বিচার্য্য।

"কৌলিন্য মর্য্যাদা বংশ পরম্পরাগামী করাতে আমাদিগের ইংরেজি শিক্ষাভিমানী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ বল্লাল সেনের প্রতি অপরিমিত গালিবর্ষণ ও কুলীনের প্রতি অযথা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারা কি চাহেন যে, পরীক্ষা করিয়া পারদর্শিতানুসারে উচ্চ ও নিম্ন কুলীন স্থির করিতে হইবে? * * * যে বিলাতকে আমরা সকল বিষয়ে অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা কুসংস্কার শূন্য মনে করি; আমরা সেখানে কি দেখিতে পাই। "লর্ডের" পুত্র "লর্ড" (কুলীন) হন, না তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে লর্ড দল হইতে খারিজ হন, না যে অন্য কেহ ভাল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি "লর্ড" (কুলীন) হইয়া গেলেন? যদি ইংলণ্ডীয় কৌলিন্য আভিজাত্যগত না হইয়া যোগ্যতা বা পাণ্ডিত্য সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে নিউটন বা

ডারউইন, জনষ্টুয়ার্ট মিল বা হার্বার্ট স্পেনসার, ফসেট্ বা ব্রাইট্ এত কাল সদা "মিষ্টর" নামে অভিহিত হইতেন না।" *

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভারতের ও বিলাতের সামাজিক অবস্থা তুলনা করা আবশ্যক। ভারতে জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অনুসারে, নিরূপিত হইয়াছে। যথা, "সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া, এই সকল লক্ষণ যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে। যে সকল মনুষ্য রজোগুণ প্রভাবে কাম ভোগাসক্ত, তীক্ষ্ণ, ক্রোধশীল ও সাহসী হইয়া ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। যাহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে ব্রহ্মভাব হইতে স্খলিত হইয়া বণিক্-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য। যাহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র, লুব্ধ-স্বভাব, সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচ-পরিভ্রষ্ট, তাহারাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত †।" কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশে আমরা কি দেখিতে পাই? তথায় ধনী ও ক্ষমতাবান একজাতি, দরিদ্র ও অক্ষম অন্য জাতি। তাহাদের মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান নিষিদ্ধ। এমন কি, কোন সিবিলিয়ান মহাত্মা বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পণ্যজীবী ভ্রাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া এক টেবিলে আহার করেন না। ধন ও পদগৌরবান্ধতা-জনিত বৈষম্য, সাম্যবাদী দেশে, ইতোধিক আর কি সম্ভবপর হইতে পারে? বস্তুতঃ সেখানে জাতিভেদ ও যত প্রকার সামাজিক ভেদ পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই ধন-বৈষম্য হইতে উৎপন্ন। মুদ্রাহীনতা যে সকল দোষের মূল ও সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান অন্তরায়, ইউরোপ প্রভৃতি দেশ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। "ডিউক" "নাইট" ও "আরল" প্রভৃতি উপাধিগুলি তথায় সুবর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে; এবং তাহা বংশানুক্রমিকও দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ গুণানুসারে নির্ব্বাচন ভিন্ন ধন বৈভব যে উপাধির একমাত্র নিয়ামক, তাহা বংশগত না হইবে কেন? সেই জন্যই "লর্ডের" পুত্র "লর্ড" ও "ডিউকের" পুত্র "ডিউক" উপাধিতে বিভূষিত হন। অস্মদ্দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, নবাব ও বাদসাহ প্রভৃতির বংশধরেরা যে পৈত্রিক উপাধিতে অধিকারী হন, ইহা কে না জানে? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উল্লিখিত উপাধিগুলি ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য উপাধি সমস্তই কি এক শ্রেণীর? যে নিতান্ত অন্ধ, সেও বোধ হয় এতদুভয়ের প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিলাতী কৌলিন্যকে এ দেশীয় কৌলিন্যের আদর্শ কল্পনা করিয়া কৌলিন্য প্রথা বংশগত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর যদি ইউরোপীয় সমাজে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের আধিপত্যই থাকে, আমরাও কি অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিব? আদর্শ ব্যক্তির বা সমাজের গুণের অনুকরণ করাই মহত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়; কিন্তু দোষের অনুবর্ত্তী হওয়া অধঃপতনের ক্রমনিম্ন সোপানে অবতরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* "কৌলিন্য প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধ—মালঞ্চ।

† মহাভারত—বনপর্ব্ব,—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আর এক শ্রেণীর আপত্তিকারী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মত এই যে, যে সত্য-পরায়ণতা, বিশুদ্ধাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শুধু জন্মগুণে যাহা লাভ করা যায় না, সেই সদাচার-ভ্রষ্ট, অনৃতবাদী, পরহিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন, তবে কুলীনের বংশ পরম্পরাক্রমে কুলীন না হইবে কেন? এ যুক্তিটীও আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা স্বীকার করি যে, জন্মগুণে বংশপরিচয়ার্থ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া ভিন্ন কেহ কখনও ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সদাচার, তপশ্চর্য্যা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। কিন্তু এই সমস্ত বিশুদ্ধাচার ও নৈতিক উৎকর্ষতা ধারাবাহিকরূপে বংশ পরম্পরা ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ সন্তান যত সহজে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, অন্ত্যজ জাতি মধ্যে কেহ কখন সেরূপ পারে কি না, সন্দেহ। সেই জন্যই হাড়ি, ডোম, চণ্ডালের বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী সদ্‌গুণশালী লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান ও প্রতিভা সম্বন্ধেও শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে অন্ত্যজ জাতির তুলনা অসম্ভব। প্রাচীন কালের কথা গণনার বাহিরে রাখিয়া বর্ত্তমান সময়ের সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা কি দেখিতে পাই; যখন শুভক্ষণে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় তিরোহিত হইয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় অধিকার প্রাপ্ত করিয়াছে, সেই সময় কাল হইতে বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও ভারতে যত কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সুলেখক ও বাগ্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমস্তই উল্লিখিত বর্ণত্রয় হইতে। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোক যে অচিরে এইরূপ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এরূপ আশা করা সুকঠিন। সুতরাং এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীতি হয় যে, ব্রাহ্মণত্ব বংশগত না হইলেও জন্মগুণ যে ব্রাহ্মণত্বের অনেকটা অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব বংশগত হওয়াতে সমাজের যত না অনিষ্ট সম্ভাবনা, কৌলিন্য প্রথায় তাহা অপেক্ষা শতগুণ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। এই মতটী সত্যের অধিক সন্নিহিত কি না, তাহা সুবিবেচক পাঠকগণের বিবেচনা সাপেক্ষ।

প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা অংশতঃ শ্রমবিভাগ নীতির উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ, যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরায়ণ ছিলেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া পর ব্রহ্মের নিষ্কাম উপাসনায় তাঁহারা জীবন অতিবাহন করিতেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন; বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সামরিক ব্যাপার তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের দাস অথবা দাসত্ব ব্যবসায়ী হইয়া সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই শ্রমবিভাগ নীতি যে জাতিভেদ প্রথার মূল ভিত্তি, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ উচ্চ নীচ প্রভেদ সমাজে আবহমান কাল হইতে

চলিয়া আসিতেছে। আর জ্ঞান ও প্রতিভার স্রোত অব্যাহত রাখিবার জন্যও শ্রেষ্ঠ বর্ণের সঙ্গে অন্ত্যজ বর্ণের শোণিত-সংযোগ সর্ব্বথা অবৈধ। সুতরাং পরস্পর ভিন্ন বর্ণে ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদি ক্রিয়া প্রাচীন কাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কৌলিন্য প্রথার মূলে এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত আছে কি? এই প্রথা কি সদগুণের আদর এবং দোষের শাসন জন্য একটী রাজ নিয়ম মাত্র নহে? যেমন দশ দশ বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্ট লোকসংখ্যা গ্রহণ করেন, তেমনই যদি কৌলিন্যের লক্ষণানুসারে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তে বিচার হইয়া কুলীনের তালিকা প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে কি আর বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথা সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ হইত? একথা সাহস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা যায় যে, সর্ব্বথা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া কৌলিন্য যে জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কৌলিন্য-প্রথা-প্রবর্ত্তকের মূল উদ্দেশ্য তাহা ছিলনা। ইয়োরোপে যেমন ধন গৌরবে কৌলিন্য, এদেশে তেমনই গুণ গৌরব অনুসারে কৌলিন্য উপাধি প্রদত্ত হইত। দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ সমাজ-সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল উঠিয়াছে। আজ এমন কেহ নাই যে, এই হলাহল পান করিয়া সমাজের প্রাণ রক্ষা করে। তাই আজ কৌলিন্য বংশগত, কুলীন মেলবদ্ধ, দেশ মন্ত্রমুগ্ধ ও অধঃপতিত।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, কুলীন অর্থাৎ গুণবান এবং অকুলীন বা গুণহীনে পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? যদি তাহা হয়, তবে উভয়ত্র উল্লিখিত বংশ পরম্পরায়ও আহার ব্যবহার এবং উদ্বাহাদি ক্রিয়া অবশ্য নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। কিন্তু এই যুক্তিটী আমাদের মত না প্রতিকূল, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অনুকূল বলিতে হইবে। আমরা স্বীকার করি যে, গুণবান স্বামী ও গুণবতী ভার্য্যার মিলন সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত সন্দেহ নাই। এরূপে গুণের সমাদর রক্ষিত হয়, এবং অবৈধ মিলন বিরহে উত্তরোত্তর গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধিও ইহার আবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এরূপ বাঞ্ছনীয় মিলন স্থলে গুণবান ও গুণহীন বলিয়া পৃথক পৃথক বংশ নির্দ্দেশ করা কি স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? জাতিভেদ অথবা বর্ণভেদ মূলক যেখানে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রাদির ন্যায় পরস্পর প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান নাই, অথচ শ্রমবিভাগ নীতি অনুসারেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় পৃথক পৃথক ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত বৈষম্যও লক্ষিত হয় না; যেখানে কুলীন ও অকুলীনের ব্যক্তিগত শ্রেণী বিভাগস্থলে বংশ নির্দ্দেশ করা কি ঘোরতর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের ফল নহে? এক পিতার পুত্র কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ স্থূলবুদ্ধি, কেহ বিনীত শান্ত, কেহ বা উদ্ধত-স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একই শুক্র শোণিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি এরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, তবে বংশ পরম্পরাক্রমে যে আরও কত গুরুতর পার্থক্য জন্মিতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং কুলীনের বংশানুক্রমে যে সকলেই কৌলিন্য লক্ষণাক্রান্ত নবগুণ বিশিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করা উন্মাদ কল্পনা বই আর কিছুই নহে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে গুণবানের সম্মান ও উৎসাহ বর্দ্ধন এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি, তাহা ব্যক্তিগত অথবা

গুণগত উপাধি ভিন্ন কখনই বংশগত নহে।

হিন্দুসমাজে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদিতে যেরূপ প্রভেদ বিদ্যমান, কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ ও ভঙ্গকুলীন প্রভৃতি কুলীন সম্প্রদায়ের অসংখ্য পর্য্যায় পরম্পরার প্রভেদও তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূনতর বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র অথবা বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে যেমন তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হন; "কুলীনেরা শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে বংশজ এবং নিকষ কুলীনেরা বংশজের কন্যা গ্রহণ করিলে স্বকৃত-ভঙ্গ আখ্যা পান।" অর্থাৎ পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন। শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় দেখুন। ইহা যদি ব্যবস্থা হয়, তবে অব্যবস্থা কাহাকে বলে, জানি না। অনেকে আবার এই অসার কৌলিন্য প্রথার অংশতঃ সংস্কার প্রয়াসী; আমরা বলি যে, তাঁহাদের মত ভ্রান্তবুদ্ধি আর কেহই নহে। মূলশূন্য বিষয়ের মূলানুসন্ধানে চেষ্টা করা ও আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উভয়ই তুল্য, কারণ যে কুসংস্কার ভিত্তির উপর বর্ত্তমান কৌলিন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংস্কার অথবা সমলে উৎপাটন করা একই কথা। অপিচ বিষবৃক্ষের শাখাচ্ছেদ না করিয়া আমূলত উৎপাটন করাই সুকৃষাণের কাজ, কিন্তু কুলীনেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে এই কুসংস্কার নীতির মূলোচ্ছেদ করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। আর এখনও সমাজে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক; দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিশেষ সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাহাদের নিকট কৌলিন্য প্রথার অপকারিতা বর্ণন ও অরণ্যে রোদনে কিছুই ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু যাবং না সমাজ মর্ম্ম-কৃন্তনকারী কৌলিন্য প্রথার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়, তাবং সামাজিক মঙ্গলের আশাও সুদূরপরাহত।

হিন্দুশাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ পদ্ধতি উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে পৈশাচিক বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম। কিন্তু এই গণনা অনুসারে ধরিতে গেলে বর্ত্তমান কৌলিন্য বিবাহের স্থান কোথায় হইবে, তাহা স্থির করাও কঠিন। অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত সপ্তম বর্ষীয়া বালিকার এবং চত্বারিংশত্ বর্ষীয়া প্রৌঢ়ার সঙ্গে দশম বর্ষীয় বালকের পরিণয়, কিরূপ অভাবনীয় দৃশ্য, তাহা মনে করাও কষ্টকর। ভারতীয় আদিম অনার্য্য সমাজে যখন সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, একমাত্র পাশব প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্যই যখন বিবাহের প্রয়োজন হইত, তৎকালীন সমাজে যে সমস্ত কুৎসিত বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল, আধুনিক কৌলিন্য বিবাহ তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। "দক্ষিণ ভারতবর্ষে 'বেডী' বলিয়া একটী জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বিবাহ প্রণালী প্রচলিত। প্রাপ্ত-যৌবনা বিংশতি বা ততোধিক বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোকের একটী পাঁচ বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ হয়। বালকের যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে যে গর্ভধারণে নিরস্ত থাকিতে হয়, এরূপ নহে। সেই স্ত্রী তাহার স্বামীর মাতুল গোষ্ঠীর কোন যুবার সহবাসে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করিতে থাকে। সন্তানগুলি যদিও এইরূপে উৎপন্ন, তথাপি সেই বালক স্বামীর সন্তান বলিয়াই পরিচিত হয়।"*

*"বিবাহ রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ—মালঞ্চ।

বর্ত্তমান কৌলিন্য-বিবাহ এই বর্ব্বর জাতির জুগুপ্সিত প্রথার কতকাংশে অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন সন্তানগণ সপ্ততি, অশীতি, কখন বা ততোধিক রমণীর পানিগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু পত্নীর ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রায় পিতৃ পরিবারের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। অন্য কথা দূরে থাকুক, প্রচুর রূপে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত না হইলে প্রাণান্তেও ইহারা পত্নীর মুখ দর্শন করেন না। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থে কৌলিন্য বিবাহের বিষময় ফল বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে. সুতরাং সে সম্বন্ধে বাহুল্য বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, এরূপ অবৈধ পরিণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যভিচার ও জারজ সন্তানের জন্ম, এবং স্থল বিশেষে ভ্রূণ হত্যা অথবা শোচনীয় আত্মহত্যা। ধন্য দেশাচার! তোমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। তুমি ধর্ম্মের নামে মূর্ত্তিমান অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছে, দেবতা বলিয়া পিশাচের পূজা করিতেছ, অমৃত বলিয়া কালকূট হলাহল ঢালিয়া দিতেছ, এবং ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যার স্রোতে ভারতভূমি কলুষিত করিতেছ। অহো! আমাদের সমাজ এখনও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। আবাহন ও উদ্বোধন ভিন্ন এ মৃতকল্প সমাজের সঞ্জীবনী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইবে না। হায়! সেই মহাত্মা রামমোহন রায় নাই। যাঁহার উদয়োন্মুখী প্রতিভালোকে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ভারতভূমি জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। যিনি অশেষ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া—উৎপীড়িত, নিগৃহীত এবং সমাজে লাঞ্ছিত হইয়াও দেশাচার ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অঙ্গার হইতে হীরক, ভস্ম হইতে অগ্নি, অথবা উপধর্ম্ম হইতে সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয় বঙ্গবাসীর পক্ষে শুভলগ্ন বলিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কি আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি? তাঁহারা সর্ব্বথা সাহস, অধ্যবসায় ও উদ্যমহীন, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের তুচ্ছ অসন্তুষ্টি অথবা নিন্দার ভয়ে ভীত। যেদিন তাঁহারা কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বার্থনাশ, লোকনিন্দা ও সমাজভীতি অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, সেই দিন হিন্দু সমাজে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে। জানি না, এই হতভাগ্য জাতির সে শুভদিন কবে আসিবে!

শ্রীমহেশ চন্দ্র সেন।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা।

(৩)

আদর্শ, মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা। আপনা হইতেই এই কল্পনার উদয়। অথচ কল্পনা বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া, ইহা কস্মিন্‌কালে কেহ উড়াইয়া দিতে পারে নাই। আশৈশব আমরা সকলেই এই কল্পনা-বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকি। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রকারাদি ভেদে অবশ্য এই কল্পনার অনেকটা ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু আমরা সকলেই

যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্ফুট কি অস্ফুট একটি না একটি আদর্শের অধীনে চলিতেছি—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কখন যে এই স্বাভাবিক কল্পনার হাত ছাড়াইতে সক্ষম হইব, সে আশা অতি অল্পই আছে। কৃত্রিম কল্পনা—মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কল্পনার জীবন সঞ্চার করে, ইচ্ছামত যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর; তাহাকেই আমরা কল্পনা বলিয়া বুঝিয়া থাকি; অথবা যাহা অসম্বদ্ধ স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী, এক কথায় যাহা উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকার মাত্র, তাহাকেও আমরা কল্পনা নাম দিয়া থাকি। কিন্তু স্বাভাবিক কল্পনা—মানুষের যাহাতে জীবন সঞ্চার হয়, আপন ইচ্ছামত যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না, এক কথায় মানুষ যাহার সৃষ্টি করে না, প্রকৃত পক্ষে মানুষকে যাহা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ মানুষের চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, যাহার অভাব ঘটিলে আমরা মৃত অচেতন পদার্থবৎ হইয়া পড়ি, সাময়িক অবস্থা ও উত্তেজনার দাস হইয়া পড়ি, তাহাই হইল আসল কল্পনা। এবম্বিধ স্বাভাবিক কল্পনার নাম বিকল্প নহে, তাহার প্রকৃত নাম বরং সঙ্কল্প দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্কল্প ভিন্ন কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়? মহৎ ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত এবম্বিধ স্বাভাবিক কল্পনা বা সঙ্কল্পের অমানুষিক অত্যাশ্চার্য্য মহিমার পরিচয়স্থল। সিদ্ধির মূল মন্ত্র কি—না উজ্জ্বল পরিস্ফুট আদর্শ।

মোট কথা এই—মূল স্বভাব যাহা নিরপেক্ষ ও নির্গুণ, তাহা আমাদিগের সকলেরই বাক্যমন বুদ্ধির অগোচর। তাহাতে উৎপন্ন যে রস, অর্থাৎ আন্তঃকরণিক ঘনীভূত ভাব, যাহাতে নিরাকারে ও সাকারে প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীমের অস্ফুট খণ্ডতা মাত্র হইয়াছে, তাহা অপরিচ্ছিন্ন ভাবমাত্র বিধায়, আমাদিগের নিকট জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয়; আমরা ধরিতে পারি, অথচ পারি না। আদর্শ এই রসের আলেখ্য,—সসীম অথচ সেই অসীমের প্রতিবিম্ব স্বরূপ; আমাদিগের জ্ঞেয় উপাস্য ও ধ্যেয়। আদর্শ হইল স্বভাবের রূপ, বাহিরে স্বভাবের ছায়া। আদর্শ না থাকিলে মূল স্বভাব আমাদিগের নিকট চির অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়। আদর্শ ও স্বভাব পৃথক হইলেও এক। আদর্শ অজ্ঞেয় স্বভাবের সুন্দর মনোহর অভিব্যক্তি, ইহজগতে তাহার একমাত্র পরিচয় স্থল। আদর্শ অতীতকে জীবন্ত করে; ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে আনে, একাধারে উভয় কালকে মিশাইয়া লইয়া, জীবনকে নূতন পরিধি বিস্তার করিবার অবসর ও শক্তি প্রদান করে। স্বভাব হইল বীজ, রস হইল মূল, আদর্শ হইল বৃক্ষ। অতএব আদর্শের পূজা করাও যা, স্বভাবের পূজা করাও তাই।

অতএব আত্মরূপই আদর্শ হইয়া, গুরু হইয়া, ঈশ্বর হইয়া, আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকে; অথচ বোধ হয়—বাস্তবিকই প্রাণে প্রথমতঃ অনুভব হয় যে, সে পদার্থ যেন আমি নহি; আমি যদি সেই আদর্শ হইতাম, তবে আবার তাহা আমার আদর্শ হইবে কিরূপে? বোধ হয় যেন, তাহা আমার অতীত; যেন সে এক অপর প্রচণ্ড শক্তি, যেন সে এক মহাপ্রাণ, তাহাতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ ডুবিয়া রহিয়াছে; আমি যেন নিষ্প্রভ ও মলিনাবস্থায় তাহারই এক কোণে পড়িয়া মিশিয়া গিয়াছি। খদ্যোতে ও চন্দ্রমায়, কূপে ও সাগরে, যত খানি

প্রভেদ, বোধ হয় যেন আমাতে ও আমার অন্তরের সেই মহা মহিমাময় পদার্থে, ঠিক তত খানি প্রভেদ। তবে আর কেমন করিয়া সেই আদর্শরূপকে আমাদিগের স্বভাব ও আত্মরূপ বলিয়া গৌরব করিতে পারি? সহজ দৃষ্টিতে এইরূপই আমাদিগের মনে হয় বটে,—কিন্তু সকল সময় সাদা দেখায় ঠিক দেখা ঘটিয়া উঠে না। কথাটা আমাদিগের আর একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক।

আমাদিগের এই বর্ত্তমান অবস্থাকেই যদি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে হয়, আর এই যে এখনকার অবস্থা, ইহার নামই যদি স্বভাব হয়, অর্থাৎ আমাদিগের বর্ত্তমান আকারকেই যদি আত্মরূপ বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে কেবল যে আদর্শরূপ কখন আত্মরূপ হইতে পারে না, তাহা নহে, এক সঙ্গে সকল গোলই চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহাত আর নহে, বর্ত্তমান রূপকে কেমন করিয়া আত্মস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারা যাইবে? এই খানেই যদি স্বভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া থাকে, তবে আমার জীবনের গতি ত এই খানেই থামিয়া যায়। আমি যা', আমি যদি তাই হইতে পারিয়াছি তবে আর আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি থাকিতে পারে? বৃক্ষের যদি সম্পূর্ণ বিকাশই ঘটিয়া থাকে, তবে আবার তাহার কি বিকাশ হইবে? সার কথা এই যে, ঐ তহবিল কোন দিন সমান থাকে না, প্রতিদিন প্রতি মহূর্ত্তে জমাও হইতেছে, খরচও হইতেছে; দিনান্তের কৈফিয়তে, মজুদ তহবিলে, কিছু না কিছু অবশ্যই তারতম্য ঘটিবে। শৈশবে যাহা ছিলাম, আজ আর সে রকম নহি, তখন আমার এক রকম রূপ ছিল, আজ আমার আর এক রকম রূপ দাঁড়াইয়াছে, বয়োবৃদ্ধেই কি এই বর্ত্তমান রূপ থাকিবে? তারতম্য ঘটিয়া আসিয়াছে ও ঘটিতে থাকিবে, তবে আর এখনকার বিকাশকে স্বভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ বলিয়া কি হিসাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার? অতএব এই অস্ফুট স্বভাব যে আদর্শ ধরিয়া, দিন দিন সমধিক প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, বরং তাহাকেই এক্ষণে স্বভাব বলিয়া মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। থাকুক না তাহা দূরে হউক না তাহা আমা হইতে শত যোজন, লক্ষ যোজন তফাৎ, তথাপি আমি 'প্রকৃত আমি' সেই খানে। হই না আমি ক্ষুদ্র কূপ, আর হউক না তাহা মহাসাগর, তথাপি আমি, 'প্রকৃত আমি' তাই। স্বভাব মানে যদি 'আমি' হই, তবে সেখানে আমার স্বভাবের বিকাশ, সেই খানে আমি,—এ কথা অস্বীকার করি কেমন করিয়া?

ভাল, সেই বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর, এক্ষণে তাহারই আলোচনায় যৎসামান্য ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আদর্শের গোড়ায় থাকে রস; সেই রস যে ঘনীভূত ভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন আদর্শের উৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না। কাজেই সকলের আগে রসের উদ্দীপনা চাহি, ভাবাঙ্গের ঔৎকর্ষ্য সাধন করা চাহি, নতুবা স্বভাব যেমন অব্যক্ত, তেমনি অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেই উদ্দীপনা, সেই ঔৎকর্ষ কিসে হয়? আমরা বলি, সংসারে অনুরূপ পদার্থের মিলনে। অনুরূপ, সসীম ও সাকার দৃষ্টান্ত অনুকূল অবস্থায় না পাইলে রস আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের বেলায় যেমন দৃশ্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক করে, আন্তঃকরণিক ভাবগুলির বেলা-

তেও, ঠিক সেই একই প্রকার নিয়ম বলে, ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব একান্তই থাকা চাহি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাবের বস্তু যেমন ভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি, ভাবও তেমনি সেই ভাব্য বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি। কেবল যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বেলাই আমি জগতের ছাঁচে ঢালা কিছু, তাহা নহে, ভাবের সম্বন্ধেও আমার রূপ জগতের দ্বারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জগত আমাকে যেমন একটা ভাব-দেহ দেয়, আমিও সেইরূপ তাহার ভিতরে একটী ভাবময় জীবনের সঞ্চার করি। আমাদিগের আদর্শ, আমাদিগের অন্তরের ঈশ্বর-ভাবকে, আমরা এই কারণ বশতঃ বাহিরে আঁকিয়া জগদীশ্বর করিয়া তুলি। আমাদিগের অন্তরের আদর্শ চৈতন্যে দয়া প্রেমাদি নিষ্কলঙ্ক সদ্গুণ রাশি দিয়া আমরা তাহা যেরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে ভাল বাসি, জগতের মূল কারণে প্রকৃতপক্ষে তাহার একটী গুণ না থাকিলেও আমরা তাহা সহজেই আরোপ করিয়া লই। হাজার যুক্তি দিয়া বুঝি যে, জগতের মূল কারণে এ সকল গুণ থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে, হাজার চক্ষের সম্মুখে সেই সকল কল্পিত গুণের বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি, তবু তলায় একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকিয়া যায়। ফলতঃ আমি যেমন জগতের প্রতিবিম্ব, জগতও তেমনি সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতিবিম্ব বলিয়া, আমার নিজের আন্তঃকরণিক আদর্শরূপ প্রতিবিম্বে, জগতের মূল কারণের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। এবম্বিধ বিশ্বাসে, অস্তিত্ব ও অস্মিতা, জগত ও আমি, বাহির ও অন্তর, একাকারে একাধারে প্রবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া পড়ে। পারমার্থিক জ্ঞান যে অসীম ও সসীমে, সাকার ও নিরাকারে, একটী অভেদাত্মিক যোগ করিয়া দিতে চায়—ইহা তাহার একটা মস্ত উদাহরণ স্থল।

ভাবের অনুরূপ পদার্থই আমাদিগের চক্ষে একমাত্র সুন্দর বোধ হয়। সৌন্দর্য্যবোধের মূলীভূত কারণ কোথায়?—না আমার নিজেরই ভিতর। আমার ভিতরেই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের খনি লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের আলোক না পড়িলে সে গুলি আজন্মকাল হৃদয় গুহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। কে জানে কত হীরককুচি, কত মণি মরকৎ, কত অমূল্য রত্ন, আমার মজ্জার মর্ম্মস্থানে অন্ধকারে চাপা রহিয়াছে? বাহির হইতে ঠিক আলোক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বহির্জগতে তাহাদের আবির্ভাব হইয়া এই জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। যথাযোগ্য ভাব্য পদার্থের সম্মিলন ব্যতিরেকে, ভাবের সুন্দর বিকাশ কদাচ সম্ভবপর নহে।

সংসারে যা'কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, তা' সকলই আমাদিগের কোন না কোন ভাবাঙ্গের প্রতিরূপ। অসংখ্য তারকা-খচিত অনন্ত নীলাকাশ ও শুভ্র ফেনপুঞ্জময় উত্তাল-তরঙ্গাকুল অকুল জলধি হইতে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বাদল-শোভিত নীহার বিন্দু পর্য্যন্ত সকল পদার্থই আন্তঃকরণিক বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ বলিয়া, তাই তাহারা আমাদিগের নিকট এত সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠে। যাঁহার হৃদয় মহান অনন্ত ভাবের জন্য ব্যাকুল, তিনি স্বতঃই উপরে অনন্তাকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে ভালবাসেন, যাহার প্রাণ আপনা হইতে কোন অনির্দ্দেশ্য অদম্য শক্তির কারণ লালায়িত, তিনি সহজেই ভয়ানক ঝড় তুফানের

দিনে ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে গভীর বজ্ররব শুনিতে ভালবাসেন। এ সকল অতি জানা-কথা, সুতরাং বেশী দৃষ্টান্তদ্বারা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

অতএব আসল, যাহা ভিতরে রহিয়াছে, তাঁহার উদ্রেক ও উদ্দীপনার কারণ বাহিরে নকলের প্রয়োজন করে। একটা কিছু অবলম্বন না পাইলে আগুন জ্বলে না। আগুন যখন জ্বলে, তখন তদবলম্বিত দাহ্য পদার্থকে আত্মস্বরূপে পরিণত করিয়া প্রকাশ পায়। অন্তরে আসল ও বাহিরে নকলের বেলাতেও, ঠিক তাই বুঝিতে হইবে। বাহিরের যে পদার্থ অবলম্বন করিয়া অন্তরের আসল রস প্রকাশ পায়, আদর্শের সৃষ্টি হয়, স্বভাব প্রস্ফুটিত হয়, সে পদার্থ নকল হইলেও অনুভবকালে একত্রে এক সময়ে একাকারে অনুভূত হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, আসলের ঠিক ছায়া, ঠিক অনুরূপ পদার্থ সংসারে পাওয়া যায় না, আবার এমনও হয় যে, আসল সেই আদর্শের প্রকৃত ছায়ার কথক কথক অংশ বিশেষ মাত্র, সেই ভাব দেহের সামান্য অঙ্গ বিশেষের প্রতিরূপ মাত্র, সংসারে পাওয়া যায়। এবম্বিধ ভাবাঙ্গ বিশেষের নকলেও যে কিছুমাত্র ফল পাওয়া না যায়, তাহা নহে। ষোল আনা ভাবের এক আনারও যদি ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়, তাহা হইলে বাকী পনের আনারও কিছু না কিছু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল সময় আসলের নকল সংসারে মিলে না বলিয়া, অথবা যদিও মিলে, অনুকূল মানসিক অবস্থায় তাহা মিলে না বলিয়া, নকলের আবার আর একটা নকল খাড়া করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এতক্ষণ আমরা নৈসর্গিক অকৃত্রিম নকলের কথা বলিয়া আসিতেছিলাম, এখন আমরা বাধ্য হইয়া কৃত্রিম নকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

অরণ্যজাত বৃক্ষাদি প্রাকৃতিক অনুকূল ঘটনা বলে যেমন আপন আপন স্বভাব বিকাশ করে, উদ্যানজাত বৃক্ষাদির বিকাশও সেই প্রকার অনুকূল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে সেই অনুকূল ঘটনাবলী কাহারও ইচ্ছায়ত্ত নহে, অপরটির বেলায় তাহা আমাদিগের অনেকটা আয়ত্তাধীন। মনুষ্যত্বের বেলাতেও তাই। ঠিক অনুকূল প্রাকৃতিক ঘটনা মিলিয়া যায়, ও তাহা অবশ্যই বিকশিত হয়, তাহাতে আর কোন কথা থাকে না; কিন্তু যদি না মিলে, যদি তাহা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি তাহা দুর্ভাগ্য ক্রমে শিলাময় অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপিত হইয়া থাকে, তবে সেই স্বভাব-বীজ ফুটাইবার কারণ সাধ্যমত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। এইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা স্বভাব-বীজ বা অদর্শ চৈতন্য-বীজ বা সহজ জ্ঞান-বীজ বিকশিত করিবার চেষ্টার নাম সাধনা। অকৃত্রিম স্বাভাবিক বিকাশ যে সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ও মূল্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অতীব দুর্লভ। বাহিরের এই বিচিত্র অসংখ্য ঘটনাবলী, আর অন্তরের এই অগণ্য কূট আবর্ত্তনশীল ভাবচক্র,—এতদুভয়ের সামঞ্জস্য প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কাজেই সাধনা ভিন্ন, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর থাকে।

কৃত্রিমতা আবার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভেদে দ্বিবিধ। কৃত্রিমতা স্বাভাবিক হইতে পারে—এ কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু বুঝিলে আর সে আশ্চর্য্য বোধ থাকে না। যে কৃত্রিমতা বিকল্প ও বিপর্য্যয় বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, যাহার অনুরূপ কোথাও কোন পদার্থে প্রাপ্ত হইবার আশা করা যায় না, যাহা মনের উদ্ভ্রান্ত ক্রীড়ার ফল মাত্র, যাহা অন্তরে স্বভাবের কোন এলেখা রাখে না, বাহিরে নৈসর্গিক নিয়মের বড় ধার ধারে না, তাহা যে অনেকটা অসার, তাহা আর বেশী করিয়া সকলকে জানাইতে হইবে না। কিন্তু কৃত্রিমতা—যাহার প্রাণ হইয়াছে স্বভাব, ছায়ার ন্যায় যাহা স্বভাবের অনুবর্ত্তী, যাহা দেখিলে স্বভাবের কথা মনে আসে, রসের স্রোত বহে, আদর্শের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হয়, হউক না তাহা মানুষের কৃত, কৃত্রিম হইলেও তাহা আমাদের পরম আদরের বস্তু।

আর হিসাব মত ধরিলে আমাদিগের এমন কোন্ বিদ্যা আছে, যাহা কৃত্রিমতার হস্ত হইতে নিস্তার পায়? নিস্তার পাওয়া দূরের কথা, কৃত্রিমতাই সকল বিদ্যার সারভূত আসল পদার্থ। গণিত বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার পত্তন হয় কিসে—না স্বভাবের অনুকরণে। স্বভাব বলিতে অবশ্য এখানে বাহ্যপ্রকৃতিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতিরই ধারা দৃষ্টে ধারাপাতের উৎপত্তি। ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল হইল বাহিরের এই অসীম ক্ষেত্র-বিন্দু ও অণুত একই জিনিষ। ছোট বড় সকল কল কারখানা এই প্রকৃতির ভিতরেই বিদ্যমান। মানুষ যত তাহার অনুকরণ করিতে পারে, ততই তাহার বাহাদুরি। আমরা কোন্ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহার উদ্বোধয়িত্রী প্রকৃতি নহে? অতএব স্বভাবের আদর্শে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি, তাহা কদাপি তুচ্ছ হইতে পারে না, বরং তাহাই যে আমাদিগের সকল বিদ্যার, সকল সভ্যতার প্রশস্ত সোপান স্বরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই বলিলেও, বোধ হয়, বড় একটা অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু এ'সকল ত হইল বহি প্রকৃতির অনুকরণ বাহিরেই রচিত, অন্তর্জ্জগতের কৃত্রিম অনুকরণ কোথায়? বহির্জ্জগতের অনুকরণে আমাদিগের সভ্যতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, বাহিরের বিস্তর অভাব পূর্ণ হইয়াছে, অনেক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কষ্ট দূর হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু এসকলই ত হইল বাহিরের ঔৎকর্ষ্য। এই বাহিরের ঔৎকর্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রিত অন্তর্জ্জগতের যেটুক উন্নতি সম্ভব, তাহা হইয়াছে বই কি? কিন্তু ইহাতে যে আমাদিগের স্বভাবের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইতেছে না। আসল অভাব যাহা, তাহা যে পূরিতেছে না। আধ্যাত্মিকের ঘর যে একরকম একেবারেই খালি। স্বভাবের, মনুষ্যত্বের উন্নতি, জড়জগতের কেবল মাত্র জড় অনুকরণ হইতে আশা করা যাইতে পারে না। তবে এখন চাই কি? চাই—জড়ে চৈতন্যের প্রতিভাস, জড় পদার্থের এমন সব অনুকরণ, যাহা দেখিলে, যাহা ধারণা করিলে সহজে—অতি সহজে—চৈতন্য জগতের ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়, যাহাতে চিত্ত সমাবিষ্ট করিলে, অতি সহজ ভাবে স্বভাবের কথা মনে আসে; মানুষ যা' মানুষ তাই শিক্ষালাভ করে। এমন যদি কৃত্রিম অনুকরণ থাকে, এমন কৃত্রিম অনুকরণ হওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে হউক না

তাহা কল্পনা-প্রসূত,—হইলেও, তাহা সাধনের জিনিষ বটে।

অসম্ভব না হইলেও না হইতে পারে। কবিত্বে, সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যায় তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বাহিরের জিনিষে ভিতরের ভাবের প্রতিবিম্ব দর্শন, ভাবুক ব্যক্তিবর্গের অগোচর নেহ। কচি ছেলের সরল হাসি দেখিলে, অতি কুটিল প্রাণেও একটুক না একটুক সরলতার উদয় হইয়া থাকে। একটি ফুট ফুটে গোলাপ ফুল দেখিলে, ভাবুক ব্যক্তির মনে কিছু না কিছু সুন্দর ভাব আসে। একটি ধপ্‌ধপে পদ্ম দেখিলে করির প্রাণে, কোথা হইতে কে জানে, কিছু না কিছু পবিত্রতার ছায়া পড়ে। কিন্তু কবি যাহা সঙ্কেতে বলেন, চিত্রকর তাহা খুলিয়া প্রকাশ করেন। ভাষার তুলিতে যতটুকু আঁকা যায়, রঙের তুলিতে তার চেয়ে অনেক ভাল করিয়া আঁকিতে পারা যায় বলিয়া বোধ হয়। আসল কথা এই যে, আমাদিগের অন্তঃকরণ-জাত আদর্শ-চৈতন্যের সমষ্টিগত ভাব, যেমন আমরা সমস্ত জগতে আরোপ করিয়া, তাহার ভিতরে তদনুরূপ একটি চিন্ময় সত্তা কল্পনা মতে, জগদীশ্বরকে মানবোচিত গুণ ও ধর্ম্মে সজ্জিত করিয়া থাকি; সেইরূপ আমরা ব্যষ্টি ভাবের প্রাবল্যে, ভাবানুগ কবিত্ব আদি বিদ্যাতে, কোন কোন অচেতন পদার্থের ভিতরে, আপন ভাবের ছায়া পাইয়া তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া থাকি। তবে কবিত্বে বল, চিত্রবিদ্যায় বল, ইহারা জড়ে যদিও চৈতন্যের কথক প্রতিভাস আনে বটে, কিন্তু তথাপি তাহা নৈসর্গিক বহির্জ্জগতে অন্তর্জ্জগতের ভাব রচনা বই আর কিছুই নহে। এখন তবে অমরা চাই কি? চাই, এমন কবিত্ব, এমন চিত্রবিদ্যা, যাহা বহির্জ্জগতের উপর টেক্কা মারিয়া, আপন মন হইতে জড় দিয়া এমন জিনিষ গড়ে, যাহার একমাত্র আদর্শ আমাদিগের স্বভাব।

অকৃত্রিম ভাব বিশেষের কৃত্রিম অনুকরণ দৃষ্টে যে সেই ভাবাঙ্গের একটা ক্ষণস্থায়ী ঔৎকর্ষ্যও সাধিত হইতে পারে, তাহার একটা মস্ত উদাহরণ স্থল রঙ্গক্ষেত্র। অভিনয় যত স্বাভাবিক হয়, ততই যে মনোহর হইয়া থাকে, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেকে, স্বতঃই আমাদিগের যেরূপ অঙ্গবিন্যাস ঘটিয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ ভাব ভঙ্গী দেখিলে, আমাদিগের মনে সেই সকল অকৃত্রিম ভাবের কিছু না কিছু সঞ্চার না ঘটিয়া যায় না। সেগুলি নকল মাত্র বলিয়া পূর্ব্বে জানা থাকিলেও, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে, আমাদিগকে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়। আর কেবল রঙ্গক্ষেত্রই যে ঐ বিষয়ের একমাত্র উদাহরণ স্থল, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ বাগ্মীবর্গের স্থানেও এ বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে। মুখের কথায় যাহা না হয়, কৃত্রিম অঙ্গ সঞ্চালনের কৌশলে যে তাহা ঘটিতে পারে, তাহা বড় বড় বক্তারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে এমন হইয়াছে যে, শ্রোতা বিশেষের দ্বারা যে জ্বলন্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে দেখা গিয়াছে, বক্তৃতার তাহা সার মর্ম্ম হইলেও, বক্তার দ্বারা তাহা ঘটে নাই। এ সকল ব্যাপারের অর্থ কি? কেন এমন হয় তাহা বলি—যে আগুন প্রচ্ছন্নভাবে শ্রোতার প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, যে স্বভাব অব্যক্ত ছিল, যাহার কথা

মনে ছিলনা, বাহিরে তাহার অনুকরণ দৃষ্টে তাহা মনে পড়িল, স্বভাব প্রস্ফুটিত হইল, আগুন হইতে পাঁশ উড়িয়া গেল, শ্রোতার পক্ষেই তাহা হইল, বক্তার পক্ষে তাহা আর ঘটিল না; সুতরাং শ্রোতার দ্বারা জগত যাহা দেখিল, বক্তার নিকট হইতে তাহা দেখিতে পাইল না।

আরও এক প্রকার কৃত্রিমতা আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঐন্দ্রিযিক জ্ঞানের সহিত দৃশ্যাদি বিষয়ের যেমন ধারা সম্বন্ধ আছে, ভাবের বেলাতে ভাব্য বস্তুর সহিত ঠিক তেমনি একটা সম্বন্ধ আছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিষয়াভাবে ঐন্দ্রিযিক জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সেই বিষয় যে বাহিরে খাড়া থাকিবেই থাকিবে, এমন কিছু ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। এমন ত অনেক সময় হয় যে, হয় ত প্রকৃতপক্ষে, বাহিরে কোন জিনিষ নাই, অথচ স্নায়ু সমূহের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রভাবে, আমরা নানাবিধ পদার্থের অস্তিত্ব বাহিরে গড়িয়া পিটিয়া লই। স্বপ্ন দেখিবার সময় প্রায়ই ত এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনুভব কালে বাহ্য বিষয়াদি দ্বারা আমাদিগের স্নায়ু সমূহের যে বিকার ঘটে, আমরা সেই বিকার মাত্রই বুঝিতে সমর্থ হই, ও সেই বিকার-জাত অনুভব সমষ্টিকে দ্রব্য বিশেষে অভিহিত করিয়া থাকি; কিন্তু যদি কোন বিষয় উপস্থিত না থাকে, অথচ অন্য কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ দ্বারা আমাদিগের স্নায়ু সমূহের ঠিক তদনুরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় এই যে, প্রকৃতপক্ষে বাহিরে কোন জিনিস না থাকিলেও, আমরা সেই বিকার সমষ্টি হইতে বাহিরে ঠিক সেই পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করি। নানাবিধ পীড়ায় এ কথার আরও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্ভ্রান্ত ও ক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের খেয়াল ও প্রলাপাদি এই কারণ বশতঃই ঘটিয়া থাকে। এখন বিকার যে কেবল মন্দের দিকেই ঘটে, তাহা নহে, ভালর দিকেও ঘটে। রোগী ও অরোগী, দুঃখী ও সুখী, পাপী ও পুণ্যবানের স্বপ্ন দর্শনের পার্থক্য ও তারতম্য, তাহাদিগের নিদ্রিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আর এবম্বিধ স্নায়ু বিকার যে কেবল আধিভৌতিক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম নানা কারণ হইতে তাহা ঘটিতে পারে। ফলতঃ যে কোন কারণেই হইক, স্নায়ু মণ্ডলীর বিশেষ ধরণের বিকার উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে কোন বিশেষ ভাব অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবলরূপে উদ্দীপ্ত হইলে, তাহাতে ভাব্য বস্তুর দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই দর্শন অর্থে, মানসিক দর্শন অর্থাৎ সেই আসল ভাব্য বস্তুর প্রতিরূপ বা ফটোগ্রাফ্ দর্শন মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন, বিক্ষিপ্ত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য অণু সমূহ সংহত ও ঘনীভূত হইলে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ অন্তরে লীন অজ্ঞাত সূক্ষ্ম মাত্রাবস্থিত 'অনিমা' ভাবের দ্বারা সংগৃহীত ও সংহত হইলেই, তাহা অন্তরে থাকিয়াও যে ইন্দ্রিয় গোচর হয়, অথবা হইতে পারে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এখন এই যে মানসিক প্রতিমূর্ত্তি, তাহার যদি আবার নকল করা যায়, তুলি দিয়া রঙ ফলাইয়া যদি ঠিক আঁকা যায়, অথবা শাস্ত্র-মতে—"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা; মনোময়ী মণীময়ী প্রতিমাষ্ট-বিধাস্মৃত" বলিয়া শৈল ও দার্ব্বাদি দ্বারা

আট রকম করিয়া হউক, অথবা যে কোন রকমে হউক, যদি তাহার আবার নকল মূর্ত্তি বা প্রতিমা এক একটি গড়িয়া বাহিরে খাড়া করা যায়, তবে সমাহিত চিত্তে তাহা দেখিলে, ও তাহা ধ্যান করিলে, কোন প্রকার ভাবের ঔৎকর্ষ্য সাধন হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমরা আর বেশী বলিব কি? হয় কি না হয়, তাহার পরিচয় এবম্বিধ প্রকৃত ভাব-সাধক ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে লওয়া কর্ত্তব্য, অথবা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ মতে, এ বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সাদা চোখে দেখিয়া, সাদা মোটা বুঝিয়া, সকল সময় সকল জিনিষ উপেক্ষা করা বিধেয় নহে।

সংক্ষেপে মোট কথা আমাদিগের এই— যে সকল সুন্দর ভাব স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, অথবা যাহারা স্বভাবেরই সুন্দর বিকাশ, তাহাদিগের ঔৎকর্ষ্য বিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিলেই, আদর্শ চৈতন্যের যথার্থ পূজা করা হয়। আদর্শের পূজায় তাহারাই উদ্বোধক মন্ত্র স্বরূপ। তার পর, হৃদয়ে যখন সেই সকল সুন্দর ভাবের জমাট বাঁধে, যখন একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব আসিয়া হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া যায়, যখন তাহার প্রসাদে রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই—কেবল তখনই, আদর্শ-চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা প্রাণে আরম্ভ হয়। অতএব গোড়ায় সেই সকল সুন্দর ভাবকে উদ্দীপিত করিবার কারণ, ও একবার উদ্দীপিত হইলে, তাহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিবার কারণ, ভাব্য পদার্থের অবলম্বন আবশ্যক করে। মানে এই যে, দৃশ্য ব্যতীত যেমন দর্শন অসম্ভব, তেমনি ভাব্য বস্তু ব্যতিরেকে ভাবের উদ্দীপনাও অসম্ভব। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে সেই ভাব্য পদার্থ দ্বিবিধ। যেখানে অন্তঃকরণের অনুকূল অবস্থায় ভাবের অনুরূপ অকৃত্রিম পদার্থ সংসারে না মিলে, সেইখানে কৃত্রিমতার অবতারণা সহজেই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই কৃত্রিমতা দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা প্রকারে হইয়া থাকে ও হইতে পারে। পুত্তলিকা গঠন সেই কৃত্রিমতার বা সাদা কথায় সাধনের একটি অঙ্গ বিশেষ মাত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অতএব নিরাকার ব্রহ্ম মানে যদি স্বভাব হয়, পরমেশ্বর মানে যদি আদর্শ-চৈতন্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃত পৌত্তলিকতা তাহার কিছু মাত্র বিরোধী নহে ও হইতে পারে না। তবে যে স্থলে স্বভাব ও আদর্শ-চৈতন্যের উদ্দীপনার কারণ পৌত্তলিকতা অনুষ্ঠিত হয় না, যে স্থলে পৌত্তলিকতা মধ্যে পুঁতুলই একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন হইয়া উঠে, সে স্থলে প্রকৃতই "মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্ত স্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তিতে" মূর্খ তপস্বী সকল মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত প্রতিমা সমূহে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া যে বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পৌত্তলিকতা অনুমোদিত হইয়া থাকে, স্বভাব ও আদর্শ-চৈতন্যের উদ্দীপনাই তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য বটে কি না, তাহা পাঠকবর্গের ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের উপর নির্ভর থাকিল। ফলে, পরিশেষে তাহা যদি ভাব সাধনার অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রের নিম্নলিখিত উক্তিটি যথার্থই সার্থক হইয়া উঠে। সেই উক্তিটি কি,—না

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।"

শ্রীবিপিন বেহারী সেন।

হিন্দু ও মুসলমান।

ভাবতবাসীদিগকে "হিন্দু" এই নাম মুসলমানেবাই দিযাছেন এবং ভাবতবর্ষকে "হিন্দুস্থান" নামে তাঁহাবাই অভিহিত কবিয়াছেন। হিন্দুস্থানে যে লোক বাস কবে, তাহাকে হিন্দু বলা তাহাদিগেব উদ্দেশ্য, এক্ষণ দেখা যাইতেছে, হিন্দুবা অতিশয় সমাদরেব সহিত সেই নাম গ্রহণ কবিযাছেন।

এই নামকবণেব পব মুসলমানেবা স্বযং এদেশে বাস কবেন এবং শাসনে কি প্রলোভনে জানি না, বহু সংখ্যক হিন্দু স্বধর্ম্মত্যাগ কবিযা মুসলমান হয। এক্ষণে যে মুসলমান জাতি ভাবতবর্ষে দেখা যাইতেছে, ইহাব পনব আনা না হউক, একটা প্রচুব অংশ যে হিন্দু ইহা বিশ্বাস কবিবাব যথেষ্ট কাবণ আছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান হইযাছেন, তাঁহাদিগেব আমূল পবিচয অদ্যাপি পাওযা যায, মূর্খ দবিদ্রদিগেব কোন পবিচয় পাওযা যায না। এরূপ ভাবে হিন্দুদিগকে গ্রহণ কবিযা নিজেব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পবিপুষ্টি সাধন কবাতে বিশুদ্ধ মুসলমানদিগেব প্রতি কোন দোষাবোপ হইতে হইতে পারে না, কাবণ এক্ষণও দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টানেবা পৃথিবীব নানা স্থানে লোককে ভজাইযা নিজপক্ষের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

আমি এ কথার উল্লেখ কবিতেছি এই জন্য যে, তোমরাই এদেশীগিকে আর্য্য নাম মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দু নাম ও এ দেশকে হিন্দুস্থান নাম দিলে, তার পর নিজেরা হিন্দুস্থানে বাস করিলে, এক্ষণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চাহ না কেন? নিজেব বক্ষিত সংজ্ঞা নিজে গ্রহণ কবিতে অস্বীকাব হও কেন? নিজেব নিযমেব প্রতি সম্মান দেখানইত গৌববেব বিষয। বিশেষতঃ কোবাণিক ও পৌবাণিক ধর্ম্মে গুরুতব কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না; বৈদিক একমেবাদ্বিতীযং ও কোবাণেব লা এলাহা এল্লেল্লা একই অর্থব্যঞ্জক মহাবাক্য, সুতবাং উভয়ের সৌহার্দ্দবই ত যথেষ্ট কাবণ দেখা যাইতেছে। সাকাব নিবাকাবেব যে ভেদেব কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা তুচ্ছ, কাবণ বেদে সাকাব নিবাকাব, দুই মতই গৃহীত হইযাছে।

সামাজিক হিন্দু মুসলমান, যাহাবা দেশেব প্রকৃত মেরুদণ্ড, তাহাদিগেব মধ্যে অতি পবিত্র সদ্ভাব দেখিতে পাই। শ্রমজীবীবা পবস্পবেব সহিত এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্মিলিত হইযা পড়িযাছে যে, তাহাদিগেব আজীবন কথনও স্মবণও হয় না যে, উভয়ে কোন পৃথক্ ধর্ম্মেব উপাসক। গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীব মধ্যেও স্বর্গীয সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায। বিপবীত ভাব দেখা যাইতেছে, কেবল শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী সহববাসী জন কযেকেব মধ্যে। দূষিত বুদ্ধিতে ইহাদিগের মন এতই অপ্রশস্ত হইযা পড়িয়াছে যে, উভযেব লক্ষ লক্ষ সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও কেহই কাণাব ন্যায় অপরে একটীও গুণ খুঁজিয়া পাইতেছে না; ক্রমাগত উভয়ে উভযের বৃথা দোষান্বেষণ কবিযা হাঁপাইয়া মবিতেছে। হিন্দুব উন্নতি দেখিয়া মুসলমান কাঁদেন, মুসলমানেব উন্নতি দেখিযা হিন্দু

কাঁদেন। দুই হতভাগ্য কুক্কুর ভোজন-নিযুক্ত ইংরেজের দরজায় শুইয়া লেজ নাড়িতেছেন, এক খানা কাঁটা পড়িতেছে আর অমনি দুই জনে মহা কামড়া কামড়ি আরম্ভ করিতেছেন; একের মুখে এক খানা ভাল কাঁটা দেখিলে অশ্রুজলে অপরের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। ইহারাই কি সেই খ্যাত নামা শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ ঋষিদিগের বংশাবতংশ? ইহারাই কি সেই উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্য বংশের বংশধর? ইহারাই কি বীরপ্রবর তৈমুর খাঁর বংশধুরন্ধর? অথবা ইহারাই কি সেই উজ্জ্বল মোগল বংশের পতাকা? বিশ্বাস ত হয় না।

যদিও মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে ভারতবর্ষকে কোন দেশান্তরকে কর দিতে হইত না, বরং কাবুল ও বর্ম্মার অর্থে সময় সময় ভারতবর্ষীয় কোষ পুষ্ট হইত, এবং ভারতবর্ষের ধন সমৃদ্ধির কথা পৃথিবীময় উপকথারূপে কথিত হইত, যদিও তখন আইনসঙ্গত লুণ্ঠন ছিল না, যদিও অনিবার্য্য বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের রুধির শুষ্ক হইত না, তথাপি কতকগুলি ছাগোপম শিক্ষিত হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বকে ভারতবর্ষের পরাধীনতা ভিন্ন বলিতে চাহেন না। স্বাধীনতা বলে কাহাকে বোঝ, খাটাস? এক জন মুসলমান সম্রাটের অণুবীক্ষণের অবধারণীয় কোথায় কি একটা দোষ ছিল বলিয়া, তাহারা সমস্ত মুসলমান শাসনের দোষারোপ করেন। নিজের ঘরের দোষ সত্য হইলেও পরের কাছে বলাতে যে কাপুরুষতা হয়, তাহা এই শৃগালেরা কদাচ বুঝিবে না। ইহাদিগের মধ্যে এরূপ অর্দ্ধোন্মাদ অনেক আছে, যাহারা নিজ রচিত গ্রন্থে একটা কাল্পনিক হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সাজাইয়া, সেই ছুতায় মুসলমানদিগের ভূরি ভূরি কুৎসা কীর্ত্তন করে, কখনও বা এই সকল বিদ্বেষোৎপাদক রচনা ধাঙ্গোরদিগের থিয়েটারে অভিনীত হয়, এই সকল আলকাতরা পোরা মাথাওয়ালা হতভাগারা কখনও বুঝিবে কি যে, ভারতবর্ষীয় জাতি কাহাকে বলে? এরূপ এক খানি গ্রন্থে ও একটী অভিনয়ে ভারতবর্ষের শুভ দিন যে ৫০ বৎসর করিয়া পিছাইয়া যায়, ইহা ঐ পামরেরা মানিবে কি?

হিন্দু গ্রন্থকারেরা গ্রীক ল্যাটিনের মূল্যবান লেখা সকল মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতেছে, কিন্তু আরবিতে যে সকল অমূল্য নিধি আছে, তাহা অনুবাদ করে না, তার বেলায় সব ধেনো কাণা। সমাজে যে সকল আরবি শব্দ দেশীয় ভাষার সহিত অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে, অভিধানে অদ্যাপি তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই; স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে রামায়ণ মহাভারত ও বাইবেলের উত্তম উপদেশ সকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আরব্য শাস্ত্রের রত্ন সকল উপেক্ষিত হয়। কোরাণ যে এদেশের এক খানা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং বাইবেল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক আত্মীয়, তাহা গদ্দভদিগের বুঝিবার সাধ্য নাই।

মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ গোমাংস ভক্ষণ করেন, ইহা হিন্দুরা সহিতে পারেন না। নিজের পয়সায় নিজের ঘরে বসিয়া তিনি যাহা ইচ্ছা খাইবেন, তুমি তাহাতে কথা কহিবার কে? কোন শাস্ত্র অনুসারেইত সে পাপ তোমার হইবে না। বিশেষতঃ শাক্তদিগের পক্ষে ছাগাদি বলি দেওয়া যেমন তন্ত্র শাস্ত্রের আদেশ, মুসলমানদিগের পক্ষেও গোরু কোরবানি করা,

বলি দেওয়া, শুনিয়াছি সেইরূপ কোরাণের আদেশ, সুতরাং ইহাতে আপত্তি করা ত উচিত হয় না; আরও দেখ, গোমাংস ভোজনে মুসলমানের যে তৃপ্তি হয়, সে তৃপ্তি অন্য কিছুর দ্বারা দিতে পারে কি? আমি জানি এ দেশ কৃষি প্রধান এবং ইহাও জানি যে গোবংশের ক্রমশঃ হানি হইতেছে, কিন্তু ঐ হানি যে মুসলমানদিগের ভক্ষণে হইতেছে, ইহা তুমি কিসে আমাকে বিশ্বাস করাইতে পার? আমার ত ইহা অটল সংস্কার যে, চারণ স্থানের অভাবে গোজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের হুতাশে দেশের প্রায় সমস্ত পতিত ভূমি চষা হইয়া গিয়াছে, গোরুর চরিবার স্থান নাই, এক্ষণ কাজেই অনাহারে ন্যূনাহারে গোরুর ক্ষয় হইতেছে। এ গরম দেশ, এ দেশে গোমাংস অসহ্য, ইহা অনেক মুসলমানেরা জানেন; মুসলমান সমাজে বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোকের অভাব নাই, এজন্য কৃষির অদ্বিতীয় সহায়কে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে অনেকেই নারাজ। গোমাংসের ভক্ষক বোধ হয় মুসলমানের শতকরা এক জন, ইহাতে এত আপত্তি উত্থাপন করা হিন্দুর বিধেয় হইতে পারে না। যদি এই গোমাংস ভক্ষণ ব্যাপারে, ন্যায়তঃ বলিবার কোন কথা থাকে, তবে সে এই যে গাভীর গর্ব্ভে বৎসাদি জন্মে, এজন্য গাভীর দ্বারাই গোবংসের বৃদ্ধি হয়, পুংগো একটী দ্বারা শত গাভী পাল পাইতে পারে। অতএব খাইতে হইলে বা কোর্বানি করিতে হইলে, গাভী হত্যা না করিয়া গো হত্যা করাই উচিত। আমি শুনিয়াছি, মক্কায়ও অতি সতর্কতার সহিত এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। হিন্দুরা শ্রাদ্ধাদিতে যে ষাড় করেন, তাহাও গোবংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত অননুকূল হইয়া উঠিয়াছেন—শিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে একটু অগ্রসর দেখিয়া তাঁহারা একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। চিনের, ফরাসির, জার্ম্মানির উন্নতিতে তাঁহারা নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর উন্নতি দেখিলে কষ্ট বোধ হয়, কারণ বুদ্ধি দোষে ভাবেন, হিন্দুরা তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি। হিন্দুরা প্রজাসাধারণের হিতের জন্য কোন একটা রাজনৈতিক আন্দোলন উত্থাপিত করিলে, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে শুভপ্রসূ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মুসলমানেরা তাহাতে যোগ দান করিতে চাহেন না। ভারতবর্ষে সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষার প্রস্তাব হইল, পাছে হিন্দুরা অধিক সিভিলিয়ান হয়, এই শঙ্কায় মুসলমানেরা তাহাতে আপত্তি করিলেন; বিদেশী ইংরেজ সিভিলিয়ানকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুকে পারেন না, ইহা ভারতবর্ষের দগ্ধ অদৃষ্টের ফল। ভাব, কাল যদি ইংরেজ জাতি এ দেশ শাসনে অস্বীকৃত হয়, তবে তোমরা এ দেশ শাসনের কি ব্যবস্থা করিবে? ইংলণ্ড জার্ম্মানি হইতে লোক আনাইবে, না নিজের দেশের যোগ্যতম লোকের দ্বারা কর্ম্ম চালাইবে? দেশীয় কার্য্যের যোগ্যতার পরীক্ষাকে ইংলণ্ডে হওয়া উত্তম বোধ করিলে, যদি ইংলণ্ড তোমার একটী ছেলের জন্য লক্ষ টাকা করিয়া ফি লয়, তাহা হইলে ত তোমার একটীও সিভিলিয়ান হইতে পারে না, তখন কি পেকিন পরীক্ষা স্থান করিবে, না নিউ-

ইর্কে থাইবে? ধিক্ এরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধিকে, ধিক্ এরূপ আত্মপর বিচারকে, ধিক্ এরূপ জাতিদ্রোহিতাকে।

মহার্ঘ মূল্যে বিচার বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশ ছারে খারে গেল; দুর্ভিক্ষ প্রজাদিগকে প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ পরিমাণ ধ্বংস করিতে লাগিল, অস্ত্র আইনে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নিরীহ প্রজা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নষ্ট হইল; বনকর বিভাগের অত্যাচারে সহস্র সহস্র রাওয়াল হাহাকার করিয়া মরিল, লবণের বৃদ্ধি দরে শত শত দুঃখী প্রজা আলুনী খাইয়া মরিল; দুর্ভিক্ষ তহবিলের নাম করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স লওয়া হইল; পরে সেই টাকা দুর্ভিক্ষে না ব্যয় করিয়া অন্যায় যুদ্ধে উড়ান হইল, অবশেষে ইন্‌কম টেক্স নামের দ্বারা লাইসেন্স টেক্সের নামকে একেবারে সমাহিত করিয়া দুর্ভিক্ষতহবিলের ইতিহাসটাকে পর্য্যন্ত হজম করা হইল—এ সমস্তই মুসলমানেরা সহ্য করিবেন, তথাপি হিন্দুর সহিত মিলিয়া, উভয়ে ভাই ভাই ভাবে কার্য্য করিবেন না। এরূপ বিদ্বেষের বিদ্যমানতায়, বিপক্ষের পক্ষে কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় নয়?

হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিলে, তাহাকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষীয় জাতির সেবক হইতে হয়, ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন কি? (১) দেশের উৎপত্তি বৃদ্ধি, (২) দেশের ধন বিদেশে যাওয়া রোধ করা, (৩) বিদেশের ধন স্বদেশে আনা, (৪) দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা, এই চারিটীই জাতির সম্বন্ধে মহৎ কার্য্য, যে ইহার কোন একটী করিতে পারিবে, পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত। আনন্দমোহন বসু র‍্যাঙ্গালার পরীক্ষা পাস করাতে পৃথিবীর নিকট ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহাতে যদি ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে না আশীর্ব্বাদ করেন, তবে তাঁহার পরিশ্রম কিসে সার্থক হইবে?

শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ্যেরা যে বৃত্তি পাইয়া থাকেন ও চাকরি ক্ষেত্রে যোগ্যেরা যে চাকরি পাইয়া থাকেন, মুসলমানেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, সাম্যনীতি তাহাদিগের নিকট কুৎসিত বলিয়া বোধ হইল, এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া বৃত্তি ও চাকরি বিলি সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ও জন সাধারণের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মুসলমানেরা বুঝেন না। সাম্যনীতি বাস্তবিক অতিশয় পবিত্র নীতি, উহাতে অবস্থিতি করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট বিঘ্নশূন্য হয় এবং এই নীতি অনুসৃত হইলে প্রজা সাধারণের অত্যন্ত মঙ্গল হয়।

এই নীতির ব্যতিক্রম হইলে প্রজা ও গবর্ণমেণ্টের কি অমঙ্গল হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জগতে গুণই একমাত্র পূজ্য পদার্থ, যেখানে গুণের অনাদর, সেখানে শান্তি কদাচ থাকিবে না, কারণ মহৎ উদ্দেশ্যে কখনই গুণ অনাদৃত হইতে পারে না। হিন্দু পরীক্ষায় যে গুণ দেখাইয়া বৃত্তি পায় না, তদপেক্ষা কম গুণ দেখাইয়া মুসলমান বৃত্তি পাইলে, গুণের অবমাননা হইল না কি? আবার দেখুন, চাকরিগুলি সমস্তই প্রজা সাধারণের হিতের জন্য; যে কার্য্য উপস্থিত, তাহাতে প্রাপ্তব্য যোগ্যতম লোক নিযুক্ত হইলেই প্রজার

পূর্ণ মঙ্গল হয়; যদি যোগ্যতম ব্যক্তিকে উপেক্ষা কবিয়া হীনগুণকে ঐ কার্য্য দেও, প্রজাব উত্তম সেবা হইবে না, গুণেব অবমাননায় বাজ্যে পাপ প্রবেশ কবিবে। সুতবাং এ বিষযে মুসলমান গবর্ণমেণ্টেব নিকট যে অনুগ্রহ পাইযাছেন, তাহাতে সাম্যনীতি যে পদদলিত হইযাছে, তাহাতে সংশয় নাই, ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া যদি মুসলমান প্রজা সাধাবণেব কষ্টেব প্রতি ভ্রুক্ষেপ না না কবেন, তাহা হইলে ঐ অনুগ্রহ নিশ্চয়ই শুভফল প্রসব কবে নাই, ববং ঘুষেব ন্যায় কার্য্য কবিয়াছে বলিযা স্বীকাব কবিতে হইবে।

ইহাতে কোন মুসলমান বলিতে পাবেন যে, তবে কি আমবা কখনও উন্নতি কবিব না, ইহাই আপনাব অভিপ্রায়? তদুত্তবে আমি বলি যে, না, কদাচ তাহা নহে। এ দেশেব প্রত্যেক মনুষ্যই ভাবতবর্ষীয় মহাজাতিব ভৃত্য। ঈশ্বব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন কোন অতি মহৎ যোগ্যতায় ভূষিত কবিয়া সৃষ্টি কবিযাছেন, এই হিসাবে কেহ কৃষক, কেহ উকীল, কেহ ডাক্তাব হওয়া উচিত। জাতিব নিকট কৃষকেব ও উকীলেব সম্মানেব কোন তাবতম্য নাই, সকলেই জাতিব মহাযজ্ঞেব কুশসমিধ সদৃশ। তাহাতে তুমি যদি জোব করিয়া ডাক্তাবকে কৃষক, ও কৃষককে এঞ্জিনিয়ার কব, তাহাতে দেশের কল্যাণ হইতে পারে না। উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ই উন্নতিব এক মাত্র বীজ, তাহাব আশ্রয় না লইয়া সঙ্কীর্ণ বিধির অনুসন্ধান করাটা ভ্রম নয় ত কি? ডাক্তার বাউটন এক জন মুসলমান রাজপুরুষের নিকট ইংলণ্ডীয় জাতির জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট ছিলেন, কেবল প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট সম্প্রদায়েব জন্য চাহিলেও পাবিতেন; কিন্তু তিনি জাতিব হিতাহিতেব যে পবিশুদ্ধ বুদ্ধিব অধিকারী ছিলেন, তাহাতে তিনি সেরূপ চাহিতে পাবেন নাই।

হিন্দুবা কদাচ তোমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে; তোমবাও যে (জাতিব শুভ স্বরূপ) তীর্থেব যাত্রী, হিন্দুবাও তাহাই। বাজনৈতিক আন্দোলনে যদি এক কপর্দ্দকও লাভ হয়, তাহা হইলে কেবল হিন্দুব তাহা ভোগ কবিবাব কোন সম্ভাবনা নাই, কাবণ হিন্দু নিজেব জন্য বাজদ্বাবে কোন সংস্কাবেব প্রার্থনা কবে নাই। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায যদি স্ব স্ব পক্ষেব জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কবে, তাহা হইলে জাতিব কল্যাণেব আশা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। ইউবেসিযগণ যে অশেষ প্রকাবেব বিশেষ অনুগ্রহ ভোগ কবিতেছে, তজ্জন্য হিন্দু মুসলমানেব কিছু উদ্বিগ্ন হইবাব আবশ্যক নাই, কাবণ প্রত্যেক ইউবেসিয়ান দুইটা কবিয়া হ্যাট মাথায় দিলেও আমি নখদর্পণে দেখিতেছি, উহারা ভাবতবাসী ভিন্ন আব কিছুই নহে। উহাবা কালক্রমে বাধ্য হইয়া এদেশেব সুহৃৎ হইবে, ইংবেজ মোহে পড়িয়া দুদ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছে।

মুসলমানদিগেব আবও একটা দোষ এই যে, যদিও তাঁহাবা এই দেশের চির অধিবাসী, তথাপি এদেশেব প্রচলিত ভাষাকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ কবিতেছেন না। দশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের আচার ব্যাবহার সম্বন্ধে যে সৌসাদৃশ্য ছিল, সরা বা ফাবাজীব মত প্রচলিত হইয়া তাহার বিশেষ হানি হইয়াছে। বিবাহাদি উৎসবে এক্ষণ তাহাবা ঢোল ও ফুল ব্যবহার করিতে চাহেন না। নিঃখরচ বিবাহে বিবাহ-ভঙ্গের মোকদ্দামার

সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ বাজনদর ও মালাকর জাতির কেবল হিন্দুর অন্ন সাহায্যে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে।

যাহাতে কোরাণিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের কোণ সংঘর্ষ না ঘটে, অথচ আচার ব্যবহারে উভয়ের সন্নিকর্ষ লাভ হয়, তাহা উভয় পক্ষের পবিত্র দেশহিতৈষীদিগের প্রার্থনীয় নয় কি? সাম্যভাব ত অনেকটা হইয়াছিল; কত হিন্দু খাঁ তরফদার, মজুমদার, পাকড়াসী ও কত মুসলমান বিশ্বাস মণ্ডল উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুরা মাণিকপীরের সিন্নি ও গাজীর ভোগ দিয়া থাকেন। মুসলমানেরা এরূপ কিছু কিছু করিতেন, কিন্তু সরা হইয়া তাহা রহিত হইয়া যাইতেছে। যাহা ধর্ম্মের হানিকর নহে, অথচ সমাজের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধক, তাহাতে আপত্তি করা অপরিণামদর্শিতা। আমার মতে হিন্দুদিগের বারইয়ারিতে মুসলমানদিগের ও মুসলমানদিগের সিন্নিতে হিন্দুদিগের চাঁদা দেওয়া উচিত। উভয়েই যখন সত্য ধর্ম্মের উপাসক, তখন পরস্পরকে কাফের বা যবনের ভাবে দেখা একান্ত পশুবুদ্ধির কার্য্য।

মুসলমানদিগের একটা সংস্কার হইয়াছে যে,হিন্দুরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহারা এই অনুমান করেন যে, ইংরেজদিগের রচিত মুসলমান শাসনের যত ইতিহাস আছে, তাহাতে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতেন, এইরূপ অযথা উক্তিতে পরিপূর্ণ; হিন্দুরা সেই সকল ইতিহাস পড়িয়া এক্ষণ প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের এরূপ সংস্কারের মূল কি, তাহা আমি জানি না, আমি কোন বিষয়ে হিন্দুদিগকে দলবদ্ধ ভাবে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ দেখিনা। কোন কোন মূর্খ হিন্দু যে সকল অন্যায় করে, তাহা সমগ্র হিন্দু জাতির স্কন্ধে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অবিচার।

গোহত্যার-বিরোধী হিন্দু চিরকাল, সে কোন প্রতিশোধ লালসায় নহে। পর্য্যটন করিয়া দেখ, দেশে হাজার হাজার হিন্দুর কৃত স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী, পুল আছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের কিছুমাত্র পক্ষপাত নাই। হিন্দু শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, মুসলমানকে তুল্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। চাকরির বিষয়ে স্বজনের সাহায্য স্বজনে আজ নূতন করিতেছে না; আমি এই জন্য মুক্তভাবে গুণের মানদণ্ড চালাইবার জন্য চীৎকার করি। আরও দেখা কর্ত্তব্য যে, যখন জন সংখ্যায় হিন্দুরা মুসলমানের ৪ গুণ অধিক, তখন চাকরিতে হিন্দুর আধিক্য না হইবে কেন? এক্ষণ যে সে ৪ গুণের স্থলে ৮ গুণ হিন্দু দেখা যাইতেছে, তাহারও কারণ আছে; মুসলমান শ্রেণীতে মধ্যবিতের পরিমাণ অল্প, শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক; হিন্দু শ্রেণীতে মধ্যবিতের সংখ্যা অধিক, শ্রমজীবীর সংখ্যা কম। যদি শ্রমজীবীদিগকে শ্রম ত্যাগ করাইয়া চাকরির মধ্যে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে অনুপাতের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

অতএব আমি কোন প্রকারেই দেখিতে পাইতেছি না যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। উভয়েই যখন চির-ভারতবাসী এবং বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষীয় জাতির অনুপূরক, তখন ইহারা উভয়েই মহাজাতির ভৃত্য ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং যদি কেহ

জাতির মঙ্গলের চেষ্টা না করিয়া, শ্রেণী বিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই শ্রেণী বা ব্যক্তির লোক হইবার যোগ্য, কিন্তু মহাজাতির লোক হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু যাঁহারা মহাসাগর সদৃশ প্রশস্ত হৃদয়ের অধীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ ক্ষুদ্রত্বে অবতরণ করিবেন কেন? তাঁহাদিগের বিরাট প্রাণ নিরন্তর মহাজাতির মঙ্গল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু মুসলমানের কেহই কাহারও শত্রু নহেন, ও হইতে পারেন না—সহরবাসীরা স্বচক্ষে গ্রাম্য হিন্দু মুসলমানের হরিহর ভাব দেখেন নাই, সুতরাং ইহা বুঝিবেন না। সহরে স্বল্প লোক বাস করে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রচুর, তাহাদিগের পরস্পরের অসৌহার্দ্দে অনেক এসে যায়, এজন্য মফস্বলবাসীদিগের প্রার্থনা যে, তাঁহারা পরস্পরকে যথার্থরূপে মানিতে চেষ্টা করেন, দড়ীকে সাপ বলিয়া ভ্রম হইলে সে ভ্রমে মোহ পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে সাপ নহে, দড়ী, অতএব ক্ষান্ত দেও, আর বৃথা পরস্পরের কুৎসা গাইও না; এমনিই ত পরাধীন কুক্কুর, তাহাতে আবার ঘরাঘরি ভেদ সাজাইয়া বিপক্ষের সোণায় সোহাগা করিয়া দিওনা। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিরা—কালকার জাপানও, যে তোমাদের অনৈক্য দেখিয়া উপহাস করে, ইহা কি তোমরা একটুও বুঝনা?

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুকুমার-বিদ্যা ও সমাজ।

রাজ্য সমাজেরই অংশ। জন-সাধারণের নীরব অনুমোদনে সমাজ-প্রতিভূর নাম রাজা, রুক্ষ আন্দোলনে প্রেসিডেণ্ট, ঔদাস্য-জড়তায় সার্ব্বভৌম। রাজ্য, আমাদিগেরই মতিগতি-সঙ্কুল গৃহের সমন্বয়। সুতরাং, রাজনীতি উচ্চাঙ্গের গৃহস্থালী মাত্র। গৃহ ব্যষ্টি, রাজ্য সমষ্টি।

উন্নত গৃহের প্রতি-পুরজনই গৃহস্থালীর উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য নিযুক্ত। রাজ্যের উন্নতি-কল্পে প্রত্যেক প্রজার সাহায্য আবশ্যক। সূত্রের তরঙ্গ-পারঙ্গে বস্ত্র। একটী ক্ষুদ্র প্রজার নিষ্কর্ম্মাবস্থাও প্রকাণ্ড রাজ্যের গলগ্রহ-স্বরূপ। একটী ক্ষুদ্র স্ফোটকে সমস্ত দেহ উত্তাপিত।

আদর্শ গৃহ, ত্রিবৃত্তির সাধনা-স্থল। ত্রি-বৃত্তি—কার্য্যকারিনী, জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী। জগত, সত্য-শিব-সুন্দর। নিত্য-আবশ্যক ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ উভয় বস্তুই গৃহীর সংগ্রহনীয়। বন্যের অরণ্য, দেবতার মন্দারকুঞ্জ, গৃহীর পুরোদ্যান। পুরোদ্যানের একাংশে আহার্য্য লতা-গুল্মাদি, অন্যাংশে বিকসিত পুষ্পরাজি।

সুকুমার-বিদ্যা সভ্যতার দীপ্তি। সুকুমার-বিদ্যার আদরে ও অনুরাগে গৃহস্থের সচ্ছলতা প্রকাশ পায়। রাজ্যেরও তদ্রূপ। গৃহীর ইচ্ছায় পুরোদ্যান পতিত-ভূমি বা নন্দনারণ্যে পরিণত হইতে পারে। গৃহী স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু, রাজ্য বা সমাজ নিয়মাধীন।

[illegible] সমর্থত্র নির্ভরণার্থে বলিষ্ঠ-দিগকে এবং শান্তি-রক্ষার্থে ধর্ম্ম-যোদ্ধাদিগকে সমাজ প্রতিপালন করে। সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমজীবী, বণিক ও যন্ত্র-নির্ম্মাতা-দিগকে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। দেব-প্রসন্নতা-নুরোধে ঋত্বিক ও দৈবজ্ঞগণ সমাজান্নে পরিপুষ্ট। সুকুমার-বিদ্যায় রাজ্যের এবম্বিধ সাক্ষাতঃ কোন লাভ নাই। সুতরাং, শিল্পী, গায়ক, চিত্রকর, সাহিত্য জীবী ইত্যাদি-দিগকে উৎসাহ-দান সমাজের কেন অবশ্য কর্ত্তব্য?—ইহা অর্থ-নীতির কথা।

অর্থ-নীতি মৌলিক অর্থ, অর্থ-সঞ্চয় নহে, অর্থ-ব্যবহার। অর্থাৎ, কিরূপে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। প্রথমে সঞ্চয়ে সুখ, চরমে ব্যয়ে সুখ। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ। অবশ্য সুখোদ্দেশেই ব্যয়। প্রাগুক্ত ত্রিবৃত্তির যথাযথ পরিণতি ফলে সুখ; যথাযথ অনুশীলনে আনন্দ। এই উদ্দেশ্যে ও অনুশীলনেই মনুষ্যত্ব। সুতরাং, ত্রিবৃত্তির সামঞ্জস্য বা মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে চিত্ত রঞ্জিনী-বৃত্তির চর্চ্চানুকূল ব্যয়ে সভ্যতার পরিণতি লক্ষণ। কার্পণ্যে মনুষ্যত্বের ক্ষতি, সভ্যতার অপরিণতি।

সুখ স্বাভাবিকতা, দুঃখ ব্যভিচার। শুদ্ধ বহির্জগত মত্ততায় প্রকৃত সুখ দুর্ল্লভ। বহির্জগত কর্ম্মস্থল; অন্তর্জগত আনন্দস্থল। যোদ্ধা ও বণিক কর্ম্মবন্ধু, গায়ক ও চিত্রকর অন্তর্বন্ধু। কর্ম্মের অনুরোধে কর্ম্ম-বন্ধুত্ব; অন্তরের অনুরোধে অন্তর্বন্ধুত্ব। কর্ম্মে সংঘর্ষ, আনন্দে সম্মিলন। এই অন্তর্বলেই মনুষ্যের প্রাণী-জগতে শ্রেষ্ঠত্ব। আনন্দ, অন্যান্য শাস্ত্রের গৌণ ফল হইতে পারে; কিন্তু, সুকুমার বিদ্যার মুখ্য ও গৌণ—উভয় ফলই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন তাহার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অন্য উদ্দেশ্যে উদ্ভবে না।

বল ও অর্থ পশুত্বে স্বতঃ উদ্রিক্ত, মদগর্ব্বে বিপ্রবোন্মুখ। সুকুমার-বিদ্যা আপন সৌকুমার্য্যে আপনি বেপথুবতী। আপন আনন্দে আপনি অন্তর্মনা। সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির ঝনঝনা কোথায়? ক্ষেপনী চাক্ষুষ বিষম উৎক্ষেপনে প্রক্ষেপনে নদীকে তরঙ্গায়িত করে, কিন্তু বহিত্র বহে না। যত্নলক্ষিত জলমগ্ন কর্ণই নীরবে বহিত্রকে গম্যস্থানে লইয়া যায়। কর্ণধার পশ্চাতে ও উচ্চাসনে। সুকুমার-বিদ্যা সভ্যতার সর্ব্ব পশ্চাতে। সর্ব্বপশ্চাতে শ্রেষ্ঠের স্থান।

অবশ্য অস্ত্র বা বস্ত্রের ন্যায় প্রতিভা আমাদের নিম্মাণীয় নহে। কিন্তু, স্বর্ণখনির ন্যায় প্রতিভার আবিষ্কারে ও সংস্কারে আমরা সক্ষম। ব্যয় অপব্যয় নহে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য, ১ম, পাত্রাপাত্র নিরূপণের উপায় কি? ২য়, সমাজের কিরূপ সাহায্য প্রশস্ত?

বর্ত্তমান সমাজ হট্টগোল মাত্র। বর্ত্তমান সমাজের মূল নীতি তাড়না। তাড়না, সভ্যতার আদিম নীতি। সংস্কার, সভ্যতার চরম নীতি। বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ডে চৌরের সংস্কার অসম্ভব। সুশিক্ষায় সম্ভব। সুশিক্ষাদানই সংস্কার-নীতি। সংস্কারের মূলে পালন। প্রসঙ্গতঃ তাড়না—পুত্রের হিতার্থে সুশিক্ষিত পিতার পুত্র প্রতি তাড়না, পালনেরই অঙ্গীভূত। সুকুমার-বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি, এই সুদূর পালন-নীতি-সাপেক্ষ।

সমাজ-তন্ত্র শ্রম-বিভাগ মাত্র। সজ্ঞান শ্রম—প্রকৃত শ্রম; অজ্ঞান শ্রম—বৃথা শ্রম। ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন প্রকৃত শ্রম; সমুদ্রে জলসিঞ্চন বৃথা শ্রম। মন্ত্রীর করধৃত লাঙ্গলে বা কৃষকের মন্ত্রীত্বে উন্নতি বিপর্য্যয়। যথাযথ কার্য্যে যথোপযুক্ত ব্যক্তিরই নিযুক্তি উন্নতির অনুকূল। লৌহকে লৌহকর্ম্মে ও স্বর্ণকে

অলঙ্কারে পরিণত করাই প্রশস্ত। সুতরাং, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত্যনুযায়ী সুশিক্ষা দানই প্রতিভা আবিষ্কারের উপায়। প্রবৃত্তির বিপর্য্যয় শিক্ষায় প্রতিভার অধোগতি, সমাজের অনুন্নতি।

বিধি-কৃপায় বা প্রকৃতি-নিয়মে আমাদিগের একোনশত শিশু সাধারণ বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পিতা মাতার শত স্নেহ-পক্ষপাত সত্ত্বেও তাহারা সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ কর্ম্মোপযুক্ত। ইহারা সমাজ-দেহ। অবশিষ্টটীর ভবিষ্যত জন্য অভিভাবক যে শিক্ষা-সূচনাই করুক, সে আপন পথ আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এইটী সমাজ-মজ্জা। এইটি প্রতিভা। কিন্তু, প্রতিভাও বিকার-রহিত নহে। প্রতিভা দুই প্রকার, এক, মনোকল্পিত প্রতিভা; অপর, প্রকৃত প্রতিভা। মনোকল্পিত প্রতিভা স্বভাবতঃ অস্থির ও লক্ষ-চ্যুত। প্রকৃত প্রতিভা সংহত ও ধ্রুবান্বেষী।

এই কেমিকেল ও খাঁটি স্বর্ণের প্রভেদ নিরূপণার্থে "শিক্ষানবিসাগার" স্থাপন আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। অবশ্য, তথাকার বিচক্ষণ নেতা বা নেতৃগণ কৃপালু পিতার ন্যায় প্রত্যেক শিক্ষা-নবীসের মতিগতি বুঝিয়া সযত্নে শিক্ষা দান করিবেন। ধান্য হইতে তুষ ত্যাগের ইহাই সুব্যবস্থা। নতুবা, কবি-প্রকৃতিকে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে বা বনিগ্-বুদ্ধিকে গীত-বাদ্য শিক্ষা দিয়া মন্ত্রণাগারে আসীন করিতে কেহ পরামর্শ দিতেছে না।

সুকুমার-বিদ্যাবিদ্‌গণকে শিক্ষানুসারে যৌবনে কর্ম্মদান, এবং বার্দ্ধক্যে বৃত্তিদান সমাজের অপর কর্ত্তব্য। ইহাই প্রশস্ত সাহায্য। সাধারণ মন স্থিতি-স্থাপক; বাত-কুক্কুটের ন্যায় স্বভাবতঃ অবস্থানুকূলে আপনাকে চালিত করিতে সক্ষম। প্রতিভা অসাধারণ; আঘাতে প্রতি-ঘাতোদ্যত। সুতরাং, সাধারণ-বিরোধী। এই জন্য প্রতিভাশালীর অর্দ্ধ-জীবন প্রায়শঃ আমরা উপবাসে দগ্ধ করি। কঠোর জীবিকা-যুদ্ধে প্রতিভা ক্রমশঃ রুক্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, জীবিকা-লক্ষ্যে ইতর-সাধারণের তুষ্টি-লাভাকাঙ্ক্ষায় সুকুমার-বিদ্যা ঐন্দ্রিয়কতা দূষিত হয়। পরিশেষে যখন তুমি তাহার প্রাপ্য অর্থ ও যশ-ডালি লইয়া তাহার সম্মুখীন হও, তখন তাহার শক্তি অপচিত, প্রতিভা নৈরাশ্য-দগ্ধ, হৃদয় সন্দিগ্ধ। আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপে তোমাকে সংবর্দ্ধনা করে।

এই বিশুদ্ধ পালন-নীতির অভাবে আধুনিক সুকুমার-বিদ্যা পরিভ্রষ্ট। অলসের আলস্যে, উচ্ছৃঙ্খলের মত্ততায়, খাম-খেয়ালীর খাম্-খেয়ালে, একরোখার রূঢ় অবাধ্যতায় বিকলাঙ্গ। এই পালন-নীতির সম্যক অভাবে প্রতি সমাজে অসংখ্য সুকুমার প্রতিভার—

"প'ড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত, ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৮)

দক্ষিণাপথে—বাসুদেবোদ্ধার।

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন ও ফাল্গুনের শেষে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখার পর চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে তাঁহার দক্ষিণ দেশপর্য্যটনের ইচ্ছা হইলে তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাবে সকলের হাতে ধরিয়া বলিলেন ;—"তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন তোমাদের নিকট আমি আর একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা অনুমতি কর, আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর নিকটে প্রতিশ্রুত আছি, বিশ্বরূপের উদ্দেশে যাইতে, সে সত্য অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাইব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে লইব না। সেতুবন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, তোমরা সে পর্য্যন্ত এই স্থানে রহিবে।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা দুঃখিত হইলেন এবং ম্লান মুখে নীরবে রহিলেন। নিত্যা-নন্দ বলিলেন "এ কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি একাকী যাইবে, ইহা কার প্রাণে সহ্য হয়? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার সকলই জানা আছে, আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি সঙ্গে যাইব। না হয়, আর দুই এক জন চলুক। বিপদসমাকুল পথে তোমার একাকী যাওয়া হইবে না। কি জানি কখন কি বিঘ্ন ঘটে?

শ্রীচৈতন্য মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন—"নিতাই! তুমি সূত্রধার আর আমি নর্ত্তক। তুমি যেমন নাচাও, আমি তেমনি নাচি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি কোথায় বৃন্দাবনে যাইতে ছিলাম, তুমি আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচল পথে আসিতে আসিতে আমার প্রিয় দণ্ডগাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। দেখিতেছি, তোমাদের গাঢ় প্রেমে আমার কার্য্য পণ্ড হইতেছে। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জগদানন্দ আমাকে বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চাহে। কি করি? সে যা বলে, আমি ভয়ে তাই করি। না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে সে তিন দিন কথা কয়না। আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শীত কালেও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মুকুন্দের দুঃখের সীমা নাই। সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার হৃদয়ের দুঃখে মুখ মলিন হয়। তাহার দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। দামোদর ব্রহ্মচারী, আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সদাই আমাকে শিক্ষা-দণ্ড দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দামোদরের লোকাপেক্ষা নাই। আমি লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না। সেজন্য সে আমার স্বতন্ত্র আচার দেখিলেই ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ, দিন কতক তোমরা নীলাচলে স্থির হইয়া থাক, আমি একেলা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

শ্রীচৈতন্যের নিন্দাচ্ছলে ভক্তদিগের স্তুতি ও বাৎসল্য পূর্ণ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া চারি জনই তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, ইহাতে আমাদের সুখ দুঃখ যাহা হয় হইবে। কিন্তু আমার আর একটী নিবেদন আছে। কর্ত্তব্য কি না, বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে না লইলেও কৌপীন, বহির্ব্বাস ও একটী জল পাত্র তো লইতে হইবে। তোমার দুই হাত নাম সংখ্যা গণনায় আবদ্ধ থাকিবে, এ সব সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে, বিশেষতঃ তুমি যখন প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তাইতে বলি, কৃষ্ণ দাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ কুমার তোমার জলপাত্র বস্ত্র বহিয়া পাছে পাছে যাউক। তোমার যাহা ইচ্ছা করিবে, এ কোন বিষয়ে কিছু বলিবে না।" শ্রীচৈতন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বন্ধুদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাহাকে নিজ সঙ্কল্প বলিলে তিনি অতি কাতর ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে গৌরচন্দ্র কিছু দিনের জন্য যাওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় সার্ব্বভৌম-গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে ও হরি কথা নৃত্য কীর্ত্তনে গত হইল। পরে যাত্রার নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি তীর্থ ভ্রমণ ও বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি।" সার্ব্বভৌম বিরহ শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং চারিখানি নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস ও কতক গুলি মহাপ্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা আলালনাথ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গৌরকে বলিলেন, "আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিও, গোদাবরী তীরে বিদ্যা নগরে উৎকল রাজ প্রতিনিধি রামানন্দ রায় আছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার সঙ্গের যোগ্য পাত্র। তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখা যায় না; পাণ্ডিত্যের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে তাহাতেই সামঞ্জসীভূত হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাব চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বৈষ্ণব জ্ঞানে পূর্ব্বে আমি তাহাকে কত পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবে। গৌরচন্দ্র এ কথা অঙ্গীকার করিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া আশীর্ব্বাদ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্র কূলের পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা-করিলেন। সার্ব্বভৌম স্বীয় পরিচর সঙ্গে সমুদ্র তীর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দাদি চারি জন ও গোপীনাথ আচার্য্য বস্ত্র ও প্রসাদ লইয়া আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ দেবমন্দির। শ্রীচৈতন্য স্বশিষ্যে মন্দিরের পুরোভাগে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে দেশবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখিয়া একপ্রাণে শুনিতে ও

দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা গাঢ়তর হইল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিল। নিত্যানন্দ ভক্তগণকে বলিলেন;—"এইরূপে গ্রামে গ্রামে নৃত্য কীর্ত্তন হইবে; তাহার পূর্ব্বাভাস আরম্ভ হইল।" মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল তথাচ ভিড় কমিল না, দেখিয়া নিতাই গৌরকে মধ্যাহ্ন স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন এবং স্নানান্তে সঙ্গী কয়জন সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলেন। ভোজনাদি সমাপন হইলে আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল, আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবারে জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে লোক সব হরিনাম গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সকলেই গৌরের জীবন্ত ধর্ম্ম ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস পাছে পাছে বস্ত্র জলপাত্র বহিয়া চলিলেন। ভক্তগণ গৌরের বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; গৌরচন্দ্র তথাচ একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না। ভক্তগণ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে দুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য মত্তসিংহের ন্যায় নিম্নলিখিত মতে নামোচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্!
রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্!

এবারকার ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম খুব প্রচার হইতে লাগিল; বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন বা উপদেশে নহে, কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম জীবনের প্রতিভায়। যাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তদীয় ভাব দেখিল ও তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিয়া সদালাপ করিতে সুযোগ পাইল, তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল লোক আবার স্ব স্ব গ্রামে যাইলে তাহাদের দেখিয়া অন্য লোক সাধু হইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অপরে, এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রামের দেখিয়া শ্যাম, শ্যামের দেখিয়া যদু ও যদুর দেখিয়া নবীন নবভক্তি বিধানের ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন ভ্রমণ বিহার করিতে চলিলেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া কূর্ম্ম বিগ্রহের বন্দনা প্রণাম করিলেন এবং নাম সংকীর্ত্তনের বন্যায় সমাগত লোকমণ্ডলীকে ভাসাইয়া কূর্ম্মনামক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কূর্ম্ম তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন। এবং পর দিন প্রাতে প্রাতঃস্নান করিয়া গৌর গমনোদ্যত হইলে বিনীতভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না, গৃহস্থাশ্রম পবিত্র সাধন ক্ষেত্র। গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর, বিষয়তরঙ্গে কখন পড়িবে না। ফিরিয়া আসিবার সময় আবার আমাকে এই খানে দেখিতে পাইবে।"

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে

শচীনন্দন অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহের গৃহস্বামীগণ তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই গৌর তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া ঘরে বসিয়া ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কূর্ম্মকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য শুভ যাত্রা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে বাসুদেব নামে এক গলিতকুষ্ঠী ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে কূর্ম্ম ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব পরম বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার অলৌকিক জীবে প্রেম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। ক্ষতস্থানে কীট সকল নিরন্তর তাঁহার অঙ্গের পুঁজ রক্ত পান করিতেছে, তাহাদিগকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক, কোন কীট দৈবে খসিয়া পড়িলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার সযতনে সেই স্থানে রাখিয়া দিতেন। বাসুদেব কূর্ম্মালয়ে আসিয়া যখন শুনিলেন যে গৌর চলিয়া গিয়াছেন, তখন সাধু দর্শন হইল না বলিয়া বিষাদে কাঁদিতে কাঁদিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কে জানে কি অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৌর সেই মুহূর্ত্তে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বাসুদেবকে সপ্রেম গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সুখী করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হইয়া সুন্দর সুস্থ দেহ লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কৃপা দেখিয়া তাঁহার মন প্রাণ গলিয়া গেল, তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কত স্তব করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ভাগবতের রুক্মিনী প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণের উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, কোথায় পাপী, দরিদ্র কৃপা পাত্র আমি, আর কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি। আমার গলিত দেহে তুমি যে আলিঙ্গন করিলে, ইহা জীবে সম্ভবে না। আমার গায়ের দুর্গন্ধে, অতি জঘন্যহীন লোকও পলাইয়া যায়; তাহা তুমি কেমন করে স্পর্শ করিলে? কিন্তু প্রভো! আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভাল ছিলাম। এখন আমার দেহ-গর্ব্বে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। গৌর বলিলেন, 'সাধু দেহে অহঙ্কার আসিবে কেন? তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার কর। তোমা হইতে এদেশে জীব নিস্তার হইবে।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য তদীয় ভক্ত সমাজে "বাসুদেবামৃতপদ" নাম পাইয়াছিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

কূট প্রশ্নের নীরস সত্য।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদিগের নিদয় বিচারে, রসহীন তীব্র সমালোচনায়, ভাবুক, প্রেমিক, ভক্ত, বিশ্বাসী দিগের বড় রসভঙ্গ এবং মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। কুটিল বুদ্ধি-প্রসূত কূট প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া তাহারা শেষ রাগ করে, কটু কথা বলে, এবং কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাব স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। বিচার প্রিয় চতুরবুদ্ধি সংশয়বাদীরা বাস্তবিক বড় নিষ্ঠুর জীব। তাহারা লোকের পুরুষ পরম্পরাগত জীবনাবলম্ব বিশ্বাসের উপর বিচারের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আঘাত করে। চিরপোষিত প্রাচীন রমণীয় বিশ্বাস সংস্কারের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, যেখানে কোন কালে অবিশ্বাস অভক্তি প্রবেশ করে নাই, সেখানেও তাহারা সন্দেহের বিষ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। বিচার বলে, যুক্তি তর্কে কোন শ্রান্ত ক্লান্ত ধর্ম্ম-পিপাসু তত্ত্বানুসন্ধায়ীর মনে শান্তি কিম্বা আশার সঞ্চার করিতে পারে না, কিন্তু অনেকের পুরাতন পৈতৃক কুলগত বিশ্বাসের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে পারে। আহা, তাহাদের তর্ক-তরঙ্গে পড়িয়া কত শত নর নারী নিরাশ্রয় নিঃসম্বলে কালাতিপাত করিতেছে। এক অর্থে, এই কূটপ্রশ্নকারী বৌদ্ধদিগকে কালাপাহাড়ের মত মনে হয়। ইহারা গুরু পুরোহিত-ব্যবসায়ী ভ্রান্তমত-প্রতিপোষক ব্যক্তিদিগের অন্নের হন্তারক, নির্দ্দোষ, নির্ব্বাক্, অচল জড়স্বভাব দেব দেবী-গণের মূল উচ্ছেদক, এবং পুরাণ কাব্য চিত্রিত সুন্দর সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি, অলৌকিক দেব চরিত্রের বিনাশক। ইহারা প্রেম ভক্তি ভাবরস পিপাসু নরনারীর শুষ্ক কণ্ঠে অনি-শ্চিত জ্ঞানের সন্দেহ মিশ্রিত অম্লরস এবং আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রস্তরবৎ নীরস সত্য ঢালিয়া দিতে চায়। কোন নববিধ সত্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু পুরাতন সংস্কার এবং বিশ্বাস ভক্তির মূল উৎপাটন করিতে বিলক্ষণ পটু। ভগবান্ যেন ভাবোদ্যানের রোপিত বৃক্ষ সকলকে সবলে নড়াইবার জন্যই ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা বিশ্বা-সীর পরীক্ষক।

এক জন নাট্যশালায় রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের দৃশ্য কাব্য দর্শন পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির নিকট মনের সরল ভাব ব্যক্ত করিতেছে, মাঝখান হইতে অনিমন্ত্রিত অনা-হূত এক জন সংশয়বাদী বলিয়া উঠিলেন, "রাধা ত কবিকল্পনা। ইতিহাসে ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও পাওয়া যায় না!" "কি উপসর্গ। তুমি কে হে বাপু? এত দিনের রাধা ঠাকুরাণীকে তুমি কিনা দুই একখান মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া একবারে ঠাকুর ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে চাও? যাহার বসতবাটীর দলীল নাই, সে যদি বিশ বৎসর নির্ব্বিবাদে সে স্থান দখল করিয়া আসিতেছে, এমন প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে সেখান হইতে তাড়ায়?

আর এই রাধারাণী, যিনি শত শত বৎসর ধরিয়া রাসমঞ্চে, দোলমঞ্চে, রথে ক্রমাগত শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্রের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এক দিনের জন্যও বাপেরবাড়ী কি কুটুম্ব ভবনে যান নাই, তাঁহাকে কি না তুমি উড়াইয়া দিতে চাও? কি ভয়ানক সাহসের কথা। স্ত্রীলোক অবলা বলিয়া কি এই অত্যাচার? রাধিকার অস্তিত্ব যদি লোপ হয়, তবে আর কৃষ্ণের রহিল কি? কোন একটা ঘৃণার ভাব মনে আসিলে এখনো পর্য্যন্ত আমরা "উ হুঁ হুঁ! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!" বলিয়া আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করি। সেই রাধা একবারে নাই, এ কথা তোমরা মুখে আন কি প্রকারে? বরং কৃষ্ণ বিহনে বৃন্দাবন-বাসীদের এক আধ দিন চলে, রাধা প্রেমময়ী বিনা মুহূর্ত্ত কালও চলিতে পারে না। রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, মান-ভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, এ সকল তবে কোথা হইতে আসিল?" সংশয়বাদী এক কথা বলিয়া একবারে যেন বৃন্দাবনে আগুন লাগাইয়া দিলেন। এত কালের পরব পার্ব্বণ, যাত্রা নাটক, কথকতা তবে উঠিয়া যাউক! তোমার ইতিহাসে রাধিকার নাম থাক, আর নাই থাক, রাধিকা আমাদের চাই। স্ত্রীলোক, বালক, সাধারণ জনসমাজ, কি কাঠ চিবাইয়া বা পাথর গিলিয়া থাকিবে? হাজার বৎসর যাঁহাকে লোকে কৃষ্ণের পার্শ্বে দেখিয়া আসিতেছে, তাঁহার অস্তিত্ব এখন লোপ হইতে পারে না।

সংশয়বাদী অবিশ্বাসীর এই এক কথায় যদি ভারত-সমাজ খড়্গাহস্ত হয়, তবে আর দুই একটা কূট প্রশ্ন তুলিলে না জানি কি না ঘটিতে পারে। স্বয়ং কৃষ্ণের সম্বন্ধেও তাহাদের মধ্যে কারো কারো এইরূপ সন্দেহ আছে। তিনিও কতদূর ঐতিহাসিক, তদ্বিষয়ও ভয়ানক সংশয়স্থল। তাঁহার সংক্রান্ত প্রচলিত লীলা খেলা অধিকাংশই কল্পনা এবং ভুল, ইহা বলিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে। মূলে যে শাস্ত্র মানে না, অতর্কিত বিশ্বাস ভক্তি ভাবুকতা যাহার নাই, সে ত বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস ব্যতীত প্রতি পদে পদেই সন্দেহ করিবেই। প্রত্যক্ষ দর্শনকেও কত সময় তাহারা দৃষ্টিভ্রান্তি বলে। শাস্ত্র বচন, গুরুবাক্য একবার অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করুক, আর কোন সন্দেহ জন্মিবেনা। কিন্তু কুটিল-বুদ্ধি সংশয়বাদীর সে বিশ্বাস কৈ? তুমি ভাবুক বৈরাগী কিম্বা বিশ্বাসী হিন্দু, ধ্রুব প্রহ্লাদ দুইটী ভক্ত শিশুর মধুর প্রার্থনা স্তোত্র শুনিয়া, তাহাদের বাল্য সৌন্দর্য্য সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, কাঁদিলে, প্রেমভক্তিতে মাতিলে, সংশয়বাদী বলিল, "ও সব কবির কল্পনা। পাঁচ বৎসরের বালক কি কখন এরূপ ভক্ত হইতে পারে?" তুমি রাম সীতার পূজা করিয়া রামায়ণ পড়িয়া ভাবে প্রেমে গদ্গদ হইয়াছ, সংশয়বাদী বলিল, "একটু মদ্য পান করিলেও ওরূপ আনন্দ হইতে পারে। সকলি কল্পনার খেলা। আর কিছু দিন পরে দেখিবে, বঙ্কিম বাবুর কল্পিত কাব্যচরিত্র সকল দেব দেবীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভাবান্ধ জন সাধারণের উপর কবিদিগের কল্পনার কি সামান্য প্রভাব? ব্যাস বাল্মীকির ক্ষমতা কি কম? মিথ্যা কল্পনাকে তাঁহারা হিন্দু জাতির রক্তের মধ্যে এমনি বেগে চালাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তাহা এখনো কত যুগান্তর চলিবে, কে বলিতে পারে। ইহা দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হইতেছে এবং হইবে, কিন্তু ভিতরে সব মিথ্যা। মিথ্যার

উপর পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম-গৃহ স্থাপিত।”

পৌত্তলিক হিন্দু ভক্তদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বসংশয়াত্মাদিগের এই কথা, কেবল তাহা নহে, নিরাকারবাদী জ্ঞানী ভক্তদিগের সম্বন্ধেও তাহারা এই রূপ বলে। বিধাতা অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন, বিপদে উদ্ধার করিলেন, বিশেষ কৃপা পাঠাইলেন, আদেশ প্রচার করিলেন, প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, উপায় বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি কথাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া তাহারা উপহাস করে এবং বিশ্বাসী ভক্ত মাত্রকেই তাহারা নির্ব্বোধ কুসংস্কারান্ধ বলে।

কিন্তু ইহারা যাহাই বলুক, আর যাহাই করুক, দেশ কালের অতীত সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ সত্য তাহাতে খণ্ডিত হইবে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের রাজ্যে যে সকল ভক্তি ভাবুকতার লীলা প্রকটিত হয়, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেও পারিবে না। কারণ, তাহাতে অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছুই নাই, সকলই সত্য ঘটনামূলক, বিজ্ঞান সম্মত। সে যাহা হউক, এই শ্রেণীর লোক দ্বারা কিন্তু ভ্রান্তি, কল্পনা, কুসংস্কার বহু পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ইহারা যাহা বলে, তাহা অতি নীরস, কিন্তু তাহাতে অভাব পক্ষের সত্য আছে? তদ্দ্বারা খাটি সত্য দর্শন সম্বন্ধে ইহারা অনেক সহায়তা করে। নির্ম্মল সত্যজ্ঞান বড় আনন্দজনক। মিথ্যা কল্পিত সংস্কারে যখন এত আনন্দ হয়, তখন সার সত্যের আনন্দ যে আরো অধিক হইবে, তাহা ত স্বাভাবিক। অতএব অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা বিচারপ্রিয় কুটিলবুদ্ধি যে সকল কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহাতে কেহ ভীত হইও না। অবিশ্বাসীর ভয়ে সত্য জিনিষ ঢাকিয়া বা লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ভ্রান্তি কুসংস্কারে তাহার গৌরব বা[illegible] না, অবিশ্বাস সন্দেহে তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য কমে না। সংশয়বাদীর নীরস সত্য জ্ঞানী বিশ্বাসীর নিকট সরস সত্যে পরিণত হয়। অকপটে নির্ভয়ে সত্য অনুসন্ধান কর। জ্ঞানময়ের প্রতি চাহিয়া থাক, তাঁহার প্রেরিত দিব্য জ্ঞানালোকে প্রকৃত সত্য, নিগূঢ়তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। বহুকালের পোষিত বিশ্বাসে আঘাত লাগিবে, কি আমার সুখের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে, আমি অবিচারে যাহা সত্য বলিয়া এতকাল মানিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমার হৃদয় শুকাইয়া যাইবে, এরূপ ভয়ে কি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকিব? তবে আর জ্ঞান বিজ্ঞান, ন্যায় দর্শন, আলোচনা করিয়া কি ফল হইল? সত্যই সারজ্ঞান, সত্যই ভক্তিপ্রেম, সত্যই স্বর্গ এবং সত্যই স্বয়ং ভগবান। কূটপ্রশ্নে বা কুটিল তর্কে ইহার কিছুই করিতে পারে না, বরং তাহা দ্বারা সত্যরত্ন আরো সমুজ্জ্বলিত হয়। অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্ধ ভক্তিতে মত্ত হইয়া থাকা যেমন অনিষ্টজনক, জ্ঞানবিচারে শুষ্ক কুতর্কে অবিশ্বাস সংশয় দ্বারা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ স্বভাব-সম্ভূত সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ সত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন তেমনি ভয়ানক। প্রকৃত সত্যপ্রিয় জ্ঞানী ইহার মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সরস সুন্দর সারভূত সত্যের উপাসক হইবেন, সত্যের প্রত্যক্ষ প্রেমলীলা বিজ্ঞান-নয়নে দেখিবেন। বিশ্ববৃন্দাবনে, প্রতি নরনারীর জীবনে সেই দেবতার নিত্যলীলা হইতেছে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

উৎকল-ভ্রমণ।

পুরীর শ্রীমন্দির।

সন্ধ্যার সময়, বিজয় বাবু, পুরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সম্ভ্রান্ত উকীল। ইঁহার বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-ভুক্ত—একের সুখ দুঃখে যেন অপরের সুখ দুঃখ। পোষ্ট-মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাক্তার বাবু সাতকড়ি মিত্র, প্রধান শিক্ষক বাবু শশধর রায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইঁহারা সকলেই সদাশয়, মিষ্টভাষী, সহৃদয়, এবং সচ্চরিত্র। যেমন কটক, তেমনি পুরী। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের নিকট সম্মান পাইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম।

সেই রাত্রেই সেই প্রলুব্ধ অসহায়া রমণী-দিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলিলাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন। পাণ্ডারা বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের জাতি ধর্ম্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাণ্ডাদের দুর্বৃত্ততার দুই একটী উদাহরণ ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সহৃদয়তার এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই যেন একাত্মক। বিজয় বাবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস। দেখি-লাম, ভাবিলাম এবং আশ্চর্য্য হইলাম। পরদিন প্রাতে রমণীদিগের অনুসন্ধানে বাহির হওয়া যাইবে, ধার্য্য হইল। বাত্রেই সংবাদাদি লইবেন, কোন কোন বন্ধু ভার লইলেন।

পুরীর সাগর—সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রস্র-বণ, পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। পুরীর শ্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পরিপূরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সাগর। অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনন্ত সাগরবৎ অনুপম কীর্ত্তি। শ্রীমন্দিরের সীমা আছে বটে, কিন্তু ভাব রাজ্যে, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহা অসীম। সীমায় অসীম, সান্তে অনন্ত—পুরীর মন্দিরে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পুরীর জগন্নাথদেব, কথিত আছে, ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হন। অনেক দর্শন এবং অদর্শনের পর যযাতি কেশরীর দ্বারা ৪০৯ শকাব্দে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্থাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেব ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া বর্ত্তমান পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির নির্ম্মাণে ১৪ বৎসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি আরো ৬০টী মন্দির নির্ম্মাণ করি-য়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীদারুব্রহ্ম নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পৌরা-ণিক মত, উৎকল দেশীয় মত, বৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দাঁতবংশের মত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

'জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তূপের সহিত ইহার বিশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুসুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করত। উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া দুই যুগল রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্ব্বত্রই হরের সহিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংযোজিত করিয়া পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কুত্রাপি একরূপ ভ্রাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' (শ্রীদারুব্রহ্ম, ৫৪ পৃষ্ঠা)

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ রূপ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপূর্ব্ব শ্রীদারুব্রহ্ম গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের গঠন ও আকৃতি এবং পুরীর অন্যান্য সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। শঙ্কর মঠ নামে পুরীতে একটী মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধীগণের অগ্রণী। কিন্তু যাহাই হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও ভক্ত এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন। জাতিভেদ প্রথা জগন্নাথক্ষেত্রে নাই—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রসাদ উপভোগ করিলেও জাতি যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহ্ন। বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় চিহ্ন, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপদেশ যাহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন—জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণতি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন।—

"ক্ষমাই এ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।"

"স্বভাবই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।"

"ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর।"

"কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিওনা।"

"অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ।"

'দীন দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।"

"নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।"

"মনুষ্য পশু ইত্যাদির জন্য পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর।"

"যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও জীব হত্যা করিও না।"

"পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।"

"পরদার করিও না।"

"মিথ্যা কথা বলিও না।"

"মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।"

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, অহিংসা-প্রধান। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ;—ক্রোশ-ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শাক্ত ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য সাম-

পুর (যজ্ঞপুর) হইতে পার্ব্বতী মূর্ত্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া থাকে। বস্তুত পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব যে অহিংসা-পরায়ণ দেবমূর্ত্তি বলিয়া পরিকল্পিত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বে এখানে ভোগের প্রথা ছিল না। এ কথা কত দূর প্রামাণিক, বলিতে পারি না। আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু জটিল সন্দেহে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল।

"স্থাপত্য-কার্য্যে পুরীর মন্দির জগতে অদ্বিতীয়," বঙ্গবাসী এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন।* আমরা এ কথা স্বীকার করি না। পারিস নগরের এফেল টাউয়ার প্রভৃতির কথা এখানে তুলিতে ইচ্ছা করি না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সহিত কারুকার্য্যে পুরীর শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলনা হইতে পারে না। যাহারা উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্য্যহীন বলিলেও অধিক বলা হয় না। এই শ্রীমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ;—কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ। কলিকাতার মনুমেণ্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় একমাইল দূরে, প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির দুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্ব্বে কেবল এক স্তর মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্ম্মাণের তিন শত বৎসর পরে পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০।২৫ ফুট উচ্চ হইবে। এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা দেখা যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যায; কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না।

বহিঃপ্রাচীরে ৪টী ফটক আছে। পূর্ব্ব দিকের ফটকটী বড়ই জাঁকাল। এইটীই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ গঠিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। চারিটী ফটকের চারি নাম। পূর্ব্ব "সিংহদ্বার," উত্তর "হস্তীদ্বার," দক্ষিণ "অশ্বদ্বার," পশ্চিম "খঞ্জদ্বার।" "সিংহদ্বারে সিংহমূর্ত্তি, "হস্তিদ্বারে" হস্তিমূর্ত্তি ও অশ্বদ্বারে "অশ্বমূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মূর্ত্তি নাই।

পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখেই "অরুণস্তম্ভ।" এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভটী কণারকের উজ্জ্বল চিহ্ন, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অরুণ-স্তম্ভের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্য্যে ভূষিত, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

যাহারা শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির স্বচক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন,—তাঁহারাই বলিতে পারেন,—মন্দিরের কি অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল। কেমন যে সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলা-বন্দোবস্তে পাকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত; তাহা যে না দেখিয়াছে, সে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে।

অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন-শালা, নৃত্য-শালা প্রভৃতি

* ১২৯৭ সালের ৭ই বৈশাখের বঙ্গবাসী দেখ।

লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির-ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ—এত উচ্চে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল কি রূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সবিস্ময়ে একথা জিজ্ঞাসা করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক একবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক দূর নির্ম্মিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে বালুকা রাশির উপরে আবার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিত। এইরূপ করায় সময়ে সময়ে মন্দির অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং পরবর্ত্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবিষ্কৃত হইত। এ সকল কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না। নির্ম্মাণ-কৌশল এত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা সাধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পারে না। অরুণস্তম্ভের ন্যায় কণারকের আরো অনেক কারুকার্য্য পূর্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কারুকার্য্যে কণারকের সূর্য্যমন্দির অদ্বিতীয়। অল্প মাত্র তাহার নমুনা যাহা ভোগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর-খোদিত এক একটী মূর্ত্তি ৩৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে যেরূপ, পার্ব্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, পুরীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ তিন ধারের গাত্রে, সেইরূপ নৃসিংহ, বামন ও কল্কি অবতারের তিন বিরাট মূর্ত্তি সংলগ্ন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি যাযপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় কি না, সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন পুরীর শ্রীমন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য অশ্লীল ছবি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা কন্যা, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া—সে সকল কদর্য্য ছবি দেখা যায় না। মানুষের চিন্তায়ও তাহা স্থান পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির-গাত্রে দেদীপ্যমান*। এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পারিলাম না, কেহ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। জগন্নাথদেবের রথবিহারের জন্য আর একটী মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অনুরূপে, দূরে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন করিয়া আমাদের ছোট লাট বেলী সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এরূপ কদর্য্য ছবি সকল কেন অঙ্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ বলিলেন, এবং আমাদেরও বোধ হয়, এ সকল ছবি অনেক পরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তখনকার রুচি ইহাতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাদের মন বিচলিত হয় না, তাহারাই প্রকৃত জগন্নাথ দর্শনের অধিকারী। সেরূপ অধিকারী কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদর্য্য ছবির ব্যাখ্যা করিয়াছি বলিয়া সহযোগী বঙ্গবাসী আমাদিগকে প্রকারান্তরে গালি দিয়াছেন। আমরা "মূর্খ"—সুতরাং পাণ্ডিত্যাভিমানী" বঙ্গবাসীর সহিত তর্ক বিতর্ক করা আমাদের পক্ষে সাজে না।

না, সেখানে অতি অল্প লোক। তবে অবশ্য, "বঙ্গবাসীর" কথা আমরা বলিতে পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর মন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাদুকা রাখিয়া মন্দির-প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বহু লোক ভোগ বিক্রয় করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক ঘৃত দীপ সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। আমরা নাটমন্দির হইয়া জগমোহনে (Hall of audience) যাইলাম। মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগ-মন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, কার সাধ্য। সময়ে সময়ে সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায়। দোল ও রথ যাত্রার সময় জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সাহায্যে শান্তির রক্ষা করেন। আমরা অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম—প্রস্তর-নির্ম্মিত-সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্দির অন্ধকার-ময়, দিবসেও বাতি জ্বালিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নির্ম্মিত। উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের একটী মাত্র দ্বার—তাহার সম্মুখে জগমোহন, তার পর নাট্য-মন্দির, তার পর ভোগমন্দির ইত্যাদি। সূর্য্যালোকের সাধ্য কি, সে সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে। অহোরহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্ত্তি দেখিলাম। পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ। এ এক অলৌকিক ব্যাপার, ৬০০০ লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথের প্রসাদে বিশ সহস্র লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্রীক্ষেত্রে ২৪টী উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রাতেই অধিকতর যাত্রী উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মহাত্মা "পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রকে আমরা সেইরূপ ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায় নাই। পুরীর রথযাত্রা, এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়। রথ খানি ৪৫ ফিট উচ্চ হয়। ৪২০০ বেতনভোগী লোকের সাহায্যে রথ গমন করেন। সুতরাং কত কাষ্ঠের সাহায্যে যে তাহা নির্ম্মিত, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুনিলাম, রথ-নির্ম্মাণের কাষ্ঠের জন্য অনেক অরণ্য রক্ষিত রহিয়াছে।

পুরীতে যে ৫টি মহা তীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, সমুদ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ। এতদ্ভিন্ন পুরীর প্রধান ধর্ম্মালয়—লোকনাথ, চৈতন্যের মঠ, স্বর্গদুয়ার, শঙ্কর মঠ, তোটাগোপীনাথ। এ সকল সম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব।

একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখা যায়। জগন্নাথের সেবার জন্য এক দল বেশ্যা রক্ষিতা আছে। বাঙ্গালায় যেমন পুরোহিত শ্রেণী, পুরীতে জগন্নাথের বেশ্যা-শ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিস। রথ যাত্রার সময় মন্দিরের সম্মুখে ইহারা পাল্টা বাদ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে বেশ্যার এরূপ অধিকার আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কেমন করিয়া এই প্রথার আবির্ভাব

হইয়াছে অনুমান করা কঠিন। বোধ হয়, ইন্দ্র সভার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেশ্যাশ্রেণী সমাজে বিশেষরূপ আদৃতা হই য়াছে, ইহাদের দ্বারা বহু লোকের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে। পুরীর প্রধান পাণ্ডাগণের দূষিত চরিত্রের কারণ যে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব? পুরী—শ্রীক্ষেত্র, কিন্তু হিসাবান্তরে পুরী অধর্ম্মের লীলাস্থল। পুরী-তীর্থ হইতে চরিত্র ও কুলধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা নারী হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা। শুনিয়াছি, পুরী ব্যভিচার-দোষে প্লাবিত। তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্য্য কথা শুনিলে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এখন অধর্ম্মের লীলাস্থল হইয়া ভারতের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে আমরা ৭।৮টী বন্ধু মিলিয়া সেই রমণীগণের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাঁহারা পলায়ন করিয়া আসি য়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা চলিবে না। পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহাদের উপর সংবাদ লওয়ার ভার ছিল, তাঁহারা সংবাদ দিলেন যে, ওমুক স্থানে তাঁহারা আছেন। যাত্রী-দিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্ গৃহে কোথা হইতে কে আসিয়া রহিয়াছে, পরি-দর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। ভোগ পরিদর্শনের জন্য, যাত্রী নিবাস পরি-দর্শনের জন্য, উৎসবের সময় মন্দির রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, পালাক্রমে, পুলিসের সাহায্যে মন্দিরের শান্তি রক্ষা করেন। এ সকল বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘুস নামক যে একটা পদার্থ আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, যাত্রী-নিবাসে ১০ জনের স্থানে ২০ জন স্থান পায়, ইত্যাদি। আমরা নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করি-লাম। লোকেরা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী [illegible] য তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অ[illegible] ক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও সাক্ষাৎ হই[illegible] না। ইত্যবসরে আমরা কালীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম। আসিয়াও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার উপর চড়িল—রাস্তার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহারা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। অগত্যা ভগ্নমনে প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আর আর কথা পরে বক্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। (৪)

বঙ্কিম বাবু, ভক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করি-বার সময়ে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসংকীর্ত্তন সন্ধ্যা বন্দনাদি সম্বন্ধে এক স্থানে উল্লেখ করি-য়াছেন—"তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা, তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম,

সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বর চিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। আর "আমার পাপ স্খলিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যা বন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। বঙ্কিম বাবুর এই বিস্তৃত ও বিশদ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার মধ্যে প্রার্থনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, এই স্থলে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধর্ম্মজগতের একটা দুর্জ্জয় শক্তি বিশেষ। ক্ষুদ্র সসীম ব্যক্তি, অনন্যগতি হইয়া, যখন অসীম অনন্ত শক্তির নিকট কাতরে কৃপা প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে কেহই উড়াইয়া দিতে পারেন না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি—সরল প্রার্থনাই ধর্ম্ম জীবনের—ভক্ত জীবনের এক মাত্র বস্তু, যাহার বলে মানুষ জগতে অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ। ইহাকেই জগতের লোকেরা Miracle বলিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুও প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি বলেন, "অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়।" এই যে ঈশ্বর কৃপা লাভ, ইহা ঐকান্তিকী প্রার্থনার অবশ্যম্ভাবী ফল। সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা, ধর্ম্মের উচ্চসোপানে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—অথবা "Thy will be done," ইহার মধ্যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বৃত্তি অনুশীলিত হইয়া যখন সিদ্ধির অবস্থায় মানুষ উপস্থিত—যখন তিনি ও ভক্ত একত্রে, তখনও এরূপ প্রার্থনা স্বাভাবিক। কেননা, তিনি যে প্রভু, আমি যে দাস, তিনি যে মহান্, আমি যে ক্ষুদ্র! ভিক্ষা না করিলে আমার দিন যাইবে কেন?—না চাহিলেও তিনি দিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার চাহিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লোপ হইবে কেন? আমি চাহিব, ইহা আমার প্রাণের বিশেষ ভাব; তিনি দেন, ভালই; না দিলেও চাহিব। কেননা, না চাহিয়া ত পারি না। আমার অভাব যে অনন্ত—তাহা পূরণের আর ত কোন উপায় দেখি না। আমার একমাত্র উপায় যে তিনি! করযোড়ে, প্রাণ মনের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিতেন—"দ্বারে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে,—চাও, পাইবে।" প্রার্থনাকে গৌণ ভক্তি বলায় বঙ্কিম বাবুর আধ্যাত্মিকতার কিছু স্থূলদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্ম জগতে এমন ভক্তের কথা আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই, যিনি প্রার্থনা-পরায়ণ ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বঙ্কিম বাবু প্রহ্লাদ চরিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রহ্লাদের কামনা নিষ্কাম ছিল। আমরাও প্রতিপন্ন করিতে পারি—মানুষের "প্রার্থনা"ও নিষ্কাম হইতে পারে। কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্য যখন কাতরা প্রার্থনা, করে, অর্থাৎ যখন মানুষের অন্য কামনা রহিত হয়, তিনিই লক্ষ্য হন, তখনই প্রার্থনা নিষ্কাম। আমি যা চাই, সে সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর হইতে পারেন। সুতরাং মানুষের সকল প্রার্থনাকেই নিষ্কাম বলিব, তাহাতে আর বাধা কি? সকল কামনা যখন তাঁহাতে সংন্যস্ত, তখনই ত প্রকৃত ভক্তির উদয়। আমরা অতি ক্ষুব্ধচিত্তে

বলিতে বাধ্য হইতেছি—বঙ্কিম বাবু প্রার্থনা রূপ ধর্ম্মের সবল, মধুর রাজ্যে এখনও বুঝিবা পৌছিতে পারেন নাই। তবে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, ব্রাহ্মসমাজে যে মুখস্থ মন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনা "অন্ধকার হইতে আলোতে ইত্যাদি" করা হয়, তাহা সারধর্ম্ম বা ভক্তির অনুমোদিত না হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে এ প্রদেশে এক দল ভুঁইফোড় হিন্দুধর্ম্মবিৎ দিগ্‌গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা উপন্যাসকে উপন্যাস বলিতে, কাব্যকে কাব্য বলিতে কুণ্ঠিত। মহাভারত, রামায়ণে যে ইতিহাসের ছায়া অতি অল্প, এ কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, সম্প্রতি এই কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করায়, অদ্বিতীয় দেশহিতৈষী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রমেশচন্দ্র ছেলে মহলে অনাদৃত হইয়াছেন,—অর্থাৎ টেক্সট বুক-কমিটীর ধুরন্ধরগণের যোগে, বঙ্গবাসী প্রমথ হিন্দুর দল, আপন আপন ইতিহাস কাটতির হ্রাস হেতু, একটা বিরাট আন্দোলন তুলিয়া রমেশ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাস খান স্কুল হইতে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়া দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাসশূন্য এই হতভাগা দেশে কেবল দুই খানি ইতিহাসের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল—৺রাজকৃষ্ণের বাঙ্গলার ইতিহাস ও রমেশচন্দ্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী। এ দেশে তাহা আদৃত হইবে কেন? খোসামুদী, ঘুষ, ও ভালবাসার মায়ার কুহকে যে দেশের পুস্তক নির্ব্বাচক-সম্প্রদায় বশীভূত, সে দেশে এরূপ হইবে, বিচিত্র কি! বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী পুরুষ—জ্ঞানী, প্রতিভাশালী। প্রতিভার নিত্য সহায় সাহস। কাপুরুষ প্রতিভাশালী লোক, কাঁঠালের আমসত্ত্ববৎ। সাহসী পুরুষ ভিন্ন কেহই জগতের কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে সাহসী প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি বলিয়াছেন, শুন:—

'শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে।" ধর্ম্মতত্ত্ব—১৮৬ পৃষ্ঠা।

"ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।" ২০৫ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের কথা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেই রূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।" ২১০ পৃষ্ঠা।

"প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়।" ২১১ পৃষ্ঠা।

'তারপর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না।" ২১২ পৃষ্ঠা।

শাস্ত্রের মর্ম্ম, ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বর্ত্তমান সময়ের লোক সকল সর্ব্বকর্ম্মী, সর্ব্বধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর এই উপদেশে তাঁহাদের আস্ফালনটা একটু কমিলে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইব। দেখ, বিশুদ্ধ ভাষায়, তেজের সহিত, তারপর উদার ধর্ম্ম-পিপাসু বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিতেছেন।—

"খ্রীষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও

আনন্দময় চৈতন্তকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুয়ানি যায়।' ২২৩ ও ২২ পৃষ্ঠা।

আমরা গত বার ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু ভক্তির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এরূপ আর শুনি নাই। কেহ কেহ এ কথাতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা জানি। তাঁহাদিগকে অধিক আর কি বলিব, তাঁহাদিগকে একবার অনুরোধ করি, এই গ্রন্থ খানি একবার পড়িয়া দেখুন। এমন উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর বঙ্কিম বাবু ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তাহা অতি আশ্চর্য্য,—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই, অবস্থাই ভক্তি।" এই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতেই গ্রন্থ খানির আরম্ভ, ইহাতেই শেষ। এ স্থলে এ কথা না বলিলেও ত্রুটী থাকিয়া যায় যে, বিষ্ণুপুরাণ হইতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ভক্তির যে তারতম্য তিনি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা অতি উদার ও অতি সুন্দর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাঁহার কথাটী কেবল তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

"যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে, ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন নাই, বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই।' ২০১ পৃষ্ঠা।

ভক্তের লক্ষণ কি কি? এ সম্বন্ধে পৃথিবীতে অনেক মত ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর মতগুলি সংক্ষেপে এখানে তুলিয়া দেখাইব, ব্যাখ্যা কত দূর সমীচীন হইয়াছে।

"ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্ত সুখ যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, তাহার আবার অবরোধ কে থায়। ভক্তি শাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য। ৪৩ পৃষ্ঠা।

'স্থূল কথা এই, যে যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক। ১৮৫ পৃষ্ঠা।

'তিনি (ঈশ্বর) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে, ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।" ১৯৭ পৃষ্ঠা।

"যে মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ়-সঙ্কল্প, যে হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, যিনি দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষার অতীত, যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গবিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।' গীতা ১২।১৩—২০।

"ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক করিয়া হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না, যে আত্ম-

জয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুকারী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্ত বৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।' ২০০ পৃষ্ঠা।

তৎপরে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে গীতার উপদেশ ব্যাখ্যাত করিয়া তিনি বলিতেছেন—"প্রথম সাধন, চিত্ত ভগবানে স্থির রাখা। (২) স্থির রাখিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম করিয়া মন স্থির করিবে। (৩) তাহাতে অসমর্থ হইলে ভগবানাশ্রিত হইয়া কর্ম্ম করিবে। (৪) তাহাতে অশক্ত হইলে যতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ইহা যাহারা না পারিবে, তাহারা উপাসনাদি করিবে। "তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?" শিষ্যের এ কথার উত্তরে গুরু বলিতেছেন—"ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেই খানে তিনি পাইবেন।"

প্রতিমাদির পূজা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অধিকার ভেদে নিষিদ্ধ এবং বিহিত। ভাগবত পুরাণ হইতে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।" ৩স্ক। ২৯অ। ১৭।১৮।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

'যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে। ২৯অ।২০।—২৩৪পৃষ্ঠা।

তার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন—

'যাহার সর্ব্ব ভূতে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদির পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে।' ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠা।

'ঈশ্বর জগন্ময, জগতের কাজই তাঁর কাজ। অতএব, যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত 'মৎকর্ম্ম," তাহার সাধনে তৎপর হও এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে।" * * * যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকার সাধনের অভাবই ভাল।" ২৩৬ ও ২৩৭ পৃষ্ঠা।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিম বাবু যখন প্রতিমা পূজাকে গৌণ ভক্তির সাধনের উপায় মধ্যে ধরিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিমা পূজাকে একেবারে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কই? এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না। কেবল এই বলি—প্রতিমা পূজার অর্থ কল্পনার পূজা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই মহান্ ও উন্নত হউক না কেন, এই কল্পনার হস্ত হইতে যে একেবারে নির্ম্মুক্ত, তাহা আমরা মনে করি না। জড় দেহধারী মানুষের পক্ষে কল্পনার অতীত হইতে পারা বড়ই কঠিন। যে, যে পরিমাণে জড়ের অতীত হইয়া চিন্ময় রাজ্যে বাস করে, সে সেই পরিমাণে কল্পনার অতীত হয়, অর্থাৎ সে সেই পরিমাণে চিন্ময়ের উপাসক বা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যার যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা এই কল্পনারই ক্রীড়া মাত্র। স্বরূপতঃ ভগবানের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হয়, সে আর তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়াছেন যে, তিনি বাক্য ও মনের অতীত। বাক্যের অতীত যিনি, তাঁহার ব্যাখ্যা যে, প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট সাধনা, ইহাতে সংশয় কি? এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিয়া সকলের বিরাগভাজন হইতে চাহি না, তবে, বঙ্কিম বাবুর প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট পূজার হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সুরক্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্কিম বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। তিনি সরল ভাষায় বলিতেছেন—"সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। * * * অতএব সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলের পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

বঙ্কিম বাবুর সার সার মতগুলি আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। দুই স্থানে সামান্য একটু অমিল হইয়াছে,—প্রথম যুদ্ধার্থে সুরাপান এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাকে ভক্তির নিকৃষ্ট অঙ্গ রূপে প্রতিপাদন। শেষোক্ত স্থলে বরং আমরা উদার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি—ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে,—তখন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ইহাই সকল প্রার্থনার সার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম স্থলে আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, এই সামান্য মতভেদে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তাযুক্ত কথা বলিতে হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমর্থন করিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর মত সমালোচন করিয়াছি বলিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের এক মাত্র অনুরোধ এই, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক খানি সমস্ত পাঠ করেন। তবে এ কথাও বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা যেরূপ অর্থে বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়া থাকি, সংবাদ পত্রের দ্বার অবারিত, সকলই আমাদের

প্রতিবাদ করিয়া ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ হয়, একটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আমরা এই সমালোচনা করিতে অধিকারী কি না, জানি না। প্রাণের আবেগে,— অনেক যাচ্ছে-তায় মত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে কেহ প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকিলে, আমাদিগকে ক্ষমা করেন, বিনীত অনুরোধ। তবে যাঁহারা, আমরা বঙ্কিম বাবুর অন্যায় প্রশংসা ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই একটী কথা কেবল বলিতে চাই—আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া ধন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে আমরা কৃপণ। যে দিন প্রশস্ত হৃদয়ে প্রকৃত মহৎ ও গুণী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শিখিব, সে দিন আমরা এই পূতিগন্ধময়, হিংসাবিদ্বেষ পরিপূর্ণ সংসারের একটু উপরে উঠিতে পারিব। সে অবস্থা এখনও হয় নাই, তাই আমরা দুঃখিত। বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্বের কেবল প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও উত্তর ভাগ অবশিষ্ট আছে। আমরা তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আজ কাল যদিও না হয়, আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, এক দিন না একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রতি গৃহে অধীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আর আর সমস্ত পুস্তকের সহিত ইহাও স্বর্ণাসন প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীচরণে।

বৃন্দাবনে রাধিকার
অনিবার হাহাকার
কেবল যমুনা ছাড়া কারো কাণে পশে না।
তুমি রাজা মথুরার
স্নেহে বদ্ধ কুব্জার,
পুরাণ পিরীতি বসে প্রাণ আর বসে না,
দূরে গেছ আছ ভুলে
কাজ কি এ কথা তুলে,
ভুলে থাক সুখে থাক এই শুধু বাসনা।
প্রেম লবে লও নাথ,
স্মৃতি রবে প্রাণ সাথ,
স্মৃতি লয়ে করি সদা মরণের কামনা,
রাধা ররষার নদী
এখন থাকিত যদি
রাধা নামে সাধা বাঁশি নীরবে কি থাকিত।
রূপের সৈকতে বসি
থাকিত শরৎ শশী
সেধে সেধে কত নিশি এ চরণ পূজিত।

ভগ্ন হৃদয়।

ভেঙ্গে গেছে যাক ভেঙ্গে হৃদয় আমার,
শিশুক ফেলিতে শ্বাস প্রতি পরমাণু
থাক প্রাণ হয়ে শুধু পত্রহীন স্থাণু,
বেঁচে থাকি বেঁচে রব মরুর মাঝার,
ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত শত অত্যাচার,
যে পরাণে পারে নাই করিতে কম্পিত,
সেই প্রাণ আজি হ'ল শতধা চূর্ণিত?
একটি আঘাতে শুধু ক্ষীণ উপেক্ষার?

প্রাণের যে প্রাণ-প্রেম তারই অবসান
প্রাণ-দেহ, প্রেম তার জীবন সুন্দর
তাই যদি গেল তবে প্রাণের কি মান,
প্রেমহীন প্রাণ সেতো দুখের নিঝর,
ভাঙ্গা প্রাণে শোক আছে নাহি সে গর্জ্জন
অশ্রু নাই আছে শুধু নীরস রোদন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

সাহিত্য-বাজার। (৫)

মাসিক পত্র।

সাহিত্য-বাজার সম্বন্ধে বক্তব্য যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা লিখিতে আর ইচ্ছা করে না। কথায় বলে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই;—সাহিত্য-বাজারের মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গলা ভূমির অক্ষয় কীর্ত্তি; কিন্তু আজ বঙ্গদর্শন কালের গর্ভে লুক্কায়িত। যে আর্য্যদর্শন ও বান্ধবের আবির্ভাব দেখিয়া, উৎফুল্ল চিত্তে, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-বাজার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আর্য্যদর্শন নাই—সে বান্ধব নামে থাকিয়াও কাজে নাই। শুনিয়াছি, বান্ধব ন মাস ছ-মাসে এক একবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই না। বহুদিন, ঐরূপ প্রকাশের সংবাদও পাইতেছি না। সুতরাং বান্ধব এখন "না জীবিত—না মৃত,"—অথবা জীবন্মৃত। বঙ্গদর্শন নাই, আর্য্যদর্শন নাই, বান্ধব জীবন্মৃত,—তবে আর আছে কি? বাঙ্গালা দেশ হতভাগ্য, বিবিধ-মত-সমন্বিত এইরূপ উচ্চ দরের পত্রিকাগুলিকে পরিপোষণ করিতে পারিল না। শুনিয়াছি, বঙ্গদর্শন ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। কথা সত্য হইলে, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, সকলেই আছেন, কিন্তু এখন আর কোন মাসিক পত্রিকার সহিতই তাঁহাদের যোগ নাই। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলার পক্ষে, ইহা যারপর নাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আর্য্যদর্শন ও বান্ধবের সমসাময়িক পত্রিকা "ভারতী"। "ভারতী" চিরপূজ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই ঠাকুর পরিবারের নাম চিরকাল বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। "তত্ত্ববোধিনী" ও "ভারতী" ভ্রাতা ও ভগিনী দ্বারা সম্পাদিত দুই খানি অপূর্ব্ব পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গলা ভাষার যে কি উপকার করিয়াছে, আমাদের ক্ষীণ লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। বঙ্গদর্শনের অস্তিত্ব যখন কল্পনার জরায়ু-গর্ভেও ছিল না, তখন তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গলা ভাষার শক্তিশালী কাগজ। এই উভয় পত্রিকাই, আজও, সমান তেজে চলিতেছে। এই পরিবারের সকল ব্যক্তিই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি-কল্পে বদ্ধ প্রতিজ্ঞ,—বোধ হয় যেন এই কাজের জন্যই আছেন। বাঙ্গলায় এরূপ ধনে, মানে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে সমন্বিত উন্নত পরিবার আর দেখা যায় না। "ভারতী"র উচ্চ বংশে জন্ম,—বেশভূষা পরিপাটী। এখানি এই পরিবারের কাগজ। বাহিরের লোকের লেখা অল্প বলিয়া বিভিন্ন মতের সমাবেশ ইহাতে কিছু খুব কম। "বালক" এখন "ভারতীর" সহিত একাত্মক হইয়াছেন। এ কাজটাতে "ভারতীর" পূর্ব্বে গৌরব কিছু নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, ভারতী এখন বাঙ্গলা

মাসিক পত্রিকার মান রাখিতেছেন। ভারতী প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস প্রধান পত্রিকা।

ভারতীর সমসাময়িক কাগজ—প্রবাহ। প্রবাহ—এখন অনন্ত বিস্মৃতি সাগরে বিলীন। তারপর নব্যভারত, যেরূপ চলিতেছে, সাধারণে জ্ঞাত আছেন। ইহা কোন সম্প্রদায়ের কাগজ নহে, সকল প্রকার মতই ইহাতে স্থান পায় বলিয়া বহু লেখক ইহাতে লিখিতেছেন। ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারে না। উপন্যাস না দিয়া মাসিক পত্রিকা চালান যায় কি না, তাহারই পরীক্ষা হইতেছে।

নব্যভারতের সমসাময়িক—নবজীবন ও প্রচার। খুব আয়োজনে, খুব ধুমধামের সহিত এই দুই খানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। জিনিসও বেশ হইয়াছিল। আদরও এদেশে খুব পাইয়াছিল, কিন্তু এদেশের আর হাওয়া সহ্য হইল না। প্রচারের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে,—নবজীবনের সংবাদ বড় একটা পাওয়া যাইতেছে না। নবজীবন এখন থাকিলেও, মৃত্যুশয্যায় আছেন। ইহাপেক্ষা বাঙ্গালার অধোগতির সংবাদ আর কি আছে? বাঙ্গালী কংগ্রেসে বক্তৃতা করিতে মজবুত, কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতিতে বিমুখ।

নব্যভারতের প্রথম বৎসর পাক্ষিক-সমালোচক বাহির হইয়াছিল, বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন পরেই লোপ পাইয়াছে। এখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা। কল্পনাও দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা। বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা পূর্ব্বে সম্পাদিত হইত, এখন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন। এখানিও উপন্যাস প্রধান পত্রিকা। সময়ে সময়ে দেখা দেন। মধ্যে মধ্যে বেশ ভাল লেখা ইহাতে থাকে। শুন যায়, বেদব্যাস—নবজীবন ও প্রচারের স্থান অধিকার করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অধ্যবসায়ী, কিন্তু বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, প্রচার ও নবজীবনের ধারেও পৌছিতে পারেন নাই। কেমন একরূপ এক ঘেয়ে সুরে ইহার তন্ত্রী বাঁধা। সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে থাকাতেই ইহার এই অবস্থা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তবু এ কথা অম্লান চিত্তে বলা যাইতে পারে, বেদব্যাস দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। উপন্যাসের নাম গন্ধও ইহাতে নাই। নবজীবনের ছোট ভাই—মালঞ্চ। মালঞ্চ, বেশ দক্ষতার সহিত চলিতেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণীর তিরোধানের পর আর দেখা যাইতেছে না। ফুলের বাগানে আর ফুল ফুটিতেছে না। মালঞ্চও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাগজ। "বিভা" একখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ, মালঞ্চের সমসাময়িক, কিন্তু এক বৎসরের পরই জ্যোতিহীন হইয়াছেন, আর চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। গান ও গল্প এবং সাহিত্য-কল্পদ্রুম নামক দুই খানি মাসিক পত্রিকা উপহারের বিপুল আয়োজন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গান ও গল্প উঠিয়া গিয়াছে, কল্পদ্রুম এ বৎসর "সাহিত্য" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক এবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উদ্যোগী, আশা আছে, কাগজখানি বেশ চলিবে। লেখা, ছাপা প্রভৃতি বেশ হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী ও চিকিৎসা-সম্মিলনী দুই খানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পত্রিকা। প্রথম খানি উচ্চ কুলে জন্মিয়াও দীর্ঘায়ু পায় নাই, শেষের খানি বেশ চলিতেছে। অনুসন্ধান—এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা, সাহিত্য সেবা ইহার উদ্দেশ্য না থাকিলেও, ক্রমে

ক্রমে সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করিয়া সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসর খুব আড়ম্বরের সহিত প্রতিমা নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া কাহারও কাহারও প্রশংসা পাইয়াছে। আশাপ্রদ, সন্দেহ নাই; কিন্তু "বিবাহের দর-দাম" প্রভৃতি চুটকি প্রবন্ধ দেখিয়া এবং এখনই রীতিমত বাহির হইতেছে না বলিয়া, আমাদের মনে কিছু আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে।

বালকদিগের জন্য "সখা" গত ৭।৮ বৎসর খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ঠাকুর বাড়ী হইতে "বালক" বালক বালিকাদের জন্য বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভারতীর সহিত এখন মিলিয়া গিয়াছে। মহিলাদিগের জন্য বামাবোধিনী ও পরিচারিকা দুই খানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। বামাবোধিনীর ন্যায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী মাসিক এদেশে আর নাই। বামাবোধিনী এ সম্বন্ধে সকলের আদর্শ। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকার মধ্যে ধর্ম্মবন্ধু, আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক, তত্ত্ব-বোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদীই প্রধান। কয়েক খানিই বেশ চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা অনেক বাহির হইয়াছে, অনেক হইতেছে। কিন্তু সে সকলের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য এক খানিও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সে সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে কি না, বলা যাইতেছে না, সুতরাং এখনও উল্লেখের সময় হয় নাই।

সংক্ষেপে সাময়িক পত্রিকার উল্লেখ শেষ করিলাম। এই সঙ্গে সাহিত্য-বাজার আপাততঃ শেষ হইল। সাময়িক পত্রিকার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। সংবাদ পত্রের অবস্থা, তাহা অপেক্ষা ভাল। পুস্তকের অবস্থা, তাহা অপেক্ষা ভাল। মধ্যে মধ্যে এখনও ভাল ভাল পুস্তক বাহির হইতেছে, ইহাতে আশা আছে, কালে বাঙ্গলা সাহিত্য প্রভূত সম্মান লাভ করিবে।

দেশের কৃতবিদ্যগণের নিকট নিবেদন, সকলে বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধ-পরিকর হউন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক কৃত বিদ্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে—লেখক হইব। এই জন্যই সে দেশের ইংরাজি ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের অনেকেরই লক্ষ্য—চাকরি। জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন কোন দেশের কোন জাতি উন্নতি লাভ করে নাই, ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলে যাহা কর্ত্তব্য, করুন।

সাহিত্য বাজার লিখিতে যাইয়া আমরা কোন কোন সম্পাদকের খুব বিরাগ-ভাজন হইয়াছি। বুদ্ধি ও বিবেচনায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই নির্ভয়ে লিখিয়াছি, কাহারও অনিষ্ট সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাঁহারা তীব্রভাবে আমাদের প্রতি কটূক্তি ও গালি বর্ষণ করিয়াছেন, বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া, দেশের অনন্ত অভাব রাশি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। যাঁহারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের চরণ-ধূলি ভিক্ষা করিতেছি। বিধাতা সকলের মঙ্গল করুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **নিদানতত্ত্ব**।—বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, আর, সি, পি, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য আপাততঃ ২৲। পুস্তক খানি ছোট, কিন্তু ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগের নিদান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন প্রকাশিত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখা বড় কঠিন, কিন্তু যোগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, এবং নেটিভ ডাক্তারদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে। আর যাহারা বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী, তাঁহারা একবার পুস্তক খানি পাঠ করিলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

২। **চৈতন্য-লীলামৃত**।—শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য ১৷৹। জগদীশ্বর বাবু নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য বাল্যকাল হইতে তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রতি অনুরক্ত—আজও তাহার চর্চ্চায় নিযুক্ত। তাহারই ফল—এই গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি নব্যভারতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া মতামত দিতে আমরা সঙ্কুচিত হই, কিন্তু এ কথা না বলিলে নদীয়ার অদ্বিতীয় প্রেমাবতারের প্রতি অসম্মান দেখান হয় যে, তাঁহার এরূপ অপূর্ব্ব জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক নব্যভারতের চৈতন্যলীলা ও চৈতন্যধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, তাঁহারা এই পুস্তক দেখিয়া যে আনন্দিত হইবেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষত ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট এ পুস্তক যে বিশেষ রূপে আদৃত হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভাষার মাধুর্য্যে এবং বর্ণনার চাতুর্য্যে এ গ্রন্থ অতি মনোহর হইয়াছে।

৩। **আভাষ**।—শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী প্রণীত, মূল্য ৸৹। এই পুস্তকে অশ্রুকণার কতকগুলি কবিতা তোলা হইয়াছে এবং অনেক গুলি নূতন কবিতা আছে। গিরীন্দ্র মোহিনী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা "অশ্রুকণার" সমালোচনার সময়ে বলিয়াছি। তিনি আমাদের দেশের মহিলা-কবিগণের শির্ষস্থানীয়া, একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আভাষের সকল কবিতা তেমন সরস হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় কতকগুলি কবিতা বাদ দিয়া, বাল্যরচনা নামে পৃথক একখানি পুস্তক ছাপাইলে ভাল হইত। গিরীন্দ্রমোহিনীর শক্তি যে অসাধারণ, আভাষের অনেক কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীন্দ্র মোহিনীর দ্বারা বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের আশায় বুক ফুলিয়াছে। অনেক কবিতা তুলিতে সাধ, কিন্তু কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী তুলিব, বুঝি না। কিবা লিপি-চাতুর্য্য, কিবা ভাব-ছটা, কিবা মধুর গাথা। অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেই জন্য, তুলিয়া তাহার একটীরও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিলাম না।

৪। প্রমীলা।—কহিনুর প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৷০। এখানিও কবিতা-পুস্তক, বঙ্গমহিলার লেখা। "প্রমীলা" প্রমীলার লেখা — নব্যভারতের পাঠকগণ ইহাকে জানেন। বালিকার লেখা সাধারণত লোকের নিকট উপেক্ষার জিনিস, কিন্তু সে ভ্রান্তি এ পুস্তক পাঠে দূর হইবে। গিরীন্দ্র মোহিনীর সহিত প্রমীলার তুলনা হয় না বটে, রবীন্দ্র নাথ, গোবিন্দ চন্দ্র, অক্ষয় কুমার, ও গিরীন্দ্র মোহিনীর ছায়া স্থানে স্থানে প্রতিফলিত দেখিলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইনি উপেক্ষার জিনিস নহেন। কবি নিজে বলিতেছেন—

"বনফুল ফোটেনা কি ফুটিছে গোলাপ যেথা ?
যে বনে কোকিল গায়, বায়স ডাকেনা সেথা ?
আকাশে চাঁদিমা হাসে, সেথা কি উঠেনা তারা ?
ধরায় বসন্ত হাসে, ঝরে না বরিষা ধারা ?
তুমি কেন স্বধু তবে সৌন্দর্য্য বিহীন ব'লে,
মুকুল হৃদয় খানি যেতে চাও পায়ে দ'লে ?"

ঠিক কথা ;—যে একের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া অপরকে তুচ্ছ করে, সে মূর্খ। আমরা সাদরে, সানন্দ চিত্তে কবিকে অভিবাদন করিতেছি। আশা করি, এদেশে তিনি অনাদৃতা হইবেন না।

৫। ভাব ও চিন্তা।—শ্রীফকির চন্দ্র সাধু খাঁ প্রণীত, মূল্য ।০। আমরা সাবধানে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িলাম, পড়িয়া মোহিত হইলাম। কবি ভাবে পাগল, চিন্তায় আত্মবিস্মৃত। এই দুই গুণই কবির পক্ষে যথেষ্ট।

কবি চিন্তায় কেমন আত্মবিস্মৃত, দেখুন।

"জগতের দ্বারে মাগিয়া বিদায়
এসেছি হেথায় মরিতে!
সবাকার তরে চির আদরের
আপনায় আজ ভুলিতে।
* * * * * *
মুছে ফেলে যেন চরণের চিন
চিনিবে আমায় যে জনা,
তা হলে কা'কেও হবে না কাঁদিতে
ভাবিতে আমার ভাবনা।
* * * * * *
পরাণ মরিয়া হবে মহাপ্রাণ
মানব মরিয়া দেবতা,
সসীম মরিয়া হইবে অসীম
পাষাণ গলিয়া মমতা।
আমিও মরিয়া সবার হইব
সকলে মিশিবে আমাতে,
যোজনের পথে আছয় যাহারা
মিলিবে প্রাণেতে প্রাণেতে।"

তারপর কবি কেমন ভাবে বিভোর তাও দেখুন।

"আমাকে ফেলিয়া কেহ যেতে নারে,
সকলে আমাতে বসিয়া,
আমাকে বাঁধিয়া সবাকার সাথে
গিয়াছি আপনি মরিয়া,
প্রকৃতি মরিলে আমি মরে যাব
আমি ম'লে কিছু রব না,
অমর প্রকৃতি মরে না বলিয়া
অমর মানব চেতনা।
অমর রবির প্রকৃতি লইয়া
নিজেও অমর হয়েছি,
অমর বিশ্বের অমর ছায়ায়
আপনাকে আমি বেঁধেছি।"

আরো ভাব দেখুন—

"নির্ঝর বেয়ে আস্‌বে ছুটে
মায়ের মত স্নেহের ঢেউ,
পাষাণ যাবে ভেঙ্গে চুরে,
থাক্‌বে নাক বাকি কেউ।'
সমান জোয়ার বয়ে যাবে
ডুবিয়ে দেবে নিখিল্ ধরা ;

আঁধার জলে বলুব ডুবে
মায়েব কোলে আছি শোবা!

. . . . .

থাকুব নাক চেনাচিনি
ভায়ে ভায়ে করব্ খেলা;
তারে ধরা হিংসাভরা,
পড়ে রবে হাসির মেলা।”

কবির সহিত আমাদের পরিচয় নাই। তিনি যুবা কি বৃদ্ধ, কবিতায় তাহার পরিচয় পাইলাম না; তবে এ পরিচয় পাইলাম, ভাবে তিনি নবীন, চিন্তায় তিনি প্রবীণ। তাঁহার ‘উপহার” “মরণে কি জীবন সঙ্গীত’ ‘সুখের মরণ” “বসন্ত বিলাস” “প্রেম কানন” “মানব স্নেহ “অভাগার কথা” “আমি’র মহত্ত্ব” “বিধবা ভগিনী,” “আর না বলে আয়” প্রভৃতি কবিতায় গভীর ভাবের খেলা দেখিলাম; আর “চিন্ময়ী” “জন্মভূমি” “নীরবে মরণ” “প্রকৃতি দর্শন” “অনন্ত বিরহ” “ভবিষ্যতের নিমন্ত্রণ” “ভাব ও চিন্তা” প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার উচ্চাঙ্গের চিন্তার পরিচয় পাইলাম। কোন কোন কবিতা একটু এলটু অস্ফুট হইয়াছে, স্থানে স্থানে একটু আধটু অনুকরণ-ছায়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে ভাব ও চিন্তায় একটু আধটু বিবাদ বাধিয়াছে বটে, কিন্তু গুণের সহিত তুলনায় সে দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বলিতে কি, এই এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া কবিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে। যিনি প্রকৃত কবি, তাঁহাকে যদি আদর না করি, বাঁচিয়া কাজ কি? ফকির চন্দ্র সাধু খাঁ কাব্য জগতে অমর হউন, এই প্রার্থনা;—তাঁহাকে যেন আক্ষেপ করিয়া আর বলিতে না হয়;—

“ক্ষুদ্র প্রেম বোলে ঘুচিবে না তায়
কণামাত্র ধরণীর ভার?
মরণের কোলে শয়ান বলিয়া
পাব না কি অমৃতের ধার?

৬। সরল প্রাকৃত ভূগোল।—শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, এম, এ, প্রণীত। মূল্য ৷৶০ আনা। আমরা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-কমিটির সুবিচারের কথা অনেক বার লিখিয়াছি। আমাদের বকাবকিতে কিছু ফল দর্শিবে, সে আশা বড় নাই; তবুও দুই একটা কথা লিখিবার খাতিরেই লিখিতে হয়। যাহারা শিক্ষা বিভাগের সহিত সংসৃষ্ট, তাহারা যে কোন বিদ্যায় পারদর্শী—এ কথাটা গোড়ায় না মানিয়া লইলে বুঝিতে পারা যায় না যে, যিনি বৈজ্ঞানিক নহেন, তাঁহার ভূবিদ্যাই বা পাঠশালায় কেন চলে আর যোগেশ বাবুর মত বিজ্ঞ লেখকের পুস্তকই বা পড়িয়া থাকে কেন? ভূবিদ্যা গ্রন্থের সৃষ্টি হইতে যোগেশ বাবুর পুস্তকের প্রকাশ পর্য্যন্ত, ক্রমাগত বিংশাধিক সংস্করণে ভূবিদ্যা পুস্তকে বালকেরা সহস্রাধিক ভুল শিখিয়া আসিতেছিল। সহসা এবারকার নূতন সংস্করণে যদিও অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে, তবুও এখন অনেক আছে। “চন্দ্র পৃথিবীর অধিক নিকট; চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর উপর বেশী,” এই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা যে গ্রন্থে জোয়ার বুঝান হইয়াছে, তাহা কি রাধিকা বাবুর নামের জোর ভিন্ন পাঠশালায় চলিতে পারিত? যোগেশ বাবু বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক; বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর দৃষ্টি, লিপি-কুশলতাও তাঁহার অতি চমৎকার। এসকলেরই পরিচয় স্থল তাঁহার প্রাকৃত ভূগোল। যদি ন্যায় বিচারে দোষ না থাকে, তবে পাঠ্য পুস্তক কমিটি একবার সরল প্রাকৃত ভূগোল খানি পড়িলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৯)

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ মহোৎসব।

কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়া স্তব বন্দনা করিলেন। এখানে ভূগর্ভে পাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পুঁড়া গোয়ালের এই স্থানে শস্য ক্ষেত্র ছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে যাইবার সময় শস্যক্ষেত্রে অন্যরক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষেত্রগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্য নষ্ট করিয়া যায়। সে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শস্য নষ্ট করে, তাহাকে যেন সে দেখিতে পায়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল যে, ভীষণমূর্ত্তি এক বরাহ আসিয়া তাহার শস্য খাইতেছে। অমনি সে ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে পাইল, শূকর রাম! রাম! শব্দ করিয়া নিকট-স্থিত পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়ালা বুঝিল যে, সে শূকর নহে, ভগবান তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাসী থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট আত্ম দোষের ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিল। দৈববাণী হইল, 'তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও।' পুঁড়া ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিল, 'আমার দোষ ক্ষমা করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই?' দৈববাণী উত্তর করিল 'পাইবে'। পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার ক্রীত দাস।' তখন রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে, দৈববাণী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া আমার ভক্তের সম্মান করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে দুগ্ধ সেচন কর, আশ্চর্য্য দেখিবে।' তখন রাজাজ্ঞায় সেই স্থানে দুগ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া ভূগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব নৃসিংহ মূর্ত্তি উঠিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া গেল। জানু পর্য্যন্ত উঠিলে আজ্ঞাবাণী হইল, 'আর উঠিবে না; নিরস্ত হও।' রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড নামে এক সাধু মহাজন দুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে দেবমূর্ত্তি দেখিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী দুই জনকে পাষাণময়ী হইয়া দেবচরণ লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রোদন ছাড়; তোমার রমণীদ্বয় সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।' সেই অবধি জিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিরে যাইয়া এই কিম্বদন্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নৃসিংহক্ষেত্র ছাড়িয়া গৌরচন্দ্র কত দিন পরে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় তিনি অনুরাগ ভরে বন মধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। এবং নদী পার হইয়া পর পারে আসিয়া স্নানাবগাহন সাঙ্গ করিয়া ঘাটের কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রি। ইহা উৎকল রাজের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। অল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বহু লোক সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গের স্তাবক এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ বিধিমত স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই কি রাজা রামানন্দ রায়, যাঁহার কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াদিয়াছেন? ইতি মধ্যে রাজপুরুষ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে, গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়।" আগন্তুক উত্তর করিলেন "হাঁ আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধমই বটি।" গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আসিতেছি; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমার এখানে আসা; ভাল হইল যে অনায়াসে দর্শন পাইলাম।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র বাহু প্রসারিয়া রামানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও তাঁহাকে আলিঙ্গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্যতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণ কালের জন্য উভয়েই আত্ম বিস্মৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক তার আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকী থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, 'এই সন্ন্যাসীকে মহা তেজোময় দেখিতেছি, শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কাঁদিতেছেন কেন? আর আমাদের মহারাজ পরম গম্ভীর ও পণ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্ন্যাসী স্পর্শে অস্থির হইলেন।" যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন বলিয়া আমার উপকারের জন্য আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। আমি অস্পৃশ্য রাজ সেবী শূদ্রাধম, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপার গুণে। মহৎদিগের স্বভাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা পামরদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষাতেই দেখিতেছি যে, আমার সঙ্গের এই সহস্রাধিক লোকও আপনাকে দেখিয়া হরি নাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে।" গৌর বলিলেন, "না, তা নয়। আপনি ভাগবতোত্তম; আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে বলিয়াই সার্ব্বভৌম এখানে

আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।” এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে বলিলেন, “আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।” রায় বলিলেন, “যদি অধম তারিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে ৫।৭ দিন থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে সংশোধন করুন।” এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে মহা সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন।

রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:— ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর দুই জন, যাঁহাদের নাম জানা যায় না। সপুত্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষ্যার রাজ সংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মালজোঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক প্রদেশে গোপীনাথ শাসন কর্ত্তা, রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, তাঁহার উপাধি রাজা। ভবানন্দ ও বাণীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত। ইহার পর শ্রীচৈতন্য নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোষ্ঠি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক, পরম ভক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার জীবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজা রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতন্য সায়হ্ন স্নান সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় রামানন্দ রায় এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে ভৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিলেন। রহস্থানে নানা কথোপকথন হইলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাধ্য বস্তু কি? তাহার নির্ণয় করুন।”

রামানন্দ উত্তর করিলেন, “স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম যেরূপ মন্বাদি ঋষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন, স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করা উচিত।” শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “এত বাহিরের কথা, নিগূঢ় কথা কি বল।” রামানন্দ বলিলেন, “ভগবানে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার। পান, ভোজন, দান, তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায়; তাহার ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই সার ধর্ম্ম।”

শ্রীচৈতন্য। ‘এও বাহিরের ধর্ম্ম।’

রামানন্দ। ‘তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ; বর্ণাশ্রম-নিরূপিত ও বেদ-বিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।’

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হইযাছে, যাঁহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, যাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া, শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ, বিপদ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্ম যোগরূপ পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞান শূন্যা ভক্তিই সাধ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া আত্মাকে কলুষিত করে, বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? কে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিৎকর, অসীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে? এই সকল বিবেচনা করিয়া যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিস্থত ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া থাকেন, অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভগবান প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম কথা বটে। কিন্তু ইহার পর কি, শুনিতে চাই।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সর্ব্ব সাধ্যসার। প্রেমবিহীন কৃষ্ণ পূজা ভক্তের কখনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রস লাভই তাঁহাদের লোভনীয়। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বসেও ঐ লোভ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য। এও বটে। তার পর?

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র হয়, সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চেয়ে, আর সৌভাগ্যবান্ কে?

শ্রীচৈতন্য। এও বেশ, তারপর কি।

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে ও ভক্তগণ আরাধ্যরূপে যাঁহাকে প্রতীতি করেন, যদি কেহ তাঁহার সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া গিয়া সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের সম শ্রেষ্ঠ আর কে?

শ্রীচৈতন্য। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে?

রামানন্দ। আছে, বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা ভগবানকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য সাধক আর কে? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য?

শ্রীচৈতন্য। অতি উত্তম, তার পর?

রামানন্দ। তার পর কান্ত ভাব। ইহাই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। ভগবানে আত্ম সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে? সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, মন সকলই সমর্পণ করেন, তেমনি কান্ত ভাবে ভক্ত সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম পঞ্চ ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচটী তন্মাত্রই থাকিয়া যায়, তেমনি শান্তের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের

বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্ম সমর্পণ সকলই কান্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। ভগ বৎ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে কান্ত প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্য প্রেমে ভগবানকে পাওযা গেলেও পবিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই যাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, যত দূব বলিলেন, ইহাই সাধ্যেব সীমা বটে; কিন্তু ইহার পর আব কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।

রামানন্দ উত্তর কবিলেন, ইহাব পরেব কথা জিজ্ঞাসা কবে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জান্‌তাম না। যাহা হউক, ইহার পর আছে বই কি? শ্রীবাধিকার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন জানেন না কি? শত কোটী গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্ রাধা প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া বন মধ্যে লুকাইয়াছিলেন?

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে রাধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ? গোপীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবানকে লুকাইতে হইল, তখন সে প্রেমে অন্যাপেক্ষা হইল; তাতে তো প্রেমের গৌরব হইল না। যদি জানিতাম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্য সর্ব্ব সমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। আপনার মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে; বলুন এ কথার সমাধান কি?

বামানন্দ বলিলেন, তা নয়। রাধা প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। রাসমণ্ডলে যত গোপী নাচিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নাচিতেছিল। রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। সাধাবণ প্রেমে সর্ব্বত্রই সমভাব দেখিয়া শ্রীবাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে, তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিগূঢ় প্রেমেই অভিমান হয়; সাধারণ প্রেমে তাহা হয় না। শ্রীরাধিকার অভিমান এই নিগূঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল; তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অভিমানিনী রাধাব অন্বেষণ জন্য ভগবানও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়া তাঁহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটী গোপীতেও যে কাম নির্ব্বাপণ হইল না, একা রাধিকাতেই তাহা হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা বুঝুন।

শ্রীচৈতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম; যাহা শুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই শুনিলাম। এখন আর কয়টী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি? রস কোন্ তত্ত্ব? প্রেমই বা কি? এই যে 'কাম' শব্দ বলিলেন, তাহাই বা কি?"

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

"ঠাকুর"ই হউন আর "দাস"ই হউন আদিশূরের সময়ে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বংশীয় কায়স্থগণ কোন্ স্থান হইতে কখন বাঙ্গালায় আসিয়াছেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, যথা—

১। পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারাই সামোলিক ও মৌলিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

২। পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালায় আগমনের পর আরও অনেকগুলি কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন।

৩। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কায়স্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

৪। বাঙ্গালার শূদ্রগণ কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইত্যাদি।

এই সকল উত্তরের মধ্যে যে আংশিক সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ আদিশূরের বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যবংশীয় এক শাখা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্গের কতকগুলি লোক কায়স্থ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে সেই শাখার কতকগুলি লোক অবশ্যই বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ লেখক অর্থাৎ মুহুরী না থাকিলে কোন দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ কৃত কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে যে, সেই পঞ্চ কায়স্থের সহিত নাগবংশীয় দেবদত্ত ও মহৌজা, নাথবংশজ চন্দ্রভানু, দাসবংশজ চন্দ্রচূড় বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তদনন্তর অম্বষ্ঠ কুলজাত সেনবংশীয় জয়ধর গৌড় দেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হন। তৎপর করবংশীয় ভূমিঞ্জয়, দাসকুলভূষণ ভূধর, পালবংশীয় জয়পাল, পালিতবংশসম্ভূত চক্রধর, চন্দ্রবংশের দীপক স্বরূপ চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশসম্ভূত মহাপ্রাজ্ঞ বিপুগুণ, ভদ্রকুলজাত সুশীল বীরভদ্র, ধরকুলের কমল স্বরূপ দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তুজোবর, দেববংশজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ডবংশের চন্দ্রস্বরূপ বশিষ্ঠ, সোমবংশসম্ভূত সুধীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলের কমল মহাবাহু বীরবাহু, রক্ষিতকুলভূষণ মহাবীর ইন্দুধর, অঙ্কুরবংশের দীপকস্বরূপ সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক মহাযশা লোমপাদ, আদ্যকুলসম্ভূত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতা এবং নন্দনককুলভূষণ মহীধর,—আদিশূরের শাসনকালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময়েই বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পাল, পালিত, চন্দ্র, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আদ্য, নন্দন প্রভৃতি সপ্তবিংশতি বংশীয় কায়স্থ বাঙ্গলায় উপনীত হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর রাজবাটী, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লৌহিত্য, মল্লকোটী,

লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতি, নন্দীগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্ধুবাট ও শূরপুরী নামক সপ্তবিংশতিগ্রাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ যে কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ এক্ষণে বাঙ্গালায় যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই মুসলমান শাসনের অন্ত ভাগে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। সেন রাজবংশের সৌভাগ্য-ভাস্কর অস্তমিত হইলেও বাঙ্গালার সামন্তরাজগণ সমূলে উৎপাটিত হন নাই। তাঁহারা অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর নবদ্বীপ বিজয়ের কিঞ্চিদূনাধিক ৩৮৫ বৎসর অন্তে আকবরের বিখ্যাত সচিব আবুল ফজল আইন আকবরী রচনা করেন। তৎকালে বাঙ্গালায় তিন জাতীয় "জমিদার" বা সামন্ত রাজা ছিলেন যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান। আবুল ফজল বলেন, "ইহাদিগের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যাই অধিক।" আবুল ফজলের আইন আকবরী রচনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে নবাব সুজাউদ্দিন "জমা তুমারি তক্‌ছিছি" নামক বাঙ্গালার রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তদ্‌পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালায় ১১ জন প্রধান জমিদার ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন কায়স্থ, ১ জন রাজপুত (ক্ষত্রিয়), এবং ১ জন মুসলমান। ব্রিটীসগবর্ণমেণ্টের নিলামী আইনের কৃপায় যদিচ এক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায়ীর সন্তান সন্ততীগণ জমিদারী ক্রয় করিতেছেন, তথাপি কায়স্থদিগের এই অধিকারটী সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের হস্তস্খলিত হয় নাই। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দু শাসন কালের ক্ষত্রিয় কুলজাত বাঙ্গালার সামন্ত নরপতির বংশধরগণই মুসলমান শাসনের আরম্ভে বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিশেষত চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গালার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভুত, এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভুলুয়ার হৃতসর্ব্বস্ব শূর রাজবংশধরদিগের মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালার "সিংহ" ও 'বর্ম্মা' বংশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় কুল হইতে উদ্ভূত, উপাধিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশেষত মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধন বংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বাঙ্গালার ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের অবশ্যই কোন রূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে *

* শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস নামক উপাদেয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন :—

"Here and elsewhere we have stated that Kayasthas are descended from the ancient Vaisyas A controversy is going on since many years past, and reasons have been advanced to shew that Kayasthas are descended from Kshatriyas We have not entered into the merits of this controversy, and we are unable to give an opinion on the subject Our main contention is that Kayasthas are not Sudras nor the product of a hybrid mixture of castes, that they are the sons of the ancient Aryan population of *India, and have formed a separate caste* because they embraced a separate profession. Whether they are descended from Aryan Kshatryas or from Aryan Vaisyas is a question of minor importance It is possible that their ranks have been mainly recruited

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন ইতর জাতির রুধির সংযুক্ত হইতেছে, তখন কায়স্থদিগের মধ্যে অবস্থাপন্ন দুই এক জন শূদ্র অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? এবম্প্রকার দোষারোপ করিয়া যাহারা সমগ্র কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বংশজ প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিতান্ত সম্নজ্ঞান সম্পন্ন। বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, কানদ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ঋষিগণের জন্মবৃত্তান্ত আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। স্থানে স্থানে অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব অধিকারীগণ কিরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কিরূপে ভাড়ার মেয়ে বিবাহ করিয়া পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তৎপর কায়স্থদ্রোহীগণ জিহ্বা আস্ফালন করুন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

বল্লাল কৃত শ্রেণীবিভাগ ও মর্য্যাদা স্থাপন।

আদিশূরের তিরোধানান্তে পাল রাজগণের অভ্যুদয়। পালবংশীয় দ্বাদশ জন নরপতি কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের শাসন কালে প্রবল বিক্রম চোলারাজ কুলতুঙ্গার সাহায্যে দক্ষিণাপথ-নিবাসী বিজয় সেন দেব বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইনিই বাঙ্গালায় সেন বংশের স্থাপনকর্ত্তা। বিজয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বল্লাল সেন দেব পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। বল্লাল যেরূপ বিদ্বান—সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, যেরূপ গুণবান—সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। এজন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের মধ্যে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন।* সেই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এ স্থলে আমরা ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিব না। কেবল কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

মহারাজ বল্লাল দ্বারা কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাসনিবন্ধন প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

উদগত দক্ষিণ রাঢেচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতুশ্রঃ সংজ্ঞা ন্যস্তত্তদ্দেশ নিবাসনাৎ॥
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণি শ্রেণি বিশেষতঃ

from the Ksatriya stock, and that poor relations of kings gladly accepted the posts of accountants and record keepers in the royal courts. We are informed that to the present day the period of impurity for Kayasthas in Northern India, on the death of relations is the same as is prescribed for Kshatriyas."

আমরা আনন্দের সহিত রমেশ বাবুর শেষোক্ত মত অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু কালিঞ্জরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের ১১৯০ সম্বতের ১৫ মাঘের তাম্রশাসনের লিখিত "কুটম্বি কায়স্থ মহাত্মারা দীন সর্ব্বান" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মতের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের-ক্ষোদিত লিপি সমূহে কুটম্ব ও কায়স্থদিগকে এক শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। চেদিপতি মহারাজ যষল্ল দেবের শাসন পত্রও এই মতকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে।

* আমাদের মতে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ বল্লালের সময়ে গঠিত হয় নাই, সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈদ্যদিগের ঘটক নাই, ইহাই আমাদিগের মত সমর্থনোপযোগী সুদৃঢ় প্রমাণ।

বঙ্গজ কায়স্থ।

সেনরাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে বঙ্গান্তর্গত প্রাচীন (সমতট) বিক্রমপুর* তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করিতে হইলে, প্রথমেই রাজধানী বিভাগের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা প্রথমেই বঙ্গজ কায়স্থদিগের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু যে সকল কুলজীগ্রন্থ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহা প্রত্যয়োপযোগী নহে। বঙ্গস্থ কায়স্থ সমাজপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেবকৃত শ্রেণী বিভাগের পর বঙ্গজ ঘটকদিগের গ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল ও দনুজ কৃত শ্রেণীবিভাগের মধ্যস্থিত প্রভেদ সমূহ আবিষ্কার করত তাহার সমালোচনা করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও সিংহ, এই দ্বাদশ বংশ বিশুদ্ধ ও প্রধান।

"এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ৮৭ বংশীয় কায়স্থ নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন।

ঘটকদিগের গ্রন্থপাঠে অনুমিত হয়, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে ২৭ ঘর কায়স্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়া, সেই ২৭ বংশের ২৮ জন কায়স্থকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। *তন্মধ্যে পঞ্চবংশ কুলীন ও দ্বাবিংশ বংশ মহাপাত্র বা সন্মৌলিক।

কুলীন পঞ্চবংশ।

ঘোষ	চতুর্ভুজ।
বসু	লক্ষ্মণ ও পূষণ।
গুহ	দশরথ।
মিত্র	অশ্বপতি।
দত্ত	নারায়ণ। * মৌদ্গল্য গোত্রজ।

মহাপাত্র বা সন্মৌলিক দ্বাবিংশ বংশ।

নাগ	দশরথ।
নাথ	মহানন্দ।
দাস	চন্দ্রশেখর।
সেন	গঙ্গাধর।
পালিত	জন।
সিংহ	রত্নাকর।
দেব	কেশব
কর	দামোদর।
দাস	উষাপতি।
চন্দ্র	নারায়ণ।
পাল	আব।
রাহা	কৃষ্ণ।
ভদ্র	দিগাম্বর।
নন্দী	প্রভাকর।
ধর	ব্যাস।
কুণ্ড	অধিপতি।
সোম	বংশধর।
রক্ষিত	নারায়ণ।
অঙ্কুর	বেদগর্ভ।
বিষ্ণু	দৈত্যারি।
আঢ্য	ত্রিলোচন।
নন্দন	উষাপতি।

* ইহার আধুনিক নাম রামপাল।

* এই নারায়ণ দত্ত, মহারাজ বল্লাল ও তৎ পুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসনপত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বসুবংশেষু মুখোপাধ্যৌনাম্না লক্ষণপূষণৌ।
ঘোবেযুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতিঃ॥
গুহে দশবথশ্চৈব মিত্রে অশ্বংতি স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগেদশবথশ্চৈব মহানন্দস্ত্ব নাথকঃ।
চন্দ্রশেখবদাসস্তু সেনে গঙ্গাধবোস্তথা॥
পালিতে জনসংজ্ঞস্যাচ্চন্দ্রে নাবায়ণাখ্যকঃ।
পালে আবঃ সমাখ্যাতোবাহাব'শেষু কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগাম্ববোশ্চৈব ধবেচ ব্যাসসংজ্ঞকঃ।
প্রভাকবস্তু নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ॥
অধিপতিবিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমেবংশধবশ্চৈব সিংহে বত্নাকবস্তথা॥
নাবায়ণঃ সমাখ্যাতৌ বক্ষিতেচ তথা পবে।
বেদগর্ভাঙ্কুবশ্চৈব দৈত্যাবি বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ॥
আদ্যে ত্রিলোচনো খ্যাত নন্দনেচ উষাপতিঃ।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

বঙ্গজকায়স্থকাবিকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।*

* ফরিদপুরে একটি আর্য্যকায়স্থসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই কায়স্থ সমিতি হইতে "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা" নামী এক খণ্ড ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ফরিদপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই সমিতির প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন। সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সম্প্রতি "কায়স্থকুল চন্দ্রিকা" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছাপা ও লেখা, উভয়ই কদর্য্য। তাহাবা যে কি সাহসে এই কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এই পুস্তকেব প্রকাশক একজন "মোক্তার, সুতরাং লাথাটি তাহার ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। আমবা ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে কায়স্থ-দ্রোহীদিগেব যে সকল মত উদ্ধৃত করিযা তাহাব তীব সমালোচনা কবিযাছি, এই পুস্তক খানাতে সেই সকল প্রাচীন কথা'ব চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র দৃষ্ট হইল। অধিকন্তু কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব একখানা প্রদত্ত বাবস্থাপত্র প্রকাশিত হইযাছে। যতদিন ভাবতবাসী স্মৃতি পুবাণাদি গ্রন্থ পাঠ কবিতে পাইত না, ততদিনই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগেব ব্যবস্থাব প্রয়োজন ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায এক্ষণে আমবা সকলেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ কবিতে সক্ষম হইয়াছি। সুতবাং এক্ষণে আর ব্যবস্থার কোন প্রযোজন নাই। এই সকল ব্যবস্থা-দাতা পণ্ডিতেব মধ্যে ত্রিপুরাব জলপাযী পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, তাহা কোন ফবিদপুববাসী কাযস্থ বন্ধু আমা-দিগকে জনাইলে আমবা নিতান্ত অনুগৃহীত হইব, এবং বাবান্তবে ব্যবস্থাপত্রেব এবং তদ্দাতা পণ্ডিত মহাশযদিগেব মূল্য নিরূপণ কবিতে যত্ন কবিব।

ব্রাহ্মণেরা সেই প্রাচীন কাল হইতে কাযস্থদিগের প্রতি অন্যায অত্যাচাব ও বাক্যবাণ প্রযোগ করিযা আসিতেছেন। ইহাব কারণ কি? কায়স্থগণ কখনই ব্রাহ্মণদিগেব উপরে আপনাদের আসন সংস্থাপন করিতে যত্ন করেন নাই। তথাপি এই বিদ্বেষ কেন? কাযস্থ বিদ্বেষ রূপ রোগ কি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইবে? কায়স্থগণ ক্ষত্রিযই হউন আর শূদ্রই হউন, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তথাপি ফরিদপুরের ব্রাহ্মণগণ কেন হিংসার দংশনে অস্থির একরূপ ছুটা ছুটি করিতেছেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার মূল্য যুগী জাতিতেই প্রকাশ হইয়াছে। লজ্জটা কি পদ্মাব জলে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে নাকি!

সৌরকলঙ্ক।

কবিগণের উপমাস্থল চন্দ্রের কলঙ্ক সকলেই বিদিত আছেন। সূর্য্যের কলঙ্ক তত প্রসিদ্ধ নহে। এতৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

সূর্য্যও সময়ে সময়ে কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার প্রখর জ্যোতিঃ বশতঃ তাঁহার কালিমা-চিহ্ন সহজে দেখা যায় না। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে গালিলীও সর্ব্ব প্রথমে ইয়োরোপে সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে যে উহা জানা ছিল, বিজ্ঞানানুশীলনরতা 'পৃথিবী'-রচয়ত্রী তাঁহার 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "দূরবীন সৃষ্টি হইবার পরে ইয়োরোপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্যবিম্ব (solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে,

'তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।
তেনাস্মিন্ শ্যামিকা জাতা শাতনেনোচিষ স্তথা॥'

"বিশ্বকর্ম্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল, সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।"

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় সূর্য্যবিম্বের অর্থাৎ সৌরকলঙ্কের কথা স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্যবিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান, বরাহমিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শন মায়াস্তি সূর্য্যবিম্বস্যাঃ।
তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং পরি-জ্ঞেয়ং।
* * * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ
সরিতো আয়াস্তি তনুত্বং কচিৎকচি জ্জায়তে শস্যং।"

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। * * মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবাসী সৌরকলঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইদানীন্তনের কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীর, সুতরাং আমাদের ইষ্টানিষ্টের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। বাস্তবিক, জ্যোতিষ ও দর্শন শাস্ত্র ভারতের কিরীট স্বরূপ। তাহার কহিনূরের অতিবিস্তৃত সুদূর-প্রসারিত রশ্মিমালায় এখনও লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে সৌরকলঙ্কের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও, তাহা যে সবিশেষ সর্ব্ব সাধারণে

অবগত ছিল, এমত বোধ হয় না। অতি প্রাচীন কালে প্রখর জ্যোতিষ্মান সূর্য্য দেখিয়া সহজেই লোকের মনে ভয় ও বিস্ময় রসে পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যজীবনের শৈশব কালে সূর্য্যের পদে মানবের মস্তক স্বতঃই অবনত হইত এবং স্বতঃই কণ্ঠ হইতে তাঁহার প্রীতিসূচক গীতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত। তামসী রজনীর অবসানে পূর্ব্বাকাশ প্রভাসিত এবং সারা দিন জ্যোতির্ম্ময় কিরণ জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে পশ্চিমভাগে অল্পে অল্পে নীরবে দীনভাবে সূর্য্যকে অস্তমিত হইতে দেখিলে কোন্ স্বভাব-কবির কবিতা উৎস উচ্ছ্বসিত না হয়?

আর্য্য ঋষিগণ কেবল সৌরকান্তেই মুগ্ধ হন নাই। সূর্য্যের একটু মাত্র আলোক ও তাপ পাইয়া পৃথিবী শস্যশ্যামলা বহুজীব সঙ্কুলা হইয়াছে। তাঁহারই কৃপায় জীবগণের গতিশক্তি বর্দ্ধিয়াছে এবং তাঁহারই কণিকা প্রসাদে বাষ্পীয় যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপারের মূলে তিনি বিদ্যমান। যে স্রোতস্বতীর পুণ্য সলিলে ভূমি সিক্ত ও উর্ব্বরা হইতেছে, যাহা ভূপৃষ্ঠ চূর্ণীকৃত ও পুনর্গঠিত করিয়া পৃথিবীকে বহুবিধ উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে, তাহাও সূর্য্যের কৃপায় প্রাণ ধারণ করিতেছে। পুরাতন ঋষিগণ যে সূর্য্যকে বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে" এবং "নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতি নাশহেতবে" ইত্যাদি বাক্যে অর্চ্চনা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এত অধিক অন্তর সহজে ধারণা করা যায় না। বাষ্পীয় শকট প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিলে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস সময় লাগিবে। কিন্তু সেই শকট সেই বেগে সূর্য্যাভিমুখে গমন করিলে তথায় উপস্থিত হইতে তাহার প্রায় ৩৫০ বৎসর কাল আবশ্যক হইবে। এমন কি, যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবমান হয়, তাহাকেই সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে পাঁচ শত সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে। অতএব প্রতীতি হইবে যে, সূর্য্যের উপাদান পরম্পরা এখানে বসিয়া সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা অনুসন্ধান করা অসম্ভব। কিন্তু বুনসেন ও কীরকফ, সেচী ও তাচিনীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে ধন্য। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারা এক নূতন অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্যের অন্তর যত বেশীই হউক না কেন, এই নূতন প্রণালী সূর্য্যের উপাদান নিরূপণার্থ যথেষ্ট সামগ্রী রাসায়নিক পণ্ডিতগণের করতলস্থ করিয়াছে। এই বিশ্লেষণ প্রণালী বর্ণনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৌরকর-জাল রশ্মি দর্শন-যন্ত্র (spectroscope) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের অনেকাংশের উপাদান নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তবিক জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যের চারিদিকে বাষ্পমণ্ডল রহিয়াছে এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান জলজনক গ্যাস, লৌহ, নিকেল, তাম্র, সীসক, দস্তা, চূণ ও অন্যান্য ক্ষারজনক পদার্থ প্রভৃতি তাহাতে বর্ত্তমান আছে।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ দ্বারা যেমন উহার উপাদান অবগত হওয়া যায়, দূরবীক্ষণ ও

ফটোগ্রাফি দ্বারা উহার প্রাকৃতিক অবস্থা নিরূপিত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর, তাহা সূর্য্যাভিমুখে স্থাপিত হয়। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ গালিলীও প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পৃষ্টদেশ নিরবচ্ছিন্ন সমান ভাবে জ্যোতির্ম্ময় না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েন। তিনি দেখেন, যে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশে বহুসংখ্যকে কলঙ্কচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় চিহ্নের আকার নানাবিধ ও ক্ষেত্রপরিমাণও বিভিন্ন. প্রতিদিবস পর্য্যবেক্ষণে তৎসমুদায়কে সূর্য্যদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিতে দেখেন। সে গুলি সূর্য্যবিম্বের (solar disc) পূর্ব্বাংশে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তমিত হইত। অবশেষে জানা গেল যে, সেই সকল কালিমাচিহ্ন যাহাই হউক, তাহারা সৌরদেহে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহাদিগের আপাতঃদৃশ্যমান অবস্থিতি ভেদ সূর্য্যের আপন অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তন বশতঃ সংঘটিত হইতেছে।

কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে, তৎসমুদায় কলঙ্ক সৌরদেহে চিরস্থায়ী থাকে না। তাহারা কখন বা সৌরদেহে আবির্ভূত ও কখনও বা অন্তর্হিত হইতেছে। কখন কখন অতি ক্ষুদ্র কণিকার ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃহদায়তন ধারণ করে এবং অবশেষে বিলীন হইয়া যায়। কখনও বা কোন কোনটা সৌরদেহে অনেক দিন অবস্থিত করিয়া পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয় এবং আবার ঘুরিয়া আসিয়া সূর্য্যবিম্বের পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিগোচর হয়।

কোন একটা চিহ্নকে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহা সর্ব্বত্রে সমগাঢ় নহে। উহার মধ্যভাগ অপেক্ষা চারিপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্পতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আবার মধ্যভাগের মধ্যস্থিত এক স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ইহাকে কলঙ্কের কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। অল্পতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণকে পূর্ণচ্ছায়া এবং তদপেক্ষা অল্পগাঢ় বহির্ভাগকে অপূর্ণচ্ছায়া বলা যায়।

এই সমুদায় কলঙ্কের প্রকৃতি বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি কলঙ্ক সবিশেষ বর্ণিত হইতেছে। এটি গত বৎসর জুনমাসে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় দেখা যায় যে, প্রধান কলঙ্কের নিকটে আরও কতকগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ নানাবিধ আকৃতির অপূর্ণচ্ছায়াময় পুচ্ছ ছিল। দেখিলে বোধ হইত যেন এক দল ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আছে। প্রধান কালিমা চিহ্নটি কয়েক দিবস পরে সৌরবিম্বের পশ্চিম প্রান্তে লুক্কায়িত হইল। যখন পূর্ব্বভাগে পুনর্ব্বার দেখা গেল, তখন উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং উহার অনুবর্ত্তী কলঙ্কগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে। ৬ই সেপ্টেম্বর দিবসে সূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে, সেই সময় উহাকে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তভাগে দেখা যায়। পর দিবস প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় দেখা গেল যে, উহার পূর্ব্বাংশে আর দুইটি প্রকাণ্ড কলঙ্ক রাত্রির মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

উক্ত প্রধান কলঙ্কের অপূর্ণচ্ছায়া প্রায় দশ সহস্র মাইল দীর্ঘ ছিল। কিরূপে উহার দৈর্ঘ্য পরিমিত হইল, তাহা বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে উপায় অনুসরণ পূর্ব্বক সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকলের ব্যাস নিরূপিত হইয়াছে, সেই উপায় দ্বারাই কল-

ঙ্কের বিস্তার অবগত হওয়া যায়। উহার কেবল অপূর্ণচ্ছায়াটি দশ সহস্র মাইল দীর্ঘ ছিল; অর্থাৎ উহা সৌরদেহের দশ কোটি বর্গ মাইল স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ইহাকে সামান্য বলিতে হইবে, কেন না এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্ক দেখা গিয়াছে। একবার একটিকে ৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ সহস্র মাইল দীর্ঘ দেখা গিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহা দুই শত কোটি বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সূর্য্যদেহে কলঙ্কের সংস্থান ভেদও বিচিত্র। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ উহা সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের সকল স্থানেই কলঙ্ক দেখা যায় না। সৌরগোলকের নিরক্ষবৃত্তের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ও নিম্নে মাত্র কলঙ্ক দেখা যায়। উহার মেরুদ্বারে কিম্বা তৎসন্নিকটে কিছু মাত্র কলঙ্ক কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যবিম্বের নিরক্ষবৃত্ত লইয়া উত্তর দক্ষিণে ৩০°।৭০° অক্ষাংশ পরিমিত মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্ক আবির্ভূত হয়।

দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যবিম্বস্থ কলঙ্কগুলি কোথায় এবং কিরূপ দেখায়, তাহা বলা গেল। কঠিন বিষয় বলিতে বাকী আছে। উক্ত কলঙ্কগুলির উৎপত্তি কিসে, এ সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কপোল-কল্পিত মত আড়ম্বর পূর্ব্বক বিজ্ঞান-সমাজে ঘোষিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদ্দ্বারা সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাও জানা যাইবে। গ্লাসগো-বাসী ডাক্তার উইলসন সাহেব বিগত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে এসম্বন্ধে এক মত ব্যক্ত করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ সার উইলিয়াম হার্শেল সাহেব তাঁহার মত স্বীকার করিয়া বলেন যে, সূর্য্যবিম্বের চতুর্দ্দিকস্থ বাষ্পরাশির আলোড়ন বশতঃ মধ্যে মধ্যে তথায় ফাঁক উৎপন্ন হয়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া সৌরদেহের কৃষ্ণবর্ণ কঠিনাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ অংশই তাঁহার মতে সৌরকলঙ্ক। উক্ত পণ্ডিতের স্বনাম-খ্যাত-পুত্র সার জন হার্শেল সাহেব উক্ত ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন, আর বলেন যে, সৌরবাষ্প-মণ্ডলে ঝটিকা উৎপন্ন হইলে উহার স্থানে স্থানে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা হউক, এ ব্যাখ্যা তত সন্তোষপ্রদ নহে। কেন না এতদ্দ্বারা সূর্য্যের প্রভূত তেজোরাশির উৎপত্তি বুঝা যায় না। সূর্য্য হইতে নিরন্তর তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, সেই তাপ ও আলোকের অবশ্য সমুচিত কারণ আছে।

বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে। তন্মধ্যে লাপলাস প্রকাশিত নেবুলা নামক সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ছিল না। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আকাশে কেবল জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ছিল। উক্ত উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে। সেই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াই সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি রূপ ধারণ করিয়াছে। সার উইলিয়াম টমসন সাহেব উক্ত মত অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন যে, বাষ্পময় সৌরদেহ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকাতেই এত তেজোরাশি বিকীর্ণ হইতেছে। বাষ্পীয় অবস্থায় যে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, বাষ্পসঙ্কোচন কালে

তাহাই তেজোরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হেলম্‌হোল্‌জ, র‍্যানকিণ, টেট প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণও এই মত সমর্থন করেন। হেলম্‌হোল্‌জ সাহেব বলেন যে, সূর্য্যের বাষ্পময় দেহের সঙ্কোচন কালে উহার বাষ্পমণ্ডলে বিশাল আবর্ত্ত উৎপন্ন না হওয়াই অসম্ভব। কেন না বিকীরণ বশতঃ সৌর বাষ্পমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শীতল ও ঘন হইতেছে। উক্ত ঘন অংশ নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও অধিকতর উত্তপ্ত বাষ্পরাশির উপর অবস্থিত হইতেছে। আমাদের পৃথিবীতেও সেই কারণ বশতঃ বাত্যাবর্ত্ত প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত ভূভাগের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু নিম্নে উত্তপ্ত হয় এবং উপরে প্রচুর বিকীরণ বশতঃ সর্ব্বদা শীতল থাকে। সূর্য্যের আকৃতি ও তাহার উত্তাপ স্মরণ করিলে সৌরবাষ্পমণ্ডলে অতীব প্রকাণ্ড আলোড়নের সংঘটন বুঝিতে বাকী থাকে না। সূর্য্যের ধাতব বাষ্পমণ্ডলে আবর্ত্ত জন্মিলে, আবর্ত্ত-কেন্দ্রের চাপ নিশ্চয়ই কম পড়িবে। তাহাতে তথায় শৈত্য উৎপন্ন হইয়া বাষ্পীয় ধাতব সামগ্রী অপেক্ষাকৃত ঘন ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং তথায় সৌরদেহাভিমুখে অতি বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত অল্পোষ্ণ বাষ্পরাশি মেঘবৎ প্রতীয়মান হইবে। অতএব সমুদায় কলঙ্কগুলি সৌর বাষ্পমণ্ডলস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর বিশেষ। অপেক্ষাকৃত অল্পোষ্ণ হওয়াতে এক একটি কলঙ্ক নিম্নস্থ অধিকতর উজ্জ্বল প্রভাময় সৌরদেহে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণবর্ণ দেখাইলেও উহা একেবারে নিষ্প্রভ নহে। প্রখর তাড়িতালোকের সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত বাতি ধরিলে বাতি যেমন নিষ্প্রভ দেখায়, তদ্রূপ কলঙ্কসকলও সৌরদেহের প্রচণ্ড আলোক বশতঃ নিষ্প্রভ দেখায়। সৌরকলঙ্ক যে সৌর-বাষ্পের আবর্ত্ত-সম্ভূত, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কলঙ্কের আকার পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা প্রমাণিত হয়। পুনশ্চ রশ্মিদর্শন-যন্ত্র ও সৌরবাষ্পমণ্ডলের ভয়ঙ্কর আলোড়নের সত্যতার অন্য প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করে।

উপরে সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সামান্যতঃ বর্ণিত হইল। কলঙ্কের উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ অপেক্ষা অল্পোষ্ণ বাষ্পরাশি তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই বাষ্পরাশির কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যভাগ হইতেই আলোক ও তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমাদের মৃন্ময় পৃথিবীর চরিদিকে যেমন বায়ুরাশি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সূর্য্যদেহের চারিদিকেও ধাতব বাষ্প তদ্রূপ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ, সূর্য্যবিম্বের চিত্র ফটোগ্রাফী যন্ত্র দ্বারা নানা মানমন্দিরে অঙ্কিত হইতেছে। তৎসমুদায় তুলনা করিলে সৌর বাষ্পমণ্ডলের অস্তিত্ব জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ রশ্মিদর্শন-যন্ত্র সাহায্যে সৌরকর জাল নিরীক্ষণ করিলে সৌরদর্শনে (Solar spectrum) অসংখ্য রেখা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত কৃষ্ণ রেখা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কীরকফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বাষ্পমণ্ডলের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সূর্য্যগ্রহণ কালে দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের বহির্দ্দিকে লোহিত আলোক অগ্নিশিখাবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়

যে, সূর্য্যবিম্বের মধ্যভাগে যাহাই থাকুক, উহার পৃষ্ঠদেশ অতীব প্রখর জ্যোতির্বিশিষ্ট। এই জ্যোতির্বিশিষ্ট বহির্ভাগের নাম দ্যুতিমণ্ডল রাখা হইয়াছে। ইহার বাহিরে আরও দুইটি আবরণ রহিয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সেগুলি বর্ণিত হইল না। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দ্যুতিমণ্ডলের বাষ্পময় গহ্বর গুলিই কলঙ্ক স্বরূপ দেখা যায়। সেই গহ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতা বশতঃ কলঙ্কের পূর্ণচ্ছায়া ও অপূর্ণচ্ছায়ার উৎপত্তি।

সৌরকলঙ্ক দ্বারা আমাদের কোন ইষ্টানিষ্ট আশঙ্কা আছে কি না, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। ইতি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বরাহমিহিরের শ্লোক, পৃথিবী নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইযাছি। হোফরাথ সোয়াবে সাহেব প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর সৌরকলঙ্ক সমান পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসর ব্যবধানে কলঙ্কের সংখ্যা অধিক দেখা যায়; অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসরে সূর্য্য নিষ্কলঙ্ক ও কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শতাব্দীর ১৮০০, ১৮১১, ১৮২২, ১৮৩৩, ১৮৪৪, ১৮৫৬, ১৮৬৭, ১৮৭৮, ১৮৮৮ বৎসরে সৌরকলঙ্ক অত্যল্প সংখ্যক ছিল। এবং ১৮০৫, ১৮১৬, ১৮২৭, ১৮৩৮, ১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৭১, ১৮৮২ বৎসরে বহু সংখ্যক বৃহৎ আকারের কলঙ্ক দেখা গিয়াছে *। এই নিয়মানুসারে এ বৎসরের প্রারম্ভে এবং গত বৎসরের সৌরকলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার কালের অবসান হইবার আশা করা গিয়াছিল। বাস্তবিক বিগত বৎসরে সৌরকলঙ্কের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, ইহাতে উক্ত চক্রাকার কাল পরিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম ধরা যাইবে কি না, সন্দেহ আছে। এই বৎসরের বিগত মার্চ্চমাসে সূর্য্যের উচ্চ অক্ষাংশে দুইটী কলঙ্ক সূর্য্যবিম্বে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, এবারের অপেক্ষাকৃত অধিককাল ব্যাপী সৌরকলঙ্কের অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বস্তুতঃ সূর্য্যবিম্বে এক্ষণে কলঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণচিহ্ন দেখা গিয়াছে। ইতি মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসেও সামান্য সামান্য কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, দুই তিন মাসের মধ্যে বোধ হয় সৌর বাষ্পমণ্ডলের ক্রিয়া-সূচক কলঙ্ক দেখা যাইবে।

সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম কাল-চক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর ঝড় বৃষ্টি শস্য ও বাণিজ্যের সম্বন্ধ দেখাইবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় বায়ুবিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্লানফোর্ড সাহেব তৎকৃত বায়ুবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মেলড্রাম সাহেব ভারত সমুদ্রের দক্ষিণাংশে এবং পোএ সাহেব ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ প্রদেশের বাতাবর্ত্ত সকলের উৎপত্তি-কাল আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে যে বৎসর সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য ছিল, সেই সেই বৎসরে বাতাবর্ত্ত অধিক সংখ্যক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন বাতা-

* এখানে বলা আবশ্যক যে, সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যায় কালের চক্রাকার (cycle) পরিবর্ত্তন ঠিক একাদশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না। ইহার কাল পরিমাণ ১১.১১ বৎসর। উপরের তালিকায় উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যায় কালের নিকটবর্ত্তী বৎসর দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয় এখানকার বাতাবর্ত্ত গুলির বিবরণ বহুদিন হইতে তাদৃশ যন্ত্র সহকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। অনেক বৎসরের বাতাবর্ত্তের সংখ্যা না পাইয়া উহাদিগের আবির্ভাব কালের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারা যায় না। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরে কিম্বা ভারতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের অপরাংশে যে সকল বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় এক শতটি বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যায় যে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (১৫টি) বাতাবর্ত্ত জন্মে। এবং ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ অব্দে একটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঐ ঐ বৎসরের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্যের কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের সহিত বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য্যের সম্বন্ধ এক্ষণে দেখা যাউক। ব্লানফোর্ড সাহেব ভারতের বৃষ্টি ও সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে বিস্তর চেষ্টা করিযাছেন। মেলড্রাম, লকিয়ার, সার উইলিয়াম হার্শেল এবং উল্ফ সাহেব ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপতনের পরিমাণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সৌরকলঙ্কের সংখ্যার সহিত বৃষ্টি পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যে যে বৎসর অধিক সংখ্যক কলঙ্ক দেখা গিয়াছে, সেই সেই বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার বৎসরে বৃষ্টিপাতও কম হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু, সার উইলিয়াম হার্শেল ও অধ্যাপক উল্ফ সাহেব অনেক বৎসরের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কেবল তাহাই নহে, সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে ও শস্যের মূল্য-হ্রাস ঘটিযাছে। সিংহল দ্বীপে এই নিয়মটি নাকি এত দূর লক্ষিত হইয়াছে যে, তথাকার সাধারণ লোক সমাজ পর্য্যন্ত তাহা অবগত আছে। দক্ষিণ-ভারতের দুর্ভিক্ষ ও সৌরকলঙ্কের অপ্রাচুর্য্য এক সময়েই ঘটিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ডাক্তার হাণ্টার সাহেব বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব ভারতের মধ্যে সিংহল, কর্ণাট প্রদেশ ও সামান্যতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে বৃষ্টিপাত ও সৌরকলঙ্কের সমকালিক আতিশর্য্য এক প্রকার স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা স্থানের বৃষ্টিপাত তুলনা করিলে সমুদায় ভারত সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিল সাহেব তথাকার শীতকালের বৃষ্টিপাতে এইরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সৌরকলঙ্কের সহিত ভূতলস্থ ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ কেন থাকিবে? ইহার উত্তরে এই দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্ব হইতে তাপ ও আলোক প্রতি বৎসর সমান পরিমাণে বিকীর্ণ হয় না। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে, সূর্য্যবিম্ব কখনও বা অধিক কখনও বা অল্প সংখ্যক এবং বিভিন্ন পরিমাণ আকারের কলঙ্কে আবৃত থাকে। বস্তুতঃ, জলীয় বাষ্প নিঃসরণের উপর বৃষ্টি পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সূর্য্যবিম্ব যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক থাকে, তখন উহা হইতে তেজঃ কম পরিমাণে

বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। এজন্য সে সময় বাষ্প নিঃসরণ ক্রিয়া ও বৃষ্টিপাত কম দেখা যায়। ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। বহু বৎসরাবধি পর্য্যবেক্ষণ না করিলে এ সকল বিষয়ে কোন সম্বন্ধ বাহির করা বৃথা। গত বৎসর সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথচ গত বৎসরে কি বাণিজ্য কিম্বা শস্য কম হয় নাই? ব্লানফোর্ড সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৌর-কলঙ্কের উর্দ্ধতম সংখ্যার কালের দুই এক বৎসর পরে বৃষ্টিপাত বেশী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, এ তত্ত্বের শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া সূর্য্যবিম্বের ফটোগ্রাফ তুলনা করিলে বোধ হয় তাহার সকলঙ্ক কিম্বা নিষ্কলঙ্ক অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। এজন্য অনেকগুলি বড় বড় মানমন্দিরে সূর্য্যের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ যন্ত্রাদি সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে দিবস সূর্য্য আকাশমার্গে দৃশ্যমান হয়, সেই দিবসেই, তাহার প্রতিরূপ চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করা হইতেছে।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর দুইটি কথার উল্লেখ না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকে। সৌরকর-জালের সহিত পার্থিব ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এতদ্দারা বুঝা যাইবে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কোন কোন ব্যাপারের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা যায়। মেরুজ্যোতিঃ (aurora) নামক যে নৈসর্গিক ব্যাপার আছে, তাহা প্রতি বৎসর সমান সংখ্যার দেখা যায় না। কোন বৎসর বা উহার সংখ্যা বেশী, কোন বৎসর বা কম দেখা যায়। বড় আশ্চর্য্য কথা যে, সৌর-কলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর ও মেরুজ্যোতির উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর প্রায় এক। ইহার চক্রও দশ হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হয়।

আর একটি ব্যাপার এই যে, সৌর-কলঙ্কের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের সহিত চুম্বক শলাকার অবস্থিতির দিক্ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একটা চুম্বকশলাকা শূন্যে ঝুলাইয়া দিলে, উহাকে প্রায় উত্তর দক্ষিণা-ভিমুখে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভূ-ভাগের কোন অংশে উহা বরাবর একই দিকে স্থির থাকে না। ইহার অবস্থানের একটি দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাতঃকালে উহার উত্তরমুখ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-দিকে এবং মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলিতে দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে এই দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন সমান পরিমাণে ঘটে না; কিম্বা প্রতি বৎসরও সমান পরিমাণে হয় না। দশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালে ইহার পরিবর্ত্তনচক্র সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক সৌরকলঙ্কের কালচক্রের সহিত মেরুজ্যোতিঃ ও চুম্বকশলাকার কালচক্রের ঐক্য লক্ষিত হয়।

অনেকে আবার মনে করেন যে, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র গ্রহের আপন আপন কক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশের অবস্থিতির সহিত, সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে। কিরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্যের পৃষ্টদেশের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, তাহা সম্যক্ জানা নাই। ডাক্তার লুমিস সাহেব মনে করেন যে, সূর্য্যের চারিদিকে প্রবল তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার মতে সৌরতেজের তাহা অন্যতর কারণ। যাহা হউক, ঐ সকল গ্রহ

সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় বিশেষ বিশেষ অংশে তাহারা সূর্য্যের উপর কার্য্য করিতে পারে। তাহাতে ঐ সকল গ্রহের ভ্রমণ কালের সহিত সৌরকলঙ্কের কাল চক্রের ঐক্য ঘটিয়া থাকে। যদিও কোন কোন স্থলে এরূপ ঐক্য ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে যে কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় তৎসমুদায় কাকতালীয় রূপে ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের জ্যোতিঃ-মণ্ডলের উপর বৃহস্পতি গ্রহের ক্রিয়ার দ্বারা সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কথাও কেহ কেহ বলেন। প্রক্‌টর সাহেব এই মত সমর্থন করিতেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সৌর-কলঙ্কের উর্দ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল, তখন বৃহস্পতি গ্রহ দূরকক্ষে অবস্থিত ছিল। বিশ বৎসর অগ্রে বৃহস্পতি গ্রহ নিকটকক্ষে ছিল, তখনও একবার সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল।

সারজন হার্শেল সাহেব একটি সৌর-কলঙ্কের যে পরিমাণ করিয়া ছিলেন, তাহার সারাংশ দিয়া এ প্রবন্ধটি শেষ করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি একটা কলঙ্কের বিস্তার পরিমাণ করি। তাহা তিন শত আটাত্তর কোটি বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল। একটার মধ্যস্থিত যে গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণচ্ছায়া দেখা গিয়াছিল, উহা এত প্রকাণ্ড যে, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের পৃথিবী অনায়াসে প্রবেশ করিয়া তাহার কোন অংশ স্পর্শ না করিয়া নির্গমন করিতে পরিত। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর চারি-দিকেও প্রায় সহস্র মাইল ব্যবধান থাকিতে পারিত। এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্কের বিবরণ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর অগ্নিময় ঝটিকা সূর্য্যদেহে বহমান হইতেছে, ইহা হইতে তাহার কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপাব, যে তদ্দারা স্থানে স্থানে আবর্ত্ত জন্মিয়া সূর্য্যপৃষ্ঠের আকার এতাদৃশ পরিবর্ত্তিত হয়।" কি প্রকাণ্ড ভাবেই সৃষ্টি স্থিতি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্য একটা সামান্য অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এত ক্ষুদ্র যে সিরিয়াস নামক একটা নক্ষত্রই দুই তিন শত সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে। সেই সকল নক্ষত্রে না জানি কি ভীষণ পরাক্রমে, কি বিশাল আকারে প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড আবার অনন্ত অসীম, তাহার রহস্যও অনন্ত অসীম।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যজাতিগণের মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহারও সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় নাটকের প্রচার ছিল।

মনুষ্যসমাজে নাটকের সৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানব জাতির

মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। বালকবালিকাদিগের মধ্যে এই অনুকরণ করিবার শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয়। বালকেরা প্রায়ই পরিণতবয়স্কদিগের আচার ব্যবহারাদি অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহারা কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন পিতা, কখন অধ্যাপক প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া সবিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রায় প্রত্যেক ক্রীড়ার সহিত সংসারের গুরুতর ব্যাপার সমূহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেশীয় ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা পুত্রীকৃত মৃৎপুত্তলের বিবাহ সম্পাদন কার্য্যে কতই বিব্রত, তাহার নিমন্ত্রণের ঘটাই বা দেখে কে। মানবজাতির এই অন্তর্নিহিত অনুকরণী প্রবৃত্তি, অনন্ত ঘটনাপূর্ণ মানবজীবন এবং অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ব্যাপ্তি এবং উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এবং ইহাই কালক্রমে নানারূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ প্রীতিপ্রদ, অত্যুৎকৃষ্ট আমোদ-প্রদান-সমর্থ নাটকাভিনয় ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কেবল আর্য্য জাতির মধ্যেই নাটকের বহুল প্রচার দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে স্বাধীনভাবে নাটকের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন রোম হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি সমগ্র ইয়োরোপ গ্রীসের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতিকে নাটকাভিনয় প্রথা শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে নাটকের প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেমিটিক জাতির মধ্যেও নাটক নাই। আরব এবং হিব্রু-জাতিরা এক সময়ে সভ্যতার অত্যুন্নত সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই। হিরোডোটস প্রাচীন মিশরবাসিদিগের সভ্যতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাহাদের আচার, নীতি এবং সামাজিক অবস্থাদির অনেক সূক্ষ্ম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকের অভিনয় হইত, এরূপ কোন আভাষ দেন নাই। পক্ষান্তরে চীনজাতির প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সহিত আহাদের উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, কোন কোন অনুকরণপ্রিয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও, এক প্রকার সামান্য রকম অসভ্যোচিত যাত্রাভিনয়ের ন্যায় নাটকাভিনয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত মনুষ্যের স্বাভাবিক অনুকরণী প্রবৃত্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কেবল কয়েকটা জাতির মধ্যে নাটকের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা অবশিষ্ট দেশগুলিতে নাটকের উৎপত্তি হয়নাই, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নাটকাভিনয় প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহারা সভ্যজাতিবৃন্দের শীর্ষ স্থানীয়, এবং জাতি সাধারণের অবশ্য পূজনীয়।

যতদূর অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃত্য গীত হইতেই নাটকের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'নাটক' শব্দটী, 'নৃত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নৃত্য' এবং 'নাট্য', 'নর্ত্তক' এবং 'নটন' উভয় একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গসঞ্চালনাদি এবং সঙ্গীতের সমাবেশ; পরে হস্তাদি সঞ্চালন এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির সহিত স্বাভাবিক ভাষায় কোন পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা; তৎপরে যাত্রাদির ন্যায় কথোপকথন এবং সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এবং সর্ব্ব শেষে প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি; এইরূপ ক্রমবিস্তারেই নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে নাটকের কয়েকটী বিভিন্ন স্তর স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, সাধারণতঃ নাটকের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অবস্থা, রামায়ণ কিম্বা মহাভারত অথবা অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ইহাকে সাধারণতঃ "কথা" বলে। "কথক" ঠাকুর রামায়ণাদির অংশ বিশেষ সুর করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তিনি রামের কথা, রাবণের কথা, অথবা হনুমান প্রভৃতির কথা, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ সুরে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে ব্যক্ত করেন। এই স্থানেই আমরা নাটকাভিনয়ের অঙ্কুর দেখিতে পাই। দ্বিতীয় স্তর, আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়। ইহাতে নাটকের প্রধান প্রধান উপকরণ কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই পরিলক্ষিত হয়, কেবল অভিনয় ক্রিয়া, কবিত্ব প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ইহারই অব্যবহিত পরে, পূর্ণ নাটকের সৃষ্টি; উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট চিত্র এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বের একত্র সমাবেশ; বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের যুগপৎ পরম পরিতৃপ্তি।

জাতীয় সভ্যতার সহিত নাটকের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নত অবস্থাতেই নাটকের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক সুসভ্যজাতির মধ্যে এমন এক সময় আসে, যে সময়ে নাটকের স্বাভাবিক সৃষ্টি হইয়া থাকে। নানা প্রকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং উন্নতির চেষ্টার সময়ে নাটক এবং নাটকাভিনয় প্রথার সৃষ্টি হয়। দুই একটী সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাটী স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের পরম সৌভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজ জাতির নাটকের সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় ইংরেজ জাতি উন্নতির চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উদ্যমশীলতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধি সুখ এবং শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজেরা তখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, নূতন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। স্প্যানিস্ আর্ম্মাডার (Spanish Armada) পরাজয়ে ইংরাজের বাহুবল অতুলনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকের কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্ম করিবার বাসনার সহিত চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইল। কেহ আমেরিকায় নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিল; কেহ ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ অন্বেষণ করিতে চলিল; কেহ বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে গিয়া সহস্র প্রাণীপূর্ণ অর্ণবযান সহিত অতল জলে ডুবিয়া গেল। এইরূপ নানা প্রকার "ঘাত প্রতি-

ষাতের” মধ্যে ইংরাজের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হইল। জাতীয় প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি ক্রমে নাটকীয় হইয়া পড়িল। প্রথমে অসম্পূর্ণ নাটক ‘Mysteries”, ‘Moralities”, “Interludes”, প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। পরে নাটক গুরু সেক্সপীয়ার এবং তাঁহার সমসাময়িক নাটককারগণ কর্ত্তৃক নাটকের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি হইল। প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটক সৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসবাসীগণ পারস্যাধিপতি জেরাক্সিসের ৫০ লক্ষ সেনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। তাহাদের বাহুবল তখন অসীম। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিস্ এথেন্সের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার শাসনগুণে এথেন্সবাসিদিগের সুখের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাহারা শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার সুকুমার শিল্পে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তখন তাহাদের অদ্ভুত উদ্যমশালিতা ছিল। এইরূপ সময়েই এথেন্সে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ধর্ম্মমন্দিরে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত যাত্রাদি হইত। পরে এস্কিলিস্, সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্, এরিষ্টফেনীস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা নাটকরচয়িতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যাবলী রচনা করিয়া রাজকোষের ব্যয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডল সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শন করাইতেন; এবং আপামর সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থনিচয় অদ্যাপি তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নাটক সভ্যতার একটি অঙ্গ। যে দেশ প্রাচীন কালে নাটকীয় সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশ যে সেই সময়ে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শত শত প্রমাণ আছে; প্রাচীন ভারতে নাটকীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, অন্যতম একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুশীলনে আমাদের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ইহাদের অনেকগুলি, সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, প্রকৃত কবিত্বের খনি। কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলি কিরূপ অলৌকিক কবিত্বরসে পরিপূর্ণ, কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের চিত্তবিনোদন এবং উপদেশ প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন নাটকের আলোচনায় আমাদের আর একটি গুরুতর লাভ আছে। আমাদের প্রাচীন কালের কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজের অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের প্রাচীন নাটকগুলি অনেক পরিমাণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। ইতিহাস শুদ্ধ ঘটনাবলীর শৃঙ্খল নহে; অথবা রাজবৃন্দের জীবনীও নহে। এলিজাবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার পিতার নাম ৮ম হেন্‌রী, তাঁহার পিতামহের নাম ৭ম হেন্‌রী; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে হইয়াছিল; এইরূপ কয়েকটি বিবরণ অবগত হইলেই ইতিহাস জানা হইল

না। জাতি, জাতীয়তার সংগঠন, জাতির উন্নতি, জাতির সমৃদ্ধির বিবরণ এবং জাতীয়ত্বের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় লইয়াই প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। হিন্দুজাতির এই সকল বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদের প্রাচীন কালের নাটকীয় সাহিত্য অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সমাজের অবস্থা, প্রভৃতি সমস্তই এই নাটকাবলীতে বর্ণিত আছে। নাটকে কল্পিত চরিত্রের সমাবেশ হইলেও, এমন কোন নাটক হইতে পারে না, যাহাতে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী অথবা সামাজিক অবস্থার ছায়া প্রতিফলিত হয় না।

এক্ষণে আমরা হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ প্রযোগ করিব।

আমাদের দেশের কতকগুলি প্রথা এত প্রাচীন যে, তাহাদের প্রথম উৎপত্তি ঠিক্ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। অনেক সময়ে এই প্রথাগুলি দৈবসম্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এবং কখন কখন এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক উপন্যাসও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই প্রথা ঠিক কোন্ সময়ে কত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। এতৎ সম্বন্ধে প্রচলিত উপন্যাসটি বড়ই চমৎকার বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে তিনিই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন; বাহু হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন, উরু হইতে বৈশ্য হইলেন, এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিলেন (১)। এই উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথা একেবারে সৃষ্টির সমসাময়িক হইল, এবং ইহার প্রাচীনত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই উপন্যাসের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটি সত্য পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ প্রথা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই উপন্যাস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হয়। এইরূপ, অধিকাংশ অতি প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে, প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ উপন্যাস প্রচলিত আছে। প্রথম নাটক দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গে অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতনামা মুনি। স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী নাটক রচয়িত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, অপ্সরাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটকে এইরূপ একটি গল্প আছে। বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়ের একটি কথোপকথন আছে। তাহাতে এক শিষ্য অপরকে স্বর্গে গুরু-প্রবর্ত্তিত নাটকাভিনয়ের বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে লাগিলেন, তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সরস্বতী দেবী প্রণীত "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নামক নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন। অভিনয় হইতেছিল, দেবগণের সমক্ষে; আর

(১) বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ জাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্র জাতয়ঃ।

অভিনয় করিতেছিলেন, প্রথিতনাম্নী উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ। উর্ব্বশী লক্ষী-চরিত্র এবং মেনকা বারুণীচরিত্র অভিনয় করিতেছিলেন। বারুণী (মেনকা) লক্ষীকে (উর্ব্বশীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, সমবেত সকেশব লোকপালগণের মধ্যে কে তোমার মনোমত বলিয়া বোধ হয়। উর্ব্বশীর বলিতে হইবে "পুরুষোত্তমে"। উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে প্রাণদাতা পুরুরবার ভুবনমোহনরূপে উন্মাদিনী; পুরুরবার নাম তাহার জপমালা। উর্ব্বশী নাটকাভিনয় ভুলিয়া গেল; নিজের মনের কথা বলিয়া ফেলিল, নামের আদ্যক্ষরদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিল "পুরুরবসি"। স্বপ্রবর্ত্তিতশাস্ত্রের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া উপাধ্যায় উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন, "তোর দিব্য জ্ঞান নষ্ট হইবে।" উর্ব্বশীর শাপে বর হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পুরুরবার মহিষী করিয়া পাঠাইলেন। বোধ-হয়, নাটক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই উপন্যাসটি নাটকের প্রাচীনতারও সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার আরো একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। কোন একখানি নাটক মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে সেই নাটক হইতেই তাহার প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা মৃচ্ছকটিক নামক (১) প্রাচীন নাটক হইতে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে নাটককারদিগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকে; অন্তত তাহাতে সমাসবদ্ধ বিশেষণসংযুক্ত গ্রন্থকারের নামটি জানা যায়। মৃচ্ছকটিকে নাটকরচয়িতার কিছু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি গজেন্দ্রগতি, চকোরনেত্র, চন্দ্রানন, রূপবান, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং অপরিমিত বলশালী ছিলেন। তাঁহার নাম শূদ্রক ছিল। তিনি ঋক্ এবং সামবেদ, গণিতশাস্ত্রে এবং নৃত্যগীতাদি ললিতকলা এবং হস্তিশিক্ষা প্রভৃতিশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দশদিনাধিক শতবর্ষ বয়সে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-ব্যসনী, অপ্রমত্ত, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, তপোধন এবং বাহুযুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। কিন্তু এতখানি বর্ণনার মধ্যে, তিনি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহার নামগন্ধটি পর্য্যন্ত নাই। রাজাশূদ্রক কোন্ দেশের রাজাছিলেন, কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভৃতি তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলেই তদীয় গ্রন্থের সময় নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শূদ্রকনামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজগণের প্রথম রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ২ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক অবন্তী রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং এই

(১) প্রচলিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

রূপে তিনি খ্রীষ্টজন্মের দুই অথবা তিন শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই শূদ্রকরাজা এবং মৃচ্ছকটিকের নাটককার প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়না। এই সকল আনুমাণিক কথা ছাড়িয়া দিলা আমরা প্রস্তাবনোক্ত বিবরণে একটি অপেক্ষাকৃত সারবত্তর কথা পাই না। তিনি "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" এই কথাটি গ্রন্থের অতিশয় প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা মহাপাপ।" কিন্তু অতি প্রাচীন কালে মনুসংহিতাদি সংগৃহীত হইবার সময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে শরভঙ্গ নামক ঋষির এইরূপ অগ্নি প্রবেশের কথা আছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আদিম অবস্থায় এবং কলিযুগ প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে, এই নাটক লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য গ্রন্থকারের অগ্নি প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু সমাজে দমনীয় বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই; এবং এই জন্যই প্রস্তাবনা-লেখক (১) অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রন্থ মধ্যে এই কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রমাণদ্বয় এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক।

প্রায় প্রত্যেক নাটকে শকার অথবা রাজশ্যাল বলিয়া একটি চরিত্রের সমাবেশ থাকে। শকার অনেকটা ইংরাজি clown এর (ভাঁড়ের) সদৃশ। শকার সাধারণতঃ রাজরক্ষিত বলিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত, মূর্খ, ভীরু, এবং দুর্ব্বলের উৎপীড়ক। তাহার কথা হতোপম, পুনরুক্ত, এবং লোক ন্যায়-বিরুদ্ধ। মৃচ্ছকটিকের শকার সংস্থানকও এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ারত। স্বাস্থরূপ সঙ্গিসমভিব্যাহারে বসন্তসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া শকার মহাশয় রামায়ণ এবং মহাভারতের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, এবং নিজের অদ্ভুত এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কতকগুলি শ্লোকে, রাবণবশীভূতা কুন্তী, হনুমানের সুভদ্রাহরণ, রামভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন, চাণক্য কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত ইতিহাসজ্ঞতার পরিচয় আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সংস্থানক শুদ্ধ রামায়ণ, এবং মহাভারত হইতে কেন উদাহরণ তুলিল, এবং পুরাণাদি হইতে কেন একটিও উদাহরণ গ্রহণ করিল না। গ্রন্থকার অবশ্য মহামহোপাধ্যায় এবং অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি চাণক্যের কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের নাম একেবারেই করেন নাই, তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ দেখা যায় না। এই জন্য ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, পুরাণাদির পূর্ব্বেই এই নাটক লিখিত হইয়াছিল; এবং তখন পর্য্যন্ত পুরাণসমূহের একেবারেই

(১) সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস নাটককার স্বয়ংই প্রস্তাবনায়, সূত্রধারের মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ ধারণা সত্য হইলে মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনা বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং কি করিয়া লিখিলেন, তিনি ১০০ বৎসর ১০ দিন বাঁচিয়া মরিয়াছিলেন। একজন টীকাকার বলেন, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে তিনি ভবিষ্যৎকে অতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই টীকাকারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেই সহজে অনুমানকরিতে পারেন যে, প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই প্রস্তাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির লিখিত।

সংগ্রহ হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহাদের বহুল প্রচার হয় নাই। চাণক্যের নামোল্লেখ থাকাতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই নাটকের প্রাচীনত্বের আর একটি দৃঢ় প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন মাত্রই স্বীকার করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তেজঃপ্রভাবে তাৎকালিক হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারই অভ্যুদয়ালোকে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতেতিহাস স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম দিগন্ত-ব্যাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সময়ে সময়ে বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন করিয়া স্ব স্ব সময়ের প্রকৃত ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক অভিনব ঐতি-হাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণা-বলী পাঠ করিলে, অনেক ঐতিহাসিক ঘট-নার সময় নির্দ্দেশ করা যায় এবং জাতীয় রীতি নীতি এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায়। মৃচ্ছকটিকের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যা-সিদিগের বৃত্তান্ত আছে। যেরূপভাবে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের তখন হীন অবস্থা ছিল না। এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধেরা তখন একটি সবিশেষ পরিচিত এবং ক্ষমতা-শালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত অথবা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ অবস্থা ছিল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এই ধর্ম্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক এক খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অতি প্রাচীন হইলেও ইহাতে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। অতি কৌশলে ইহাতে দুইটি বিভিন্ন উপন্যাস সংমিশ্রিত হইয়াছে। অতি কৌশলের সহিত নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে Plot-interest (1) বলে, তাহাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

(1) উপসংহারৌৎসুক্য।

সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর নাটক লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমান সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের‍ও অনেক পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে নাটকের প্রচার ছিল, নিম্নে তদ্বিষয়ে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ভগবান্ পাণিনির ব্যাকরণে নাটকের প্রাচীনতার পরিচায়ক একটি সূত্র আছে, সে সূত্রটি এই, "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনট সূত্রয়োঃ"। এইটি "ণিনক্" প্রত্যয়ের বিধায়ক একটি সূত্র। পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষুসূত্র যাহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "পারাশরিণঃ ভিক্ষরং" এবং শিলালিমুনি প্রণীত নটসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগকে "শৈলালিনোনটাঃ" বলা হয়। এই সূত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাণিনির পূর্ব্বে শিলালি নামক এক জন মুনি ছিলেন, এবং তিনি নাটক শাস্ত্রের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে নাটক প্রথা শুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক অধ্যয়নীয় শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এক্ষণে পাণিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই হিন্দু নাটকের অতি প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম পণ্ডিত অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর "নির্ব্বাণোহবাতে" * প্রভৃতি পাণিনি সূত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি বৌদ্ধধর্ম্মাভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের এই মত এক্ষণে প্রচলিত মত হইয়াছে। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বৎসরের‍ও অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটকপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে আমাদিগকে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে নাটকের প্রচার ছিল। ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নাটকের প্রচার ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি, মহাভারতে পর্য্যন্ত নাটক প্রথা প্রচলনের আভাষ পাওয়া যায়। এই সকল এবং নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বল।

ভিখারী।

(১)

আমিও তোদেরি একজন—
আমিও শৈশব-সুখে
বেড়েছি মায়ের বুকে;
আমিও বাবার কোলে পেয়েছি যতন;
আমিও কিশোর বেলা

* পাণিনির এই সূত্রদ্বারা বায়ুশূন্যতা অর্থে নিঃ পূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" স্থানে "ন" হয়। বৌদ্ধদিগের অপবর্গবাচক "নির্ব্বাণ" শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। এমন কি "নির্ব্বাণদীপ" প্রভৃতি স্থানে "নিবে যাওয়া" অর্থে পাণিনি "নির্ব্বাণ" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কাত্যায়নের বৃত্তিতে এবং পতঞ্জলি ভাষ্যেতেই এই "নিবে যাওয়া" অর্থ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই গোল্ডষ্টুকার অনুমান করেন, শাক্যজন্মের পূর্ব্বেই পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

খেলেছি সাধের খেলা,
আমারো সোহাগ ছিল "সোণা, যাদু, ধন",
আমিও তোদেরি একজন।

(২)

আমিও তোদেরি একজন—
আমারো, ভুলাতে জ্বালা
পরিয়া মুকুতা মালা,
সরল তরল ঊষা দি'ত দরশন,
নিতুই সাঁঝের করে
হাসিত আমারো ঘরে
উজল সুধাংশু খানি সোণার বরণ।
আমিও তোদের একজন।

(৩)

আমিও তোদেরি একজন—
প্রকৃতি আমারে হাসি
পরিত ভূষণ রাশি,
উছলি পড়িত ছটা মধুর মোহন।
শ্যামল রসালে থাকি
গাহিত আমারো পাখী,
ফুটিত আমারো যূথি জাতি বেলিগণ।
আমিও তোদের একজন!

(৪)

আমিও তোদের একজন—
আমারো এ বুক ময়
কত কি উচ্ছ্বাস রয়,
তরঙ্গে তরঙ্গ ছোটে করি গরজন,
আমারো মরমে সাধ,
(মেঘেতে লুকানো চাঁদ)
আমরো হৃদয় আছে, আছে প্রাণ মন।—
আমিও তোদেরি একজন!

(৫)

আমিও তোদেরি একজন—
আজি আমি বড় একা,
কেউ নাহি দেয় দেখা,
খুঁজিতেছি দো'রে দো'রে আপনার জন;
শত দূর, শত পর,
শত দুখে মর মর।
তোরা কি আমার কেউ হবি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন।

(৬)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা যে দেবের শিশু,
আমি নীচ, হীন, পশু,
আমারে দিবি কি তোরা মানুষ জীবন?—
বিন্দু বিন্দু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখা'বি কি যা দেখিলে হয় না মরণ?
আমি ও তোদেরি একজন?

(৭)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা আলোকের পাখী,
আমিই আঁধারে থাকি,
কখন চেনেনা আঁখি আলোক কেমন।
পতিত এ হীন প্রাণ
তোরা কি করিবি ত্রাণ,
তোরা কি আমার কেউ হ'বি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন।

(৮)

আমিও তোদেরি একজন—
তোদের জনম যেথা
আমিও হয়েছি সেথা,
তবে যে ভিখারী আমি কপালে লিখন!
থাকি এই অন্ধকারে,
অন্ধ কূপ কারাগারে,
হাসেনা রবিটি হেথা বহেনা পবন!—
আমিও তোদের একজন!

(৯)

আমিও তোদেরি একজন—
আজ যে জীবনে মরা,
কালিমা মরিচা ধরা,
আঁধারে আঁধারে হায় নিবিছে জীবন।—
তোদের সুখের বাস,
আলো সেথা বার মাস,
তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন কানন।
পারিজাত ফুল ফোটে,
মন্দাকিনী নিতি ছোটে,
নিশিতে চাঁদিমা হাসে ঊষায় তপন!—
সব ভাই সব বোন,
সবে আপনার জন,
একটী ভিখারী নাই আমার মতন।
আমিও তোদের একজন!

(১০)

আমিও তোদের একজন—
তোরা কি আমার হবি,
"আমারে" আমার ক'রি,
ঘুচাবি এ পরাণের জ্বলন্ত বেদন,
অণু অণু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখাবি কি দেবদেশ মধুর কেমন,
তোমাদের পিছু পিছু,
আমি কি পারিব কিছু,
জীবনের "মহাব্রত" করিতে সাধন,
আমারে কি ভিক্ষা দিবি, অমরজীবন?
আমিও তোদের একজন।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ধন-বিজ্ঞান (২)

ধনোৎপত্তি।

ধনের উৎপত্তি ৩ প্রকারে সংঘটিত হয়, (১) প্রাকৃতিক জড়পদার্থ হইতে, (২) মূলধন হইতে ও (৩) শ্রম হইতে। এই ৩টী মিলিত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(১) প্রাকৃতিক জড় পদার্থ—এই শ্রেণীর মধ্যে ভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থের আদান প্রদান হইতে পারে, তৎসমুদয়ই ইহার অন্তঃপাতী। মনুষ্য মাত্রেরই ভূমির আবশ্যকতা অপরিহার্য্য, কারণ অবস্থিতি করিবার জন্য সকলেরই একটু স্থানের প্রয়োজন হয়, তার পর পৃথিবীতে স্বভাবতঃ যে সকল আহারোপযোগী দ্রব্য জন্মে,তাহার দ্বারা বহু সংখ্যক মনুষ্যের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য মানুষ কেবল অবস্থিতি করিবার স্থান পাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, শস্যোৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভূমির আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়া আস্তে আস্তে ভূমি ধনোৎপত্তির একটা মুখ্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

(ক) সান্নিধ্য,(খ) সাধ্যত্ব,(গ) ফলশালীত্ব ও (ঘ) প্রতিদ্বন্দিতা ভেদে ভূমির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

(ক) সান্নিধ্য:—যদি আবশ্যকীয় ভূমি মূল্যবান ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে, কারণ

যে সকল হেতুতে প্রথম ভূমি মূল্যবান হইয়াছে, দ্বিতীয় ভূমিতেও সেই সকল হেতু বিদ্যমান আছে।

(খ) সাধ্যত্বঃ—যে উদ্দেশ্যে ভূমিগ্রহণ করা যায়, সহজে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিলে সেই ভূমিকে সাধ্যত্ব-গুণ সম্পন্ন বলা যায়। কোন কোন স্থলে জঙ্গল কাটিয়া গর্ত্ত বুঁজাইয়া খাল কাটিয়া, গাথনি ভাঙ্গিয়া ভূমিকে প্রয়োজনসূচক করিয়া লইতে হয়, এরূপ স্থলে অবশ্যই ভূমির মূল্য কম হইয়া থাকে। কিন্তু অনায়াস ব্যবহার্য্য হইলে তাহার মূল্য অধিক হয়।

(গ) ফলশালীত্বঃ—একই ব্যয়ে কোন ভূমিতে প্রচুর ও কোন ভূমিতে অল্প জন্মে, সুতরাং যে ভূমিতে সহজে অধিক উৎপন্ন হয়, তাহারই অধিক আদর হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলশালীত্ব অনুসারে ভূমি ধনোৎপাদনে সমর্থ হয়।

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা :—কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, একই ভূমিখণ্ড বহু ব্যক্তির লইবার আবশ্যক হয়; এরূপ স্থলে গ্রাহকের আধিক্য প্রযুক্ত প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে একরূপ নীলাম চলিতে থাকে, তাহাতে ভূমির মূল্য বাড়িয়া যায়, কাজে কাজেই ভূমি অধিক উৎপাদনে সমর্থ হইয়া উঠে। জন সংখ্যার বৃদ্ধিই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কারণ; চেষ্টা দ্বারা স্থান বিশেষের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভূমির মূল্য বাড়ান যায়।

কোন ভূমি দ্বয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারণ করিতে হইলে বিচার্য্য গুণ ব্যতীত অন্য সমস্ত গুণ উভয় পক্ষে তুল্য করিয়া লইতে হয়, ইহা ভিন্ন বিশুদ্ধ মীমাংসায় উপনীত হইবার কোন উপায় নাই।

(২) মূলধন :—ধনের সেই মূল অংশকে ধন বলা যায়, যাহা আবশ্যকীয় ব্যয় সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পারা যায়। তুমি এক মাস খাটিয়া নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণাদি সম্পন্ন করিয়া যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পার, তাহা তোমার সেই মাসের মূলধন। ইহা অর্থ ও মুদ্রা, উভয় প্রকারের বলা যাইতে পারে। মূলধনের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রামিককে শ্রমকার্য্যে পরিপোষণ করা।

মূলধন দুই প্রকারের হইতে পারে; যে মূলধন একবারে ব্যবহারে শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ একবার ব্যবহার করিলে সেই আকারে পুনবায় ব্যবহার করা যায় না; তাহাকে ভ্রাম্যমান মূলধন কহে, আর যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ ধনের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্থাবর মূলধন কহে। অন্ন ইন্ধন ভ্রাম্যমান মূলধন; তাঁত, বাইশ, নেহাই স্থাবর মূলধন। ভ্রাম্যমান মূলধনের মূল্য উহার ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেই ধন, ও উহার নিয়োগে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাও লভ্যাংশ, কিন্তু স্থাবর মূলধনের মূল্য মূলধনের কিয়দংশ ও উহার ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ। ভ্রাম্যমান মূলধনের উৎপন্ন তৎক্ষণাৎ একবার ব্যবহারে হস্তগত হয়, কিন্তু স্থাবর মূলধনের উৎপন্ন যত কাল উহা ব্যবহার করা যায়, ততকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে।

বিলাস দ্রব্য সকল কোন মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহার উৎপাদনে যে মূলধন নিয়োগ করা যায়, বিলাস পদার্থ গুলি সেই মূলধনের রূপান্তর মাত্র, বিলাস দ্রব্যের ক্ষয়ের সহিত সেই মূলধনেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। কেহ হয়ত

বলিবেন যে, বিলাস দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যখন লাভ হয়, তখন উহা মূলধন নহে। ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, বিলাস দ্রব্য স্বয়ং যখন কোন শ্রমের পরিপোষক নহে ও অন্য শ্রমের উৎপাদক নহে, অথচ ক্ষয়েই উহার পরিসমাপ্তি হয়, তখন উহা কদাচ মূলধন শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

ভাব, একজন লোক গহনা প্রস্তুত করিতেছে ও একজন লোক দা গড়িতেছে। এ স্থলে গহনাটা বিলাস দ্রব্য, উহা যে ব্যবহার করে, তাহার শ্রমকার্য্যে কোন অতিরিক্ত যোগ্যতা লাভ হয় না এবং উহাকে কোন উৎপাদক ভাবে ব্যবহার করাও যায় না; সুতরাং উহা মূলধন শব্দের বহির্ভূত, কিন্তু দা মূলধন, কারণ উহা ঘরামীর উপার্জ্জনের সহায়। কিন্তু এরূপ যদিও নির্দ্দেশ করা হইল, তাই বলিয়া বিলাস দ্রব্যকে একেবারে নিষ্ফল বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাতে কথকগুলি লোকের জীবিকা লাভ হয় এবং কোন কোন স্থলে শ্রামিকদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহিত করিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। কিন্তু বিলাস দ্রব্য যখন স্বদেশজ হয়, তখন তাহার এই এক গুণ থাকে, বিদেশীয় হইলে তাহার ফল কোন প্রকারে শুভজনক নহে। ভাব, কাবুল যদি আমাদিগের নিকট ক্রমাগত আতর বিক্রয় করে, তাহা হইলে অনুৎপাদক আতরের বিনিময়ে আমাদিগের ধন ক্রমাগত কাবুলে যাইতে থাকে। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ নিঃস্ব হই; কিন্তু যদি আতর-ওয়ালা কাবুলীকে আতরের বিনিময়ে বাজি দিয়া বিদায় করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের কোন অনিষ্ট হয় না। *

মূলধনকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিলে উহা অনুৎপাদক হইয়া যায়। টাকা পুঁতিয়া রাখা, অচলভাবে সঞ্চয় করা ও গহনা করা এই কারণে দূষণীয়। আজকাল গহনার বিরুদ্ধে অতি গভীর প্রতিবাদের স্বর শুনিতেছি, কিন্তু গহনা দ্বারা ধনকে অনুৎপাদক অবস্থায় রাখা হইলেও এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা দূষণীয় বলিতে পারি না, কারণ ইহা সকলেরই বুঝা উচিত যে, মূলধন, ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকিলেই লাভ হয় না, উহা উৎপাদক ভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া চাই। যাহারা গহনা প্রথার দোষারোপ করেন, তাহারা গহনার মলধন নিয়োগের কোন প্রশস্ত পথ দেখান না। সেভিংব্যাঙ্কে কোন কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের দুই বৎসরের মুনাফার পরিমাণ টাকা আমানত হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট চলিয়া যাইতে চাহিলে পায়ে তৈল দিয়া দুই বৎসর রাখিতে পারিবে কি? কেহ কেহ হিন্দু টি কোম্পানী প্রভৃতি দুই চারিটী কোম্পানীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মূলধন নিয়োগের প্রশস্ত পথ দেখান, কিন্তু তাহাতে কটা টাকা খাটিতে পারে, তাহা তলাইয়া দেখেন না।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি যে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমরা এক্ষণও যেমন নিরেট মূর্খ, তখন গহনা প্রথা আরও খরতর বেগে চলা আমাদিগের পক্ষে অশেষ রূপে কল্যাণকর। অর্থ সকল যেরূপ খরতর বেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান হইতেছে,

* এই কারণে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে আমরা অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। ইংলণ্ডের নিকট খেলনা, পমেটম, ব্র্যাণ্ডি লইয়া তদ্বিনিময়ে গম তুলা পাট এই সকল দ্রব্য দিতেছি।

তাহাতে এই গঠনাগুলি অর্থাকাবে রূপান্তবিত কবিলে স্বল্প-দিনেই আমাদিগেব অজ্ঞাতসাবে উহা পশ্চিমেব পুষ্টি সাধন কবিবে।

পরাধীন জাতিব ধনাগমেব দ্বাব সহজে প্রসাবিত হইতে পাবে না। লোকে বাজ্য জয় কবে, শাসন কবে কিঞ্চিৎ পাইবাব নিমিত্ত। ইংবেজ জাতি অবশ্য মানুষেব সমষ্টি, ইহাদিগেব লক্ষ্যও যে তাহাই, তাহা আব বলিবাব অপেক্ষা কি? সুতবাং মানুষেব আশা যেমন স্বভাবত উত্তবোত্তব বৃদ্ধি হয়, ইহাদিগেব আশাও সেইরূপ উত্তবোত্তব বৃদ্ধি না হইবে কেন? যত দিন পাইবাব সহজত্ব থাকিবে, ততদিন আশা বৃদ্ধি পাইবে। যখন দুঃখেব দুঃসহনীয়তায একান্ত ব্যথিত হইয়া এ দেশের লোকেবা অর্থ নির্গমেব পথেব প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কবিবে, তখন আমাদিগেব শুভ দিনেব সূচনা হইবে। তাবপব যখন কেবল দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাক্ বিতণ্ডা আবম্ভ কবিবে, তখন ইংবেজেব আশা সমত্বকক্ষ পবিত্যাগ কবিয়া ক্ষয় হইতে থাকিবে। যখন ক্ষয়েব সূচনা হইবে, সেই সময় জানিবে, এদেশেব কায্যাবম্ভেব শুভ যোগ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবেন, এক্ষণ কোন্ কাল যাইতেছে, তদুত্তবে আমি এই বলিব যে, এক্ষণ দৃষ্টিব কাল যাইতেছে, ইহাব সম্পূর্ণতা হইলে বাদানুবাদ কাল, তৎ পবে কর্ম্ম কাল আসিবে।

এক্ষণ শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যেব অসময বলিয়া, কেহ ইহা আমার উদ্দেশ্য মনে করিবেন না, এক্ষণ কাজ করিতে হইবে না। কাজ অবশ্যই কবিতে হইবে, কাল দোষে ফল অল্প হইবে, এই মন্ত্র স্মর্ত্তব্য।

(৩) শ্রমঃ—শ্রম ব্যতিবেকে প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার্য্য হয না; ক্ষেত্র শ্রম প্রয়োগ দ্বাবা শাসিত হইলে ফল প্রদান কবে, মূলধন শ্রম যোগে পবিচালিত হইলে লাভ উৎপাদন কবে। যে কোন দ্রব্য কেন উৎপাদন কবিতে যাওনা, দেখিতে পাইবে, শ্রম তাহাব একটা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

শ্রম ত্রিবিধ (ক) মানসিক (খ) বাচনিক, (গ) কায়িক।

(ক) মানসিক,—মানসিক বৃত্তিব পবিচালন দ্বাবা বিষয় সকলেব যথার্থ তত্ত্ব অবধাবিত হয। যে ব্যক্তি বা জাতি এই বৃত্তিব অনুশীলনে তৎপব, সেই বুদ্ধি জগতে পূজনীয় হইয়া থাকে। লোকে মানসিক শ্রমেব দ্বাবা যেরূপ লাভবান হয়, এরূপ অন্য কোন প্রকাবে হয না, কিন্তু কোন্ ব্যক্তিব কোন্ বিষয়ে মানসিক বৃত্তি পবিচালন বিধেয়, তাহা ব্যক্তিবাই স্ব স্ব শক্তি অনুসাবে নির্ব্বাচন কবিয়া থাকে, যে দেশে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আছে, সেখানে ব্যক্তি দিগেব মনোবৃত্তি অনুসাবে বিষয় বিশেষে প্রবেশেব জন্য সুন্দব সুন্দব বন্দোবস্ত আছে।

সচরাচব মানসিক শ্রমেব ফল যাহাব মন, সেই ভোগ কবে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লোকেবা আদর্শ হইতে জ্ঞান লাভ কবিয়া থাকেন। এজন্য সচ্চিন্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস কবেন, তাহাব চতুর্দ্দিগের লোক তাহার বুদ্ধি বৃত্তি হইতে জ্যোতি লাভ কবিয়া হানি সকল পবিহাব কবিতে ও লাভ সকল বৃদ্ধি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

(খ) বাচনিক;—বাচনিক শ্রম মানসিক শ্রম প্রকাশেব দ্বার স্বরূপ, উহা আবার দ্বিবিধ (১) কথিত ও (২) লিখিত। সঙ্গত ও সংযত বাক্য বলা মনীষীদিগের একটী অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা দ্বারা জগতের অশেষ

প্রকারের হিতাহিত সর্ব্বদা সংঘটিত হই-তেছে। বিচারকেরা মীমাংসা লিখিয়া, উকীলেরা অনুকূল প্রতিকূল কথা বলিয়া, চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বদা সংসারের শান্তি বিধান করিতেছেন। লোকে ইহা-দিগের শ্রমের মূল্য দিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করে।

যে দেশ যেরূপ সভ্য, সে দেশে সেই রূপ সুকথিত ও সুলিখিত বাক্যের আদর হইয়া থাকে। তুমি যদি কাহাকেও বুঝা-ইতে পার যে, একটী দেশের লোক সংখ্যার সহিত সেই দেশের প্রচলিত সংবাদ পত্রের যে অনুপাত, অপর একটী দেশে তদপেক্ষা উচ্চ অনুপাত দৃষ্টি করিয়াছ, তাহা হইলে তোমার শ্রোতা অতর্কিত রূপে এই মীমাং-সায় উপনীত হইবেন যে, প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী সভ্যতর দেশ। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত পৃথিবীতে বাচনিক শ্রমেরও হাট বসিয়াছে; অধ্যাপক পি ঘোষ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বাচনিক শ্রমের হাট হইতে অধ্যাপক টটণ্টার নিষ্কাসিত হইয়াছেন; এমন দিন ক্রমে আসিবে, যখন দেশীয় সংবাদ পত্র বিদেশীয় সংবাদ পত্রকে ও দেশীয় ব্যারিষ্টার বিদেশীয় ব্যারিষ্টারকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন।

(গ) কায়িক শ্রমঃ—কায়িক শ্রমও মান-সিক শ্রমের দ্বারস্বরূপ। যাহার মন অপরি-স্ফুট, কায়িক শ্রমে ফল-লাভ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কায়িক শ্রমও দ্বিবিধ (১) দৈহিক ও (২) যান্ত্রিক। যন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত দৈহিক শ্রমেরই রাজত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ আর সে দিন নাই, দশ জন দরজী হাতে সূচী চালাইয়া যাহা করিত, একটী সেলাইএর কল অনায়াসে তাহা করিতেছে। হাটিয়া এক জনের ২০ মাইল পথ যাওয়া কষ্ট, বাষ্পীয় যানে লোকে অনায়াসে অর্দ্ধ ঘণ্টায় ২০ মাইল যাই-তেছে; সুতরাং দৈহিক বলে এক্ষণ জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। জগতে সেই জাতিরই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার আশা, যাহার যন্ত্র সকল অতিশয় কর্ম্ম-কুশল।

যান্ত্রিক শ্রম যে কায়িক শ্রমীদিগকে কর্ম্ম-চ্যুত করে, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ৫০,০০০ নৌকায়, ৫০,০০০ গাড়ীতে যে মাল ও আরোহীকে গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইত, ই, বি, রেল একাকী তাহা করিতেছে। ইহাতে নিশ্চয়ই কতক গুলি নৌকা ও গাড়ী-জীবী লোক নিরুপায় হইয়াছে। শুভ ফল এই হইয়াছে যে, মলধনীরা মূলধন নিয়োগ দ্বারা লাভবান হইয়াছে, কর্ম্মচারীরা যে উপার্জ্জন করে তাহা অতিশয় সামান্য, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে।

উপরে যে কয়েকটী ফল দৃষ্টিগোচর হইল, তন্মধ্যে দুই পক্ষ প্রধান দেখা যাইতেছে। লাভ পক্ষে মূলধনীগণ ও হানিপক্ষে নৌকা ও গাড়ীজীবীগণ। যদি একপ স্থলে মূল-ধনী এবং নৌকা ও গাড়ীজীবী এক দেশের লোক হয়, তবে দেশ দরিদ্র হইবার কোন আশঙ্কা থাকেনা, কিন্তু যদি ধনী বিদেশী হয়, তাহা হইলে ঘোরতর হানি; যদি গাড়ী প্রস্তুতের যন্ত্র সকল আবার বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা অর্থাৎ হানির একশেষ।

যন্ত্রে, দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই মানুষকে শ্রম-চ্যুত করে, সুতরাং এক মাত্র সেই দেশই জগতে পূজ্য হইবার আশা করিতে পারে, যাহার এত যন্ত্র আছে যে যন্ত্রেই সে জাতির

সমস্ত শ্রম শক্তি ক্রিয়া পায়। তাহা হইলে তাহারা কারিক শ্রমী জাতিদিগের নিকট সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ বিলাসিতাসম্পন্ন জাতিদিগের মধ্যে সেই জাতির কৃতকার্য্যের আশা অধিক, যাহার সমস্ত ভোগোপকরণ দ্রব্য শারীরিক শ্রমের দ্বারা নিজদেশে উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের এই অংশে বড়ই দুর্ব্বলতা আছে, পৃথিবীর অনেক দেশ মূর্খ। তাই ইংলণ্ড এক্ষণও সে দোষ অনুভব করিতে হইতেছে না, কিন্তু কাল ক্রমে এমন দিন আসিবে, যখন আমাদিগের ন্যায় মূর্খ দেশ সকলের চক্ষু ফুটিবে, তখন ইংলণ্ডকে ক্ষেত্রজ সামগ্রীর জন্য সঙ্কটে পড়িতে হইবে। জগতের সেই দেশকে সুখী ও নিরাপদ বলিতে পারি, যাহাকে বাধ্য হইয়া পরের মুখের অপেক্ষা করিতে হয় না। নিজের দ্রব্য পরের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সম্পূর্ণ সাম্যনীতিতে অবস্থান বলিয়া, কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না, অন্যথা এক সময়ে না এক সময়ে প্রতিযোগিতা আসিবেই আসিবে। আজ কাল ইউনাইটেড্‌ষ্টেট বহুল পরিমাণে এই নীতির অনুসরণ করিতেছে।

যন্ত্র যে দেশের সমস্ত প্রাপ্তব্য শ্রম না গ্রাস করিতে পারে, সে দেশে শ্রমজীবীরা কষ্ট ভোগ করে। যাহারা (survival of the fittest) যোগ্যতমের পরবর্ত্তীতার একমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা দরিদ্রদিগের কাতর স্বরে বিচলিত হন না, ভাবেন, জন সংখ্যার একটা অকর্ম্মণ্য অংশ ধ্বংস হওয়াই কল্যাণকর। আমার নিকট কিন্তু এ নীতি পাশব বলিয়া বোধ হয়। এ দেশে লোকে দরিদ্রদিগকে ইচ্ছানুসারে ভিক্ষা দেয়, ইহাতে অসংখ্য দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু দাতাদিগের একান্ত অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্ত ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা বংশগত করিয়া লইয়াছে এবং মহাসুখে বিলাস দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া ভিক্ষুক "বাবুর ন্যায়" জীবন যাপন করিতেছে। ভিক্ষায় অক্ষমদিগেরই অধিকার, বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষমদিগকে ভিক্ষা দিলে যেমন একপক্ষে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তেমনি পরিশ্রমকে অমান্য করা হয়। এজন্য আমার ইচ্ছা যে, আমার স্বদেশীয়গণ এবিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন।

শ্রম প্রযোগে যন্ত্রের ন্যায় সহায়তা করে, এরূপ একটা প্রণালী আছে, তাহার নাম শ্রমবিভাগ নীতি। নানা প্রকারের শ্রমবিভাগ নীতির শুভ ফলে আজ ইউরোপ জগতের শীর্ষস্থ, কিন্তু অবশিষ্ট পৃথিবী অদ্যাপি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় নাই। ইহা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, একজন লোক একাকী সমস্ত করিয়া আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু যদি দশ জন সমবেত হইয়া ঐ আলপিন গঠনের কার্য্য বিভাগ করিয়া করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে এক দিনে ৫০,০০০ আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে। এ প্রকারের শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা অবশ্যই সুশিক্ষিত লোকের বুদ্ধি-প্রসূত ; কিন্তু এ দেশে সুশিক্ষিত লোকদিগের এ প্রকারে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের সাহস নাই, প্রখরতা নাই। তাঁহারা নিরন্তর সতৈল-হস্ত, পরপদ-লেহনক্ষম, লেখনী-অম্বুতাড়নে ক্ষিপ্রহস্ত এবং বেতনাস্বাদনে তাহাদিগের লোল রসনা আবক্ষ-প্রসারিত।

শ্রমবিভাগের আর একটা প্রণালীর নাম যৌথ কারবার—ইংলণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য

এই নীতির মধ্যে লুক্কায়িত—এই বিশাল বিদেশীয় অধিকার, কুবের সদৃশ ধনসম্পত্তি, সকলই এই নীতি হইতে প্রাপ্ত। এ দেশের বিজ্ঞেরা ইহার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোরের মধ্যে কোন নূতন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলা অসম্ভব; অখাদ্য খাইয়া খাই নাই, অকার্য্য করিয়া করি নাই বলে শিক্ষিত লোকের পনের আনা; রাত্রিকালে কদর্য্য স্থানে মাতাল অবস্থায় যে সকল লোক শুইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক শিক্ষিত লোক। এই সকল ধূর্ত্ত শৃগাল শিক্ষিতদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে কি?

দেশে যত প্রকার শ্রমজীবী থাকে, তন্মধ্যে ভূমি হইতে শস্যোৎপাদন যাহার ব্যবসায়, তাহার ন্যায় অটল জীবিকা কাহারও নহে; কারণ প্রত্যেক দেশের আদি সম্পত্তি তদ্দেশীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন সামগ্রী সকল, এই আদি দ্রব্য না পাইলে যন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যান্ত্রিক শ্রমের উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত, কৃষিজীবীর উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত নহে। এজন্য প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কৃষকদিগের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

শ্রামিক মূল্যের পরিমাণে যেরূপ কার্য্য করে, তদনুসারে তাহার মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। যে অভাব ও পূরণের নিয়মে দ্রব্যের মূল্য অবধারিত হয়, শ্রমের মূল্য অবধারণেও সেই নিয়ম প্রবল। যে স্থানে শ্রমের একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে, সে স্থানে হটাৎ বহুসংখ্যক শ্রামিক আসিয়া কার্য্য প্রার্থনা করিলে শ্রমের বাজার দর অবশ্য কমিবে, কিন্তু ইহাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, সেই স্থানে দৈনিক শ্রমব্যয় যত হইয়া থাকে, নবাগত ও পুরাতনেরা তাহা বণ্টন করিয়া লইবে। জগতে যে যাচমান হয়, তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য—এস্থলে নবাগতেরা যাচমান সুতরাং নিয়োগকর্ত্তাগণ যে দর নির্দ্ধারণ করেন, তাহাতেই তাহাদিগকে সম্মত হইতে হয়।

শ্রম তত্ত্বে ইহা একটা স্থির মীমাংসা যে, ধনের প্রয়োজন দ্বারা শ্রমের প্রয়োজন জন্মে না ও শ্রমের প্রয়োজন দ্বারা ধনের প্রয়োজন জন্মে না। উভয়ের মধ্যে যে প্রবল হয়, সেই অন্যের অধীন হইয়া পড়ে। যদি শ্রমের আবশ্যক অধিক হয়, মূলধন তাহার পরিপোষণের পক্ষে অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে মূলধনই সে স্থলে নিয়ামক হইয়া থাকে; আবার মূলধন যে স্থলে অধিক হয়, শ্রম অল্প থাকে, সে স্থলে শ্রমই মূলধনের নিয়ামক হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শ্রম বা মূলধন ক্ষয় পাইয়া পরস্পরের সাম্য বিধান করে। এবিষয়টা জটিল, এজন্য একটা উদাহরণ দিতেছি। আমার ৫০,০০০ মালসার দরকার, কিন্তু কুম্ভকার মূলধন অভাবে ৫০০০র অধিক দিতে পারে না, সুতরাং আমার ঐ ৫০০০ই অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া কুম্ভকারকে অধিক মুনাফা দিতে হয়, আবার ভাবুন আমার দরকার ৫০০০র, কিন্তু ঐ কুম্ভকারের এত মূলধন আছে যে, সে ৫০,০০০ প্রস্তুত করিতে পারে, সে স্থলে তাহার ৫০০০র অতিরিক্ত মূলধন বসিয়া থাকিবে, অর্থাৎ তাহার সমগ্র মূলধনের উৎপত্তি ন্যূন হইবে।　　শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখা পড়া।

"লেখা পড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে," আমাদের এই কথা। সুতরাং বুঝিতে হইবে, লেখা পড়ার প্রকৃত আদর আমাদের দেশে আজ কাল নাই। ব্যাস, কনাদ, কপিলাদি মহাত্মাগণ যথাসাধ্য লেখা পড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে গাড়ী ঘোড়া চড়া নিশ্চয় ঘটে নাই, অথচ বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল মহাপুরুষদের তুলনায় যৎসমান্য লেখাপড়া করিয়া কত উকীল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার জুড়ি গাড়ী হাঁকাইতেছেন। এই দুই শ্রেণীর জীবের লেখা পড়ার কত খানি তফাৎ, বুঝিতে না পারাই ভারতের বর্ত্তমান ব্যাধি। প্রথমোক্ত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন অমরাত্মাগণ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই সংসারে জীবিত থাকিবেন, আর একালের বিদ্যাদিগ্‌গজ লেখাপড়া-ওয়ালা বাবুগণ সাধারণ জীবের ন্যায় কালাতিপাত করিয়া যথাসময়ে অনন্ত কালের জন্য বিলুপ্ত হইবেন।

বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ বই আর কিছুই নয়, কিন্তু অবিদ্যা অর্থাৎ ভোগবিলাসাদি ক্রয় জন্য অর্থোপার্জ্জন যদি লেখা পড়ার কারণ হয়, তাহার নাম লেখা পড়া নয়, অতি নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায়। ইহার প্রমাণ আমরা নিজেরা। আমাদের মধ্যে কাহাকেও সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিলে তাহাকে ঐ সৎপথ হইতে বিরক্ত করিয়া আমাদের দলে আনিবার জন্য বলি, "কি এখন এত লেখা পড়ায় ব্যস্ত!", অর্থাৎ কালেজে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকিবার কথা, এখন সংসারে প্রবেশ করিয়া পুরাতন হইয়াছি, স্বার্থপরতার নিকট দস্তখত লিখিয়া দিয়া টাকা রোজগারে নিযুক্ত হইয়া, মাছের ঝোল, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কোম্পানির কাগজ ভিন্ন চতুর্থ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি না; এখন ওরূপ নিষ্ফল কাজে (unproductive labour) ব্যস্ত থাকা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত কথা। কিন্তু এইরূপ কৈফিয়ত বা আশ্চর্য্যোক্তি দ্বারা বাস্তবিক কি বুঝায়? ইহা দ্বারা আমি ধরা পড়িলাম, নিজের কপালে স্বহস্তে বড় বড় হরপে "মূর্খতার" ছাপ মারা হইল মাত্র,—এত কালের নাম আজ ডুবিল, শত শত পুঁথি পড়িয়াছি বলিয়া যে এক ভুয়া খ্যাতি ছিল, তাহা মুছিয়া গেল। টাকা রোজগারের গরমাগরম সময়ে বন্ধু যে সর্ব্বদা একমনে একধ্যানে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যস্ত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারাতে কেবল মাত্র ইহাই প্রকাশ পাইল যে, আমি একজন চিনির বলদ, অনেক পুস্তক পড়িয়াছি বটে, কিন্তু শুধু মথন পড়া সার হইয়াছে, অর্থবোধ হয় নাই; কারণ তাহা আমার ক্ষমতার অতীত ছিল; জন্মাবধি লেখা পড়া করিয়াছি, কিন্তু আজ বেশ বুঝিতে হইতেছে, আমি ও রাইচরণ টিন-ওয়ালা উভয়ে সমান, প্রভেদ মাত্র এই যে, আমার উপর সৌভাগ্যের সুবাতাস বহিয়াছে, উহার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে।

মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞান-লালসায় পরিচালিত হইয়া যাবজ্জীবন অধ্যয়ন নিরত

থাকে, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; তবে কি আমি ঘোর অজ্ঞান? যদি এই সর্ব্ববাদী-সম্মত বাক্য সত্য হয় যে, যে চোর না হইলে কোন বিশেষ পটু চোরের বাহাদুরী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, নিজে চিত্রকর না হইলে সুচিত্রের গুণপনা বুঝিতে অক্ষম হয়; সাধু না হইলে সাধুর সাধু ভাব দেখিতে পায় না, (অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে যত টুকু খাঁটি অধিকার আছে, তিনি যে বিষয়ে তত টুকু উপলব্ধি করিতে সক্ষম) তাহা হইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ঐ উক্তির দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখনও যদি আমি নিজের ত্রুটি ও অভাব দেখিতে পাইয়া থাকি, মঙ্গল, নতুবা সর্ব্বনাশ।

বহুকাল হইল গুরু রস্কিনের (Ruskin) নিকট শুনিয়াছিলাম "You might read all the books in the British Museum (if you could live long enough), and remain an utterly illiterate, uneducated person, but that if you read ten pages of a good book, letter by letter,—that is to say, with real accuracy,—you are for ever more in some measure an educated person" অর্থাৎ যদি কেহ অমানুষিক দীর্ঘ জীবন পাইয়া ব্রিটীশ মিউজিয়মের বিশ লক্ষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারে, অথচ প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, সে নিরক্ষর মূর্খ বলিয়া গণ্য হইবে, আর যিনি কোন একখানি ভাল গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠা উত্তমরূপে পড়িবেন, তত্রস্থ সত্যগুলি নিজের সম্পত্তি করিয়া লইতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় কতক পরিমাণে শিক্ষিত জীব। এই কথাটী মহামূল্যবান কথার মর্য্যাদা করিতে শিখি নাই বলিয়া আজ সংসারের ন্যায় বিচারে মূর্খ পদবাচ্য হইলাম, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে। হায়, অর্থকরী ভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া কত অমূল্য জ্ঞান রত্ন হেলায় হারাইয়াছি। এখন বুঝিলাম, অর্থোপার্জ্জনের লেখা পড়া নয়, লেখাপড়ার জন্য অর্থোপার্জ্জন; অদ্যাবধি যথাসাধ্য অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিব, যাহাতে অতি শীঘ্র এই সয়তানের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে মনোভিনিবেশ করিতে পারি।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

সৌন্দর্য্য।

এই বিচিত্র জগৎ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। স্থির নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, এই অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া পড়ে। আজ আমরা প্রতিনিয়ত সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি; সেই শোভা একই ভাবে আমদের সমক্ষে বিরাজ করিতেছে,—তাই আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, দেখিয়াও যেন দেখিতেছি না। কিন্তু মনে করুন, আমরা যেন মহা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সহসা এই সংসারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম; প্রকৃতির ভাণ্ডার আমাদের সমীপে উদঘাটিত হইল, দেখিবামাত্র সুদূর সুনীল গগনে পরম শোভাকর শশধর

বিরাজমান, নক্ষত্ররাজি পুঞ্জে পুঞ্জে গ্রথিত হইয়া কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, প্রকৃতির অলঙ্কার কুসুমরাজি বিকশিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, লতা কুসুম মণ্ডিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সংযোগে সঞ্চালিত হইতেছে, অলিকুল পরিমল লোভে বিমুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। সাধ্য কি যে মন এ শোভা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সৌন্দর্য্যের সমাকর্ষণে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, চিত্ত আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, শরীর সুশীতল সলিল সিঞ্চনবৎ সুস্নিগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণে নয়ন বিস্ফারিত, হৃদয় সরোজ সমুদ্ভাবিত। সৌন্দ…া শারদীয় গগনের সুবিমল শশাঙ্ক, প্রশান্ত সাগরের আনন্দময়ী লহরী লীলা, কিন্নরা-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত—তাপস মনের অখণ্ড শান্তি। এ জগতে যাহা দেখিলে, শুনিলে বা ভাবিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাহাই সুন্দর, তাহাতেই সৌন্দর্য্য। অত্যুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ, বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র হইতে সামান্য বালুকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতেই মনোহর শোভা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। গভীর সাগরকল্লোল, মৃদুগভীর মেঘনিনাদ হইতে কামিনী-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সুতান সঙ্গীত পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনোহর শব্দে মধুরিমা ক্ষরিত, অনুপম শোভা বিকশিত।

প্রকৃতি জগতে যাহা সৌন্দর্য্য, মানবজীবনে তাহা বিভিন্নাকার। মানবের গুণই মানবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য;—পবিত্রতা মানব জীবনের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সত্য আমাদের অলঙ্কার, কোমলতা আমাদের সৌরভ, দয়া আমাদের মকরন্দ। যখন বাহ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গুণের সম্মিলন হয়, তখন সে সৌন্দর্য্য—সে মণিকাঞ্চন যোগ—অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলার সৌন্দর্য্য আর নন্দন কানন-বাসিনী অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্য—চন্দ্রের কোমলতা আর সূর্য্যের প্রখরতা চিত্তের চির শান্তি এবং ক্ষণিক উল্লাস, ইহার মধ্যে একের সঙ্গে অপরের তুলনা হইতে পারে না। মানবের বাহ্য সৌন্দর্য্য বিলাস-ভঙ্গিমা সময়ে সময়ে লোকের চিত্ত বিমোহিত করে সত্য, কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের জলন্ত প্রতিভায় হৃদয় নিহিত প্রেম বিগলিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, এবং হৃদয়-নদী পূর্ণ হইয়া প্রেম সাগরে মিশিবার জন্য প্রধাবিত হয়, সে সৌন্দর্য্য বহির্জগতে নাই,—মানবের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

এই বসন্ত কাল; প্রকৃতি সুন্দরী অনুপম শোভায় সমুদ্ভাবিত। শীতের আতিশয্যে পৃথিবী শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাসন্তিক সমীরণ সংযোগে শরীর বিকশিত ও সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত। জগৎ কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—সর্ব্বত্র আনন্দে পূর্ণ। মানব জগতে তদপেক্ষা সমধিক মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। যৌবনের প্রারম্ভে যে অনুপম শোভা বিকশিত হয়, তাহা সন্দর্শন করিলে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়—নয়ন আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়?

সেই সৌন্দর্য্য অধ্যয়ন করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কল্পনা শক্তি উৎকর্ষতার শেষ সীমা অতিক্রম করত, এই মর্ত্ত্য জগতে স্বর্গের অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিয়া, সেই ঐন্দ্রজালিক শোভায়

চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত করে। স্মৃতির অপূর্ব্ব ভাণ্ডার কত শত অলৌকিক ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমাকীর্ণ হইয়া দেব ভাব ধারণ করে। সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বশক্তির উন্মেষ সাধন করে—বালারুণ কিরণে শতদল বিকশিত হয়। সৌন্দর্য্যের লোপ হউক, জগৎ হইতে কবিত্ব অন্তর্হিত হইবে। যখন কবি সৌন্দর্য্যের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিয়া তাহার অলৌকিক শোভা সন্দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনে যে যুগপৎ কত শত ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তিনি তখন যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা মানবে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

কালিদাসের কবিত্ব সৌন্দর্য্য-বিন্যাসময়; তিনি সেই সৌন্দর্য্যের সম্মাকর্ষণে দুষ্মন্তের মন হরণ করিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত মৃগয়াক্লিষ্ট রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন, কবি সৌন্দর্য্যের বাসন্তিক লীলা বিস্তার করিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্পনার তিনটী ছবি তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। আহা! সে সরলতা, সে কোমলতা, সে অলৌকিক মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে পারে? প্রকৃতির তিনটী মনোহর ছবির সেই মধুর কথোপকথন, সেই সরলতাময় প্রণয়, সেই যৌবন-সুলভ ঈষৎ আকুঞ্চিত ভাব, সেই বৈকালিক সৌর কিরণ-পরিস্নাত পবিত্র তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা, দুষ্মন্ত অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, বাহ্য জগতের সঙ্গে চিত্তের সমন্বয় ছুটিল, তিনি বিহ্বল হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-স্রোতে পতিত হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদায় সংসার অন্তর্হিত হইল; কেবল একটী মাত্র ছবি—সৌন্দর্য্যের লীলাময়ী সেই মনোহারিনী মূর্ত্তি খানি দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়-তন্ত্রী একে একে বাজিয়া উঠিল; অন্তর্জগতে এক মনোহর সঙ্গীত সমুত্থিত করিল। প্রেমের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, সৌন্দর্য্যের এই অতুল বিন্যাস কবি তাহার সেই অবিনাশী গ্রন্থে চিত্রিত করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্যে প্রেম, প্রেমে মিলন, এবং মিলনে সমাজ সংগঠন ও পার্থিব সুখের উদয় ও সম্ভোগ। সৌন্দর্য্য বৃক্ষ, প্রেম তাহার ফুল, এবং মিলন তাহার ফল। এই সৌন্দর্য্য-বোধই মানবকে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহা না থাকিলে মানবে ও ইতর জন্তুতে কোন প্রভেদ থাকিত না। মানব প্রতিনিয়ত সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে প্রধাবিত। মানবের স্বর্গ, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত আলয়। মানবের দেবতা, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অবতার।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-লিপ্সা যেমন এক দিকে মনকে উন্নতির চরম সীমায় উপনত করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বিলাসের প্রবল তরঙ্গে ফেলিয়া মানবের চির শান্তি ও সুখ অপহরণ করত তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করিতেছে। মানব কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সৌন্দর্য্যের অনুপম মূর্ত্তি দর্শনে এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, আর স্থির থাকিতে পারে না। হিমাচলের তুষারমণ্ডিত বালারুণ-রঞ্জিত শোভা সন্দর্শনে ভাবুক বিমোহিত হইয়া স্থির নয়নে ভগবানের কীর্ত্তি অনুধ্যান করিতে থাকেন, আর অবোধ পুরুষ অধীর হইয়া ঐ রত্নমনি পাইবার জন্য আরোহণ

করিতে গিয়া অধঃপতিত ও নিষ্পেষিত হইয়া যায়। রমণীর অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে পারস্য কবি ভগবানের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আর ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত পাপ-পুরুষ তাদৃশ রূপে সমাকৃষ্ট হইয়া অনন্ত নরকে ডুবিতেছে। ক্লিওপেট্রাররূপে বিমুগ্ধ হইয়া এনটনি অতুল সাম্রাজ্য ও স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া চির কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবিলেন, আর আগস্ত সিজার তাহা পাপের প্রলোভন বলিয়া পদতলে দলিত করত বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ও অতুল বৈভবের অধীশ্বর হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

আমি তেমন সৌন্দর্য্য চাহিনা। ঐ যে সর্প-জড়িত চন্দন তরু রহিয়াছে, উহার নিকট যাইতে চাহিনা। আমি সৌন্দর্য্য দেখিতে চাহি, স্পর্শ করিতে চাহিনা। ফুলটি ফুটিতেছে, কেমন বাতাসে দুলিতেছে, তাহা দেখিতে ভাল বাসি—উহা ছিঁড়িতে চাহিনা; উহা ছিঁড়িলে উহার সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য থাকিবেনা; সে নূতনত্ব, সে কোমলতা কিছুই থাকিবে না। ঐ যে অবোধ পতঙ্গ সৌন্দর্য্য ডুবিবে বলিয়া কত চেষ্টা করিতেছে, কতবার যাইয়া ঐ আবরণের উপরে পড়িতেছে, কত ব্যাকুল হইতেছে, মোহ আবরণ উহার পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া কত আর্ত্তনাদ করিতেছে, অবশেষে অশেষ চেষ্টার পরে ঐ যে আলোর উপর উৎপতিত হইয়া পুড়িয়া গেল—আমি উহার মত প্রমত্ত হইতে চাহিনা। এই যে সংসারের মোহ, এই যে সংসারের স্নেহ মমতা, উহা আমার নিকট বড় আমোদের জিনিষ—আমি উহা-রই মধ্যদিয়া সেই পূর্ণ আলোক দেখিতে চাহি; অনন্ত কাল দেখিব—স্থির নয়নে স্থির ভাবে দেখিব, কিন্তু সাধিলেও আমি উহাতে যাইয়া পড়িবনা; আমার ভয় হয়, আমার শঙ্কা হয়—আমি উহার সঙ্গে মিলিতে অনুপযুক্ত,—মিলিতে চেষ্টা করিলে আমার ঐ পতঙ্গের দশা হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বঙ্গবাসী ও অনাচরনীয় হিন্দু।

(৩)

আমি যে অতিশয় "মূর্খ", তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। বঙ্গবাসীতে ঐ কথার পুনরুল্লেখে আমি সমধিক কৃতজ্ঞ হইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্য-ভারতের সম্পাদক মহাশয় ও "সমস্ত বাবু-দের মূর্খতা" আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

বঙ্গবাসীর নীতি সম্বন্ধে যাহা আমরা বলিয়াছি, বঙ্গবাসী তাহা একে একে সকলই স্বীকার করিয়াছে ও করিতেছে। তবে যে গুণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শৌণ্ডিকের ও সুবর্ণবণিকের বাটীতে দানগ্রহণ করিয়া সমাজে আসিয়া অস্বীকার করেন, স্বভাবসিদ্ধ সেই পরম রমণীয় গুণ বশতঃ বঙ্গবাসী

আমাদের কথায় উত্তর দিয়াও প্রকাশ্যে আমাদের কথায় উপেক্ষা ও "ঘৃণা" প্রদর্শন করিয়াছে। আমরাও বঙ্গবাসীকে একথা বলিতে পারি যে, আমরা যদি কোন বস্তুকে ঘৃণা করি, তবে এই প্রকারের কাপুরুষতাকেই করি।

ইহা আমরা জানি ও বলিয়াছি যে, এ দেশের অনেক মূর্খ লোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানে। আবার এমন বিচক্ষণ লোকও আছে, যাহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও যাজকতা যে ভিন্ন জিনিষ, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। আধুনিক বাবুগণই এই বিভিন্নতা বুঝেন, এমত নহে, বঙ্গবাসীর অবাবুগণও উহা বিলক্ষণ রূপে বুঝেন। যত কেন সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কভাবে বলা হউক না, বঙ্গবাসীর উপদেশ যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করে, তাহা বুঝিতে কৃতবিদ্য সমাজের আর বাকী নাই। তবে যাঁহারা নিদ্রা যাইতে যাইতে বঙ্গবাসী পাঠ করেন, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য গত কয়েক সপ্তাহের বঙ্গবাসী হইতে, আমাদের উত্তরচ্ছলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "শাস্ত্রশাসিত ও ব্রাহ্মণাশ্রিত সমাজকেই আমরা হিন্দু সমাজ বলিয়া জানি।" বঙ্গবাসী ২২শে ভাদ্র, ১২৯৭, ৪র্থ স্তম্ভ।

২। "ব্রাহ্মণ যাহাতে সুব্রাহ্মণই থাকেন, দেশে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার সমধিক চর্চ্চা হয়, শাস্ত্রানুশীলন বিশিষ্ট রূপে হয়, ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। * * * ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা ব্রাহ্মণের জিহ্বাগ্রে অবস্থিতি করুক—ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। আমরা জানি, সুব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দু সমাজ সুরক্ষিত হইবে না। তাই আমরা ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য এত বদ্ধকর।" বঙ্গবাসী ২৫ শে শ্রাবণ, ১২৯৭; ৫ম স্তম্ভ।

পাঠক! বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত কি না, এস্থলে বিবেচনা করুন।

শাস্ত্রশাসিত ধর্ম্মকে আমরাও হিন্দুধর্ম্ম বলি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সটীক স্মৃতি সংগ্রহ যদি শাস্ত্র হয়, রমেশ বাবুর সটীক ঋক্‌বেদ সংহিতা শাস্ত্র হইবে না কেন, ইহাই আমরা বুঝি না।

সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহা আমাদেরও ইচ্ছা; কিন্তু কুব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া তাহার ব্যবসায়োচিত বর্ণে তাহাকে নিমজ্জিত কর এবং পংক্তি ভোজনের সময় তাহাকে ব্যবসায়োচিত বর্ণের সঙ্গে বসিতে দাও। আর তাহা যদি না কর, তবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা মুখে আনিও না, এবং জুগী যদি যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে চায়, তাহাকে নিষেধ করিও না।

৩। "কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেলে সুবর্ণ-বণিকের সন্তানকে স্থান দেওয়া হয় নাই, তাই একটু ঘোট হইতেছে। হোষ্টেলের নিয়ম আমরা জানি না। কিন্তু যেখানে সংস্পর্শের আশঙ্কা সেখানে সুবর্ণবণিকেরাই বা জিদ করিবেন কেন?" বঙ্গবাসী ২২ শে ভাদ্র, ১২৯৭—১ম স্তম্ভ।

অনাচরণীয় হিন্দুগণ বঙ্গবাসীর কর্ণধারত্বে যে লাভ করিবেন, তাহার নমুনা বাহির হইতেছে। ধনকুবের সুবর্ণবণিকগণ যখন বিদ্যালঙ্কার ও সিদ্ধান্তবাগীশদিগকে চুপে চুপে দান করেন, তাঁহাদের হাতের রসিদ রাখিবার রীতি যদি প্রবর্ত্তিত করিতেন, তবে অনেক উপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায়ের নাম

তাঁহাদের দ্বারদেশে সাইনবোর্ডে দেখাইতে পারিতেন। তাহাত তাঁহারা করেন নাই। ধন আছে ধনের ব্যবহার করিয়াছেন, সুখ হইয়াছে ও হইতেছে, এই পর্য্যন্ত। কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে একদল ঘুষ দিয়া সংস্পর্শের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন; তাঁতীর মধ্যে "ক্ষীর তাঁতী" নাম ধারণ করিয়া একদল উঠিয়া গিয়াছেন, দাগদেওয়া গোয়ালও সজল ব্যবহারের অন্তর্গত হইয়াছে, শৌণ্ডি কের মধ্যে একদল 'কুণ্ড' উপাধিগ্রহণে উপরে উঠিয়াছেন, সুবর্ণবণিকের মধ্যে, বহু বহু সুবর্ণবণিক নাম ধারণ করিয়া, অবশ্য শাস্ত্রাধ্যক্ষগণকে ঘুষ দিয়া, উঠিয়া যাইবার জন্য একদলের চেষ্টা আছে। যাহা হউক, এরূপেও যদি দেশে সজল ব্যবহার হয়, দোষ নাই। কিন্তু আজ কি ব্রাহ্মণে পাতি দিলেই অন্যান্য জাতি, অনাচরণীয় জাতির মধ্যে এবম্বিধ ছিন্ন-লাঙ্গুল শৃগাল তুল্য উচ্চাভিলাষীদিগের জলস্পর্শ করিবে? আমরা এমন মনে করি না। সজল ব্যব হারের জন্য এরূপ পরোক্ষ ভাবের যত্ন আমরা অনুমোদন করি না। পরোক্ষ ভাবের যত্ন অতি হীন জাতির সম্ভবে, সুবর্ণবণিকের ন্যায় মান্যগণ্য জাতি, সজলত্যাগ করিয়া কিছু ঘুষ ঘাস দিয়া উপরে উঠিবার যত্নকরিতে পারিবেন, এমন আমরা মনে করি না।

অনাচরণীয় বর্ণের কি উপায়ে সজল ব্যবহার হইতে পারে, এবিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা লিখিয়াছি। তাহাতেই আমরা বলিয়াছি, সকল অনাচরণীয় জাতি সমবেত ভাবে সজল ব্যবহারের যত্ন করিলে, সিদ্ধকাম হইতে পারেন। সুবর্ণবণিক ও শৌণ্ডিকগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই কার্য্য হয়।

৪। "এত যে জাতি নাশের চেষ্টা, হিন্দু মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিবার আগ্রহ, এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ, বাল্যবিবাহের উপর আক্রোশ * * ইত্যাকার অন্যবিধ সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এই সমস্ত বাবুদের মূর্খতা জন্য।"

৫। "বাবুদের মধ্যে কদাচিত দুই এক জন বিদ্যাভিমানী আছেন। ঋক্‌বেদের ভুইফোড় আচার্য্য হইয়া ইঁহারা ধূয়া ধরাইয়া দেন। নিরক্ষর অনুচরবর্গ অমনি সমস্বরে দোহারী করিতে থাকেন।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ)।

এই ভুইফোড় আচার্য্য বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত, আর এই দোহারী কারক বোধ হয় আমাকে বলা হইয়াছে। রমেশ বাবুর বেদানুবাদে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে বসি-য়াছে। আমি অবগত হইয়াছি, তিনি একটি বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় বেদ শিক্ষা দেওয়ার বিধান করি-বেন। এ বিষয়ে আমার নিকট যে সকল কাগজ পত্র আছে, তাহা আমি ক্রমশঃ মুদ্রিত করিব। সুতরাং এক্ষণ কিছু বলিব না।

৬। 'বাবু বিদ্যালয় বাবু বানাইবার কল। বাবুরাই সমাজ ধ্বংসের মূলীভূত কারণ হইতেছেন। চোকের উপর এই সর্ব্বনাশ দেখিতেছি, তবুও ত চৈতন্য কাহা-রও হয় না। ইংরেজি যখন শিখিতে হইবে, তখন আজ কাল খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর কি আছে? তখন ছিল এক শত্রু (খ্রীষ্টানেরা) এখন হইয়াছে তিন শত্রু (খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবু) সুতরাং কহিয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হই-

য়াছে।" (বঙ্গবাসী ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৭, ৬ষ্ঠ স্তম্ভ)।

বঙ্গবাসীর লেখকগণের মধ্যে যে কেহই বাক্যানুরূপ হৃদয় ধারণ করেন না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না। যাঁহারা দেশের উপকার করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের যদি কোন শত্রু থাকে, তবে সে শত্রু কপটতা। বঙ্গবাসী কি প্রকৃতই বাবুগণকে এইরূপ শত্রু মনে করে? ইংরেজী শিক্ষা কি প্রকৃতই বঙ্গবাসীর অশ্রদ্ধেয়? তবে কলিকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয় কেন? এই প্রকার কপট উপদেশে কি সুব্রাহ্মণ তৈয়ার হইবে? ছি! যদি বাবুই ঘৃণার পাত্র ও শত্রু হয়, তবে বঙ্গবাসীর আফিসময় যে আমরা বাবু দেখিতেছি! বঙ্গবাসীর শত্রু বাবুরা নয়, বঙ্গবাসী নিজে।

৭। "আবার অজ্ঞান ও দুর্ব্বুদ্ধি বশত 'সমং পশ্যতি পণ্ডিতঃ' ইত্যাদি বাক্যে একে আর বুঝিয়া এক অদ্ভুত সাম্যবাদের সৃষ্টি করিয়া ইহারা জাতি নাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, বৈষম্যই জগৎ। যতক্ষণ বৈষম্য থাকিবে, ততক্ষণ সৃষ্টি থাকিবে। সাম্যই প্রলয়।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ।)

বলি, ইংলণ্ড ও রুষ ভূমে যে বর্ণ বৈষম্য নাই, সে সব স্থানে প্রলয় হইয়াছে কি?

আবার দেশে যে কন্যা বা বর বিক্রয়ের প্রথা হইয়াছে, তাহাও নাকি বাবুদের দোষ।

৮। "তাই বলি ইংরেজী শিক্ষিত বিক্রীত বাবুদের মতি গতি ফিরাইতে না পারিলে কন্যাদায়ের বিষম রোগ সারিবে না। * * * * কন্যাদায়ের কুপ্রথা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রত্যেক সমাজের জাতিকে স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। একাকারে চলিবে না। (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪র্থ স্তম্ভ।)

ধন্য সত্যবাদীতা! কৌলিন্য প্রথা, অন্তর্বিবাহের অভাব, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে কন্যাদায় জন্মিয়াছে। সে দোষটা এক্ষণ বাবুদের শিরে চাপাইয়া দেওয়া হইল। বাস্তবিক কি ইহা সরল হৃদয়ের কথা? যদি ইহা কপট বাক্য হয়, তবে এ দেশের এত লোককে ত ইহা শুনিতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। বাবুদের যে দোষ নাই, তাহা নহে। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের বা বর বিক্রয়ের দোষ বাবু হইতে জন্মে নাই।

যে দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম, একতার নাম "একাকার", সে দেশেই এত কপট ব্যবহার সম্ভবপর হয়।

৯। "হিন্দু মুসলমানকে একাকার করিবার চেষ্টাও অজ্ঞান প্রযুক্ত। তেলে জলে মিশাইতে গেলে তাহাতে আর প্রদীপও জ্বলে না, তৃষ্ণাও ভাঙ্গে না। তেলও নষ্ট হয়, জলও নষ্ট হয়। অথচ বাবুদের ব্যাপারই এই রকমের।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪।৫ স্তম্ভ।)

হিন্দু ও মুসলমান তেল ও জল নহে। ইহারা তেল ও তেল। তেলে তেলে মিশাইলে প্রদীপ বিলক্ষণ জ্বলে। এই তেল কেবল দুই বোতলে রাখা হইয়াছে। মিশাও, প্রদীপও জ্বলিবে, পাকের কাজও চলিবে। ইহা যে বুঝ না, ইহাই মূর্খতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভারতীয় মুদ্রা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ব্রিটীশ ভারতের ইংরাজ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মুদ্রা সকলের বিবরণ পাঠক-দিগের নিকট বোধ করি অবিদিত নাই; কিন্তু তবও এসম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার বিষয় বাকী আছে। ইংরাজ রাজা এদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার ধাতব মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন, তদ্যথা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র। ইংরাজের স্বর্ণ মুদ্রা দুই প্রকার (১) গিণি সোণার মুদ্রা এবং (২) পান্না সোণার মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকার স্বর্ণই খাঁটি এবং এতদ্দেশীয় বিশুদ্ধ স্বর্ণ। রৌপ্য মুদ্রা সমূহ টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি এবং একাণী, এই পঞ্চম প্রকারে বিভক্ত। একাণীর ব্যবহার এখন খুব কম। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রৌপ্য মুদ্রার ৫ বার সংস্করণ হইয়াছে; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কালে রৌপ্য মুদ্রায় তুলাদণ্ডের চিত্র ছিল, তাহার পরে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি বসান হয়। কিছুকাল পরে শার্দ্দুলের ভীষণ মূর্ত্তি উঠাইয়া দিয়া চতুর্থ উইলিয়মের নামে টাকা উঠিতে আরম্ভ হয়, তদনন্তর কুইন ভিক্টোরীয়ার প্রতি মূর্ত্তি ও নামে টাকা অঙ্কিত হইতে থাকে। লর্ড লিটনের শাসন কালে দিল্লীর বিখ্যাত দরবারের পরে এম্প্রেশ্ ভিক্টোরীয়া নামে মুদ্রা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। তাম্র মুদ্রা সমূহ একপয়সা, অর্দ্ধপয়সা এবং $\frac{১}{১২}$ আনী, এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইংরাজী বারো পাই আমাদের এক আনা; অর্দ্ধপয়সার নীচে অতি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রা চলে, তাহার নাম $\frac{১}{১২}$ আনা মুদ্রা অর্থাৎ বারো পাই হিসাবে যে "আনা" হয়, সেই আনার ইহা দ্বাদশাংশের একাংশ। বাঙ্গালা দেশে ইহা কম চলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহার অধিক প্রচলন, তথায় ইহা ছোটী পাই, এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের তিনটী এক পয়সার সমমূল্য। ইংরাজের তাম্রমুদ্রার প্রায় ত্রয়োদশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এই ত্রয়োদশ সংস্করণের ভিন্ন ভিন্ন পয়সা একত্র করিলে দেখিবেন, সিংহ, শার্দ্দুল, তুলাদণ্ড, কুইন ভিক্টোরীয়া, এম্প্রেস ভিক্টোরীয়া, চতুর্থ উইলিয়ম, উদ্যান, কোম্পানীর কুঠি, কোম্পানীর নাম, তাম্র প্রভৃতি লেখা আছে। যতই সংস্করণ হউক না, ধাতুর ওজন ও দর প্রায়ই সকল সময়ে এক থাকে। ধাতুপরীক্ষকেরা বলেন, ইংরাজের টাকায় প্রায় তিন আনা খাদ দেখা যায়, কখনও কখনও তাহার অধিকও থাকে। এক্ষণে সংগৃহীত মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। যতপ্রকার মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটিতে সংখ্যা দিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। রট্‌লামের তাম্র মুদ্রা।

মধ্যভারতের অন্তর্গত মালোয়া প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী রট্‌লাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য। বর্ত্তমান রাজার নাম রনজিৎ সিংহ, যুবাপুরুষ এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। আয় প্রায় বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা; গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। রাজার নিজের টাকশালা আছে, তথায় কেবল তাম্র মুদ্রা (পয়সা) অঙ্কিত

হয়, রৌপ্য বা সুবর্ণ মুদ্রা অঙ্কণের অধিকার রাজার নাই। টাকশালার অধ্যক্ষের নাম রঘুনাথ প্রসাদ। রটলামে যে তাম্র মুদ্রা দেখা যায়, তাহা দুই প্রকার, যথা প্রাচীন ও আধুনিক। বর্ত্তমান (সন১২৯৭) সালের শ্রাবণ মাস হইতে বর্ত্তমান রাজা রনজিৎ সিংহ এক প্রকার নূতন ধরণের পয়সা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম আধুনিক পয়সা। এই পয়সা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম প্রাচীন পয়সা। রটলামের লোকেরা ইহাদিগকে "কদমী পয়সা" এবং "হালী" পয়সা, এই দুই নামে আখ্যাত করেন। রটলামের পুরাতন পয়সার একপৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুই তররারীর চিত্র এবং তররারী দ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখা যায়। সূর্য্যদেবের মস্তকোপরে সুদর্শনচক্র এবং নিম্নে গঙ্গানদী। পয়সার অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে "Rutlam 1853" এই গুলি দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল, ওজনে ইংরাজী এক পয়সা হইতে কিছু অধিক। এই পয়সা রট্লামে প্রায় ৪৮ বৎসর চলিতেছিল, ইহার পূর্ব্বে হোলকার মহারাজার মুদ্রা এখানে চলিত। উপরে যে পয়সার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ইং ১৮৫৩ অব্দের মুদ্রা। অর্দ্ধ পয়সার চলন এখানে নাই। এখন যে নূতন পয়সা চলে, তাহার বিবরণ এই রূপ। এক দিকের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর লতা এবং ঐ লতার শাখায় পত্র ও ফুল; মধ্যে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা" এই কয়েকটি কথা লেখা। ইহার নীচে সম্বতের উল্লেখ থাকে। অপর পৃষ্ঠার চতুপার্শ্বে লতা, পাতা, ফুল, ফলের চিত্র আরও নিবিড়, সুন্দর এবং দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড। ইহার মধ্যস্থানে মারুতী দেব (পবনপুত্র) হনুমান, বস্ত্রদ্বারা কটিদেশ বদ্ধকরিয়া, ভীষণ গদা হস্তে মহাবীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার পদতলের নীচে দেবনাগরাক্ষরে "রৎলাম" কথাটি অতি ক্ষুদ্রতম রূপে দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল, ওজন প্রায় ব্রিটিশ পয়সার সমতুল্য। সূতা দিয়া রৎলামের প্রাচীন ও আধুনিক পয়সাকে মাপিলে, প্রথমের পরিধি প্রায় (সুতার লম্বত্ব অনুসারে) পৌণে চার অঙ্গুলি এবং দ্বিতীয়ের পরিধি প্রায় ৪ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। যে সুতা দিয়া মাপিবেন, সেই সুতার দৈর্ঘ্যের মাপের কথা বলা যাইতেছে। রৎলাম রাজ্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুই। একটি দেশীয় রাজ্যের পয়সারও প্রচলন আছে।

২। বরোদারাজ্য। গুজরাটের বরোদারাজ্য অতি বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের রাজারা গুজরাটী ভাষায় গায়কোঁয়াড নামে খ্যাত। "গায়" অর্থে গাভী, "কোঁয়াড়" আর্থ "পালক" অর্থাৎ গাভীর রক্ষক ও পালক, এই জন্যই বরোদারাজ্যে গাভীর খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা। বরোদারাজ্যের তাম্র মুদ্রার (পয়সার) আকার গোল। ইহার একদিকে লতা পাতার চিত্র এবং তাহার মধ্য দেশে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা এবং সম্বতের উল্লেখ আছে।" অপর পৃষ্ঠায় দেবনাগরাক্ষরে "শ্রী রাযাজী রাওমগায়ক রাউ" এবং তদন্তর "সেনাখ্যা সখেল শমসের বাহাদুর" এই শব্দগুলি দেখিতে পাইবেন। ইহাদের মধ্যস্থলে দেবনাগরাক্ষরে "সরকার"

এবং তাহাব নীচে কৰ্ত্তিত নবমুণ্ডেব অৰ্দ্ধাংশ ও তন্নিম্নে এক তববাবীব চিত্র। ওজনে ইংবাজী পয়সাব সমতুল্য। সুতা দিয়া মাপিলে সুতাব দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ অঙ্গুলি হয।

৩। আশির গড়। খান্দেশেব অন্তঃপাতী। থাণ্ডোয়া হইতে গ্রেট্ ইণ্ডিযান পেনীন্‌সুলাব বেলওযে কোম্পানীব গাড়ীতে বোম্বাই অভিমুখে যাইলে পথে চাঁদনী ষ্টেশন দেখিতে পাইবেন। ইহা বোম্বাই হইতে ১৬০ ক্রোশ দূবে অবস্থিত। চাঁদনী ষ্টেশন হইতে আশিবগড প্রায তিন ক্রোশ। ত্রযোদশ খ্রীষ্টাব্দেব শেষ ভাগে আশা আহিব নামক এক গোযালা জাতীয় কৃষক এই বাজ্য স্থাপন কবেন। পৰ্ব্বতেব উপবে যে মহা প্রকাণ্ড দুর্গ আশিবগড নামে খ্যাত, তাহা ইহাবই কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত। আকবব সাহ এই দুর্গ অধিকাব কবিতে সমর্থ হইযা ছিলেন। ইংবেজেবা আশিবগড এক্ষণে কাবাযত্ত কবিয়া বাখিযাছেন। কতকগুলি ইংবাজ ও দেশীয় সৈন্য এখানে এক্ষণে বাস কবে। এই দুর্গ ইংবাজেব "বাজকযেদী" (Political State prisoners) গণেব কাবাগাব স্বরূপে ব্যবহৃত হয। বাজা আশা আহিবেব মুদ্রাব আকাব চতুষ্কোণ, ইহা তাম্র ও বৌপ্য, এতদুভয়ে নির্ম্মিত। আকাব ক্ষুদ্র। কোনও অক্ষর বা চিত্র নাই, দুই পৃষ্ঠে কতকগুলি অর্থ শূন্য বিন্দু মাত্র দেখিতে পাওযা যায। ওজনে এক দুয়ানীব সঙ্গে সমান। ইহাব দৈর্ঘ্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখের সমান। এই পযসা এখন চলে না ; আশিব গড এখন ইংবাজ বাজ্য।

৪। ভারতে পর্টুগীজ রাজ্যের মুদ্রা। গোযা প্রভৃতি পর্টুগালাধিকৃত বাজ্য সমূহে এই মুদ্রা (পযসা) প্রচলিত হয। ইহাব ধাতু তাম্র, আকাব গোল। ইংবাজেব পয়সাব সমতুল্য ও সমমূল্য। *ওজন প্রায এক।* এই পযসাব এক দিকে ইংবাজী অক্ষবে "Ludovicus. 1. Portug: et. Algarb · Rex. 1884" এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহাদেব মধ্যদেশে পর্টুগীজ সম্রাটেব মুখেব মূর্ত্তি। সম্রাটেব মাথায আববণ নাই। অপব পৃষ্ঠায় ইংবাজী অক্ষবে "India Portugueza. De Tanga" এই কযেকটি কথা আছে। ইহাদেব মধ্যদেশে সম্রাটেব মাথাব মুকুটেব চিত্র, এবং এই চিত্রেব নিম্নে ইংবাজীতে "quarto' শব্দ দেখিবেন। সুতা দিযা পবিধি মাপিলে, সুতাব দৈর্ঘ্য প্রায ৬ অঙ্গুলি হয।

শ্রীবাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অন্বেষণ।

খুঁজে খুঁজে হাবানিধি মেলে নাই যাব
নিরাশ হযেছে তবু, খোঁজে নাকি আব?
তেমতি এ অন্বেষণ,
তাই পুনঃ আকিঞ্চন,
তাই ও ভুলের দেশে যেতেছি যাচিয়ে,
বাসনা—বিমনা, আশা উঠে শিহরিয়ে।

বরষা প্লাবিত স্নেহ কেমনে শুকায়,
বাল্য-রবি অনুরাগ কোথায় লুকায় ?
হতাশের প্রাণ নাশা,
জ্বর পূর্ণ ক্ষীণ আশা,
পিপাসায় ছুটাছুটি করে তৃষ্ণিকায়,
হারায়েছে যারে; তারে তবু নাহি পায়!

উপেক্ষাই আত্মহত্যা—ধৃতির বিকার,
স্মৃতি মাঝে অনাবৃষ্টি বজ্র হাহাকার,
সেথায় কার্য্যের শেষ,
অনিবার্য্য হেথা ক্লেশ,
প্রতিধ্বনি সে হৃদয় নাহি করে পান
সাঁপেতে শিশির বিন্দু কঠোর পাষাণ !!

কবিতা-বসন্তে কেন কোকিল-কূজন
আশা সুরভিতে ভরা মলয় স্বজন ?
না যাইবে কাছে তার
না ছুঁইবে দেহ আর '
গান মাখা এ অনিল প্রাণে করে খেলা
পশে না সেথায় যেথা প্রেমে অবহেলা।

যে ছিল সে স্মৃতি মাঝে নিদ্রায় মগন
জীবন্ত সমাধি আমি কাঁদি অকারণ
জীবন যা—মরিযাছে
মৃত্যু শুধু-জেগে আছে—
সাধিলে কি মৃত্যু কাছে—মিলিবে জীবন
হারায়েছি যারে—তার বৃথা অন্বেষণ।
শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আকুলতা।

কেন এই আকুলতা মরমের মাঝে গো,
ভাবের লহরী পরে অজানা উছাস!
শীতের কুয়াশা দিনে, অস্ফুট হৃদয় বনে,
কোথা হতে ব'হে আসে বসন্ত বাতাস!
প্রাণের ভগন ঘরে, কেন গো, কিসের তরে
সহসা পড়িল মৃদু জ্যোছনা আভাস?
বিশুষ্ক পতিত চিতে আকুলতা জাগাইতে,
কে আনিল, কোথাকার কুসুম সুবাস?
নিভৃতে পাতার আড়ে, লুকাইযে অন্ধকারে,
কোন্ পিক দিযে সাড়া থামিল আবার,
আধ মৃদু তার গান, ভরেছে ঘুমন্ত প্রাণ,
মেলিতে অলস আঁখি পারিনা যে আর!
কি এক স্বপনে হায়! পরাণ ভাসিযে যায
ভাঙ্গিযা হৃদয স্তর আকুলতা স্রোত বয়!
কেন এই আকুলতা, কেন এ নীরব ব্যথা,
কিছুই বুঝিতে নারি,—বিপ্লব পরাণময়।
শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

বসন্ত ফুরায়ে গেল ?

কথন বসন্ত এসে
সেজেছিল নব বেশে
কথন ফুটিল ফুল
বহিল মলয বায় ?
পিউ পিউ তান ধরে
পাপিযারা গান করে
কুহুরবে নবলতা
শিহরে কোমল কায় ?
গুণ গুণ অলিকুল
আড়ে'চায বনফুল
নিকটে আসিলে কাঁপে
হেঁসে অলি উড়ে যায।
কথন বসন্ত এল
কথন চলিয়া গেল
কথন ফুটিল ফুল
ভরা ভরা লতিকায় ?
আমার হৃদয় মন
ধ্যানে ছিল নিমগন

প্রিয়ের প্রেমের ছবি
দিবা নিশি অরচনে।
অনমনে এক যোগে
নিনিমেষ সুখ ভোগে,
কেটেছে রজনী দিন
জাগরণ সুস্বপনে।
ফুল তুলে মালা গেঁথে,
কাননের পথে পথে,
করিনি যে সখি খেলা
ফুলদের চুমি চুমি।
একিসের ঘুমের ঘোর,
একিসে স্বপন মোর,
অথবা সে নাহি এল,
না শোভিল বনভূমি।
মালা গাঁথা নাহি হোলো,
মালা দে'য়া নাহি হোলো,
আসিল বসন্ত আর
অমনি চলিযা গেলো!
বিরহের বারি ধারা
ঝটিকা করকা তারা
গিয়ে কেন নাহি যায়
যেই এলো সেই এলো?

শ্রীবণ কুমারী।

মিলন।

(১)
সংসারে প্রবাসী মোরা সবে,
বাস মোদের অনন্তের তীরে,
এক দিন থাকিয়া এ দেশে,
পর দিন যাই ঘরে ফিরে।

(২)
পান্থশালে সকলের সনে
দেখা শুনা নাহি কভু হয়,
কিন্তু সমধর্ম্ম ছুটী আত্মা
দূরে থেকে করে পরিচয়।

(৩)
বীণা যন্ত্রের তন্ত্রীর মত,
বাজে যখন একটী প্রাণ,
উল্লঙ্ঘিযা সংসার প্রাচীর,
দ্বিতীয়টী ধরি লয় তান।

(৪)
পথ ভুলে যায় যদি চলি
অদৃষ্টের ঘোর আবর্ত্তনে,
পরাণটী জাগিয়া সদা
নীরবেতে খেলে তার সনে।

(৫)
সত্য, ধরার বিজ্ঞানে তারা
ভ্রমে দুই প্রতিকূল তীরে;
স্থান আর কাল মাঝে আসি
বিচ্ছেদ জন্মায় পরস্পরে।

(৬)
যবনিকার অপর পারে,
নাহি স্থান, কাল ব্যবধান,
সেথা বিযোগেতে হয় যোগ
হরণেতে রহেছে পূরণ।

(৭)
ক্রুর বিচ্ছেদ শুকুনী কভু,
রক্ত মাংস করেনা ভক্ষণ,
বহু মিশে একের কবলে,
চির দিন অনন্ত মিলন।

শ্রীরজনী নাথ নন্দী।

কি সাধে রব!

দিনের পর রা'ত হ'তেছে,
রা'তের পর দিন,
আমার জীবন একই ভাবে,
বিষাদে মলিন।
হাসির পর কান্না আসে,
সুখের পরে দুখ।
চির দিন কেঁদে কেঁদে,
আমার ম্লান মুখ।

মা গিয়াছে, বাপ গিয়েছে,
ফেলে মোরে একা,
বন্ধু-বান্ধব সব গিয়েছে,
আর না হবে দেখা।
বাগানেতে ফুল ফুটেছে,
সৌরভ গেছে ছুটে।
এমন সৌরভ নাই আমাতে
মানুষ-অলি জুটে।
কি সাধেতে রব তবে
এ ভবেতে আর,
জুড়াই গিয়া জীবন জ্বালা
যথা মা আমার।

শ্রীভুবন মোহন দাস।

আর কেন ?

আর কেন বিফল রোদন ?
কাঁদায়েছ, কাঁদিয়াছ ঢের;
এস সখি করি উদ্‌যাপন,
এই খানে ব্রত আমাদের !
এই মুছিলাম অশ্রুজল,
ম্লান মুখে ফুটাইনু হাসি,
বিস্মৃতির পাষাণ চাপনে—
ঢাকিলাম বিষাদের রাশি !
মুদিলাম নয়ন পল্লব,
ফিরাইয়া লইলাম মুখ,
হৃদয়ের গুহাতল হ'তে
উপাড়িয়া ফেলিলাম দুখ !
ভাঙ্গিলাম জীবন-শয্যার
স্বপ্নময় মোহময় ঘুম;
যে অনলে দগ্ধ কলেবর
আজি তাহা হইল নিধূম !
যাও, সখি, সেই পথে যাও,
যে পথে হবেনা আর দেখা,
যে পথে কেবলি অন্ধকার
একটীও নাই আলোরেখা !
দৈবে, যদি দেখা হয় কভু,
মুখ ঢেকে যেও পলাইয়া,
এক বিন্দু নীরব নিশ্বাস
বাতাসেরে যেও বিলাইয়া।
সে নিশ্বাস ভেসে ভেসে এসে
যেমন লাগিবে মোর গায়
যেন সেই নীরব নিশ্বাসে
এ প্রাণ তখনি মিশে যায় !

শ্রীযদুনাথ ঘটক।

সমাধি।

আজি হোতে আমি যে গো ভুলে যাব ভালবাসা;
আজি হোতে আমি যেগো ভুলে যাব কাঁদা হাসা।
তারকার বিম হাসি হেরিব না মুখ তুলে;
আকাশের ইন্দু ছিঁড়ি ডুবাব সিন্ধুর জলে।
বিদ্যুৎ কাড়িয়া লব নীরদের কোল হ'তে;
বিষাদে কাঁদিবে শুধু নীরবে আকাশ পথে।
গোধূলির রবিকরে উড়াব মেঘের ধূলা;
বিহগের কণ্ঠ কাটি জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
মুখে মৃদু হাসি মাখা প্রাণে জাগে কপটতা,
একরূপ বনের মত রাক্ষসী কুসুম লতা;
তাদিগে দলিয়া যাব আপনার দুই পায়,
আর কিছু রহিবে না, র'বে শুধু হায় হায়।
গম্ভীর অম্বরতল ভেদি সেই হাহাকার,
আকাশের গ্রহতারা করিবে গো চুরমার।
সে মহা ধ্বংসের পরে দাঁড়ায়ে ধরিব তান;
চরাচর কাঁপাইয়া গাহিব প্রলয় গান।
গাহিব গো উচ্চৈঃস্বরে—"হৃদয় নাহিক হেথা,
আঁখি জল হা হুতাশ কেবলি কথার কথা;
হেথায় নাহিক কভু প্রেম আর সুখ আশা,
হেথায় নাহিক তাহা যারে কহ ভালবাসা।"
—এই গানে করিব গো অযুত রজনী ভোর;
শেষে এই ধ্বংস মাঝে লভিব সমাধি মোর।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সেন।

প্রাণোৎসর্গ।

কি ছার এ প্রাণ

জলের বুদ্বুদ প্রায়, বায়ুতে মিশিয়া যায়
ক্ষণেক লহরী কোলে, মলয় অনিলে দোলে
আবার মুহূর্ত্ত পরে হয় অন্তর্দ্ধান!

অসার ভৌতিক দেহ, প্রানের বাসের গেহ
ক্ষিতি অপতেজমনে, মিশি যায় ক্ষণে ক্ষণে
এ অসার জড়পিণ্ড রহি ক্ষণ কাল।

অসার ইন্দ্রিয় গ্রাম, ক্রোধ লোভ মোহ কাম
করে তারে বিচলিত, চিরতরে কলুসিত
বহিয়া পাপের বোঝা বিষম জঞ্জাল।

অসার সংসার মায়া, পর মিত্র বন্ধু জায়া
আজি যার সনে দেখা, কালি কোথা নাহি লেখা
তাহাদের তরে কেন করি বিসর্জ্জন।

অসার পার্থিব ধন, স্বর্ণ রৌপ্য প্রলোভন
বালক খেলনা প্রায়, নয়ন ঝলসে যায়
যারতরে দেহ মন পাপে নিমগন।

অসারের মাঝে থাকি, অসার সঙ্গিয়া রাখি
অনিত্য সম্পদ লয়ে, নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে
অশ্রু জলে ভাসি চির লইব বিদায়।

এই কি নিয়তি হায়, এরতরে এত দায়
সংসার সর্ব্বস্ব করি, ক্ষণে তাহা পরিহরি
নিরালম্ব নিঃসহায় নিরাশ্রয় প্রায়।

এ সকল পরিহরি, কি ধন আশ্রয় করি
প্রবল ইন্দ্রিয় দ্রোহ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ
রোধ করি স্বর্গধামে করিব গমন।

না রবে মৃত্যুর ভয়, শোক দুঃখ করি জয়
উচ্চসংকল্পের রথে, চলিব স্বর্গের পথে
এছার পরাণ পাবে নবীন জীবন।

অনিত্য শরীর সহ, দেখ কত অহরহ
মুক্ত আত্মা অগণন্, যুঝিতেছে অনুক্ষণ
অনুক্ষণ মরণেরে করি পরাজয়।

ইন্দ্রিয়েরে জয় করি, আকাঙ্ক্ষা ঘোটকে চড়ি
চির উন্নতির রথে, চলিছে মহত্ত্ব পথে
বিপক্ষে সপক্ষ করি মানব নিচয়।

ভূতবলে ভূতে বান্ধি, নরের নয়ন ধান্ধি
মহান ব্যাপার কত, সাধিতেছে অবিরত
এক এক মহাজন পুরুষ প্রধান।

এ কি উপাদানে গড়া, এ কি এই বসুন্ধরা
তবে কেন হেনমতে, চলিব নৈরাশ্য পথে
কি কারণে বলি তবে অসার পরাণ।

এ প্রাণ অসার নয়, মানবাত্মা মহাশয়
অনন্ত শকতিপানে, যাইবে পুণ্যের যানে
বিরোধী শকতি গণে করি পরাজয়।

নিজে চিনি একবার, যদি করে হুহুঙ্কার,
পাহাড় পর্ব্বত চয় পদাঘাতে চূর্ণ হয়,
সমুদ্র অতল স্পর্শ গণ্ডূষে বিলয়।

কেন ভীরু হীনবল, বিলাপে কি হবে ফল,
উঠ হুহুঙ্কার করি, অলসতা পরিহরি,
অবশ্য মহত্ত্ব প্রাণে হইবে উদয়।

ধর বল কর পণ, যুঝিতে সম্মুখ রণ
পাপ প্রলোভন সনে, দমি বাধা বিঘ্নগণে
অবশ্য পাইবে রাজ্য অনন্ত অক্ষয়।

নাহি কি জীবনে বল, হীনতেজ পেশীদল?
ইন্দ্রিয় শৃঙ্খলে পড়ি, করিতেছ জড়াজড়ি?
অনন্ত শকতি নামে কররে হুঙ্কার।

এ ধরণী কর্ম্মক্ষেত্রে, দৈবতেজ ধরি নেত্রে,
কররীর্য্যে আস্ফালন, কররে জীবন পণ
অনন্ত শকতি পাবে বিক্রম অপার।

উৎসর্গ করহ প্রাণ, হও তেজ বলবান
ছাড়ি মোহ ছাড়ি ভয়, গাইয়া সত্যের জয়
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে কর প্রাণপণ

নহেরে অসার প্রাণ, নহে হীনজন দান
নয় আত্মা হীনবল, অসার এ ভূমণ্ডল
আমরাও হ'তে পারি পুরুষ প্রধান।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বিদায়।

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তবু স্মৃতি কাতর পরাণে,
সজল নয়ন দু'টি তুলে,
র'বে চেয়ে তোমাদের পানে!
তোমাদের হৃদয়ের ছায়
স্নেহ ফুল, লতার পাতায়,
বেঁধেছিনু খেলাবার ঘর,
কেমনে ছাড়িব তারে আজ
তাই প্রাণ বড়ই কাতর।
দিন যাবে, মাস যাবে কত।
সে কুটীরে আর কত শত
দীন আসি লইবে আশ্রয়;
দিন যাবে, মাস যাবে যত
অভাগার প্রতিচিহ্ন তত
ক্রমে বুঝি পাইবে বিলয়!
সে কুটীরে এখনো যেমন
হাসে মৃদু জোছনা চাঁদের,
আশে পাশে ফুটে শত ফুল
বিলাইয়া সুরভি তাদের—
তখনো ফুটিবে ফুল
তখনও রহিবে জ্যোছনা;
তোমাদের র'বে সেই সব
আমিই সেথায় রহিব না!
আমার সে মধুর আলয়
আর যে আমার রহিবে না!
ভেবে তাই কেন গো কি জানি
নয়নে আসিতে চায় জল,
প্রাণ যেন সহসা কেমন
হয়ে আসে কাতর দুর্ব্বল।

ছেড়ে যে'তে চাহেনা পরাণ
তবু আজ চলিনু ছাড়িয়া
প্রতি পদে ফিরে ফিরে চাই—
যে'তে যে'তে ভুলিয়া দাঁড়াই,
অশ্রু দুটি আসে গড়াইয়া!

দূরে কোন বিদেশে বিজনে
প্রবাসী দাঁড়ায়ে ম্লান মুখে,
একটি নয়ন জল ফেলে,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস তুলে
ফিরে চায় আলয়ের দিকে।

প্রবাসী এ হৃদয় আমার
তেমনি, যেখানে গিয়ে থাক্,
যাহা আছে কপালে তাহার
মহা সুখ—মহা দুঃখ পাক্
নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আঁধারে
অবসন্ন উদাস অন্তরে,
পরবাসে সজল নয়নে,
প্রতি দিন— প্রতি দিন সে যে
চাহিবে ও কুটীরের পানে!

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তাহার রহিবে সদা মনে!

শ্রীকিশোরী লাল গুপ্ত।

—

চিতায় চিতায়! *

বড় ব্যথা পেয়েছিল ও—
হৃদয়ে জ্বলিত শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে,
নির্ব্বাণ হইল ওর ব্যথা।
পরাণের অনন্ত শ্মশান,
শ্মশানের ছাই হয়ে গেছে।
হৃদয়ের অনন্ত যাতনা,
যাতনা সমুদ্রে নিবে গেছে।
সহস্র স্নেহের পরশনে,
নিবেনি যে প্রাণের বেদন;

* একটী বিধবার মৃত্যু উপলক্ষে।

আজি তাহা চিতার আগুনে,
একেবারে হয়েছে নির্ব্বাণ।
এতদিন অবিশ্রান্ত জ্বালা,
অহোরাত্র দিতেছিল ব্যথা;
এখন সে অবসর লয়ে,
শান্তিকে পাঠায়ে দেছে তথা।

কাঁদ কেন আর তার তরে,
ডাক কেন মর্ম্মভেদী ডাক্—
সে যেখানে গিয়াছে চলিয়ে,
বড় সুখে আছে থাক্ থাক্।

শ্রীমতী সবলা বালা দাসী।

প্রাচীন বংশ বিবরণ। (৪)

(২৫৭ পৃষ্ঠার পর।)

নিধ্রুবি।

নিধ্রুবি সঙ্কলিত বেদাংশ, ৯ মণ্ডলের অন্তর্গত ৬৩ ত্রিষষ্টিতম সূক্তে ৩০ ত্রিশটি ঋকে নিবদ্ধ আছে। উহাতে গায়ত্রী ছন্দে সোমের স্তব প্রকটিত হইয়াছে। ইহার কুলোৎপন্ন নৈধ্রুবি হইতে অপ্সার ও কশ্যপের সংযোগে কশ্যপ গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইঁহার বংশোদ্ভূত নৈধ্রুবের এক কন্যা জন্মে, তাঁহার নাম অজ্ঞাত। এই কন্যাই কশ্যপের প্রেয়সী।

অসিত ও দেবল।

অসিত দেবলের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ কিছু পরেই বলা যাইবে। এস্থলে কেবল প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই জনে গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ ছন্দে ১৫০ একশত পঞ্চাশটি ঋকে সোম ও আপ্রী দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। এই দেবল ভিন্ন আর চারিটি দেবলের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বংশ বিবরণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবলগণের বিষয় দেখ।

(১) দক্ষের প্রপৌত্রের নাম দেবল। তিনিই সম্ভবতঃ স্মৃতিকর্ত্তা। দক্ষ আবার দুই জন—ব্রহ্মার তনয় দক্ষ, দশ প্রজাপতির মধ্যে এক জন। তিনি প্রসূর্ত্তির ভর্ত্তা। দ্বিতীয় দক্ষ, প্রাচীন বর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র।

(২) স্বনামখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনি মুনির পিতামহ এক দেবল।

(৩) বৃহস্পতির জনকও দেবল আখ্যায় পরিচিত। অঙ্গিরার সন্তান যে বৃহস্পতি, তিনি দর্শনবেত্তা। দেবল-পিতা বৃহস্পতি, তাঁহা হইতে পৃথক্।

(৪) বিশ্বামিত্র পুত্র এক দেবল।

কোন্ কোন্ ঋষি, কি ছন্দে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই স্তবোক্ত বচন-পরম্পরা, বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার কোন্ মণ্ডলের ও কোন্ সূক্তের অন্তর্গত, এবং কয়টি ঋকই বা তাঁহাদের বিচরিত, পাঠক-সাধারণের জানা উচিত, বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ তাহারও একটি তালিকা দেওয়া গেল।

ঋকমন্ত্র-প্রণেতার নাম	কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। অসিত ২। দেবল	৯ নবম	৫ হইতে ২৪ সূক্ত পঞ্চম হইতে চতুর্বিংশতিতম সূক্ত	১৫০ দেড়শত	আপ্রি, পবমান সোম	গায়ত্রী, অনুষ্টুপ
৩। নিধ্রুবি	ঐ	৬৩ ত্রিষষ্টিতম	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। রেভ, ৫। সুনূ	ঐ	৯৯ ও ১০০ নবতিতম ও শততম	১৭ সতরটি	ঐ	বৃহতী, অনুষ্টুপ
৬। অপ, ৭। সরঃ	ঐ	১০৪ চতুরধিক শততম	৬ ছয়টি	ঐ	উষ্ণিক
৮। অবৎসার	ঐ	৫৩—৬০ ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত	৩২ বত্রিশটি	ঐ	গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক
৯। ভূতাংশ	১০ দশম	১০৬ ষডধিক শততম	১১ এগারটি	অশ্বিদ্বয়	ত্রিষ্টুপ
১০। বিবৃহা	ঐ	১৬৩ ত্রিষষ্ঠ্যধিক শততম	৬ ছয়টি	যক্ষ্মা ব্যাধি	অনুষ্টুপ

রেভ ও সুনূ।

অসিত ও দেবলের ন্যায়, রেভ ও সুনূর সম্মিলিত চেষ্টায় কতকগুলি ঋক প্রণীত হয়। সে গুলি, ৯. নবম মণ্ডলের ৯৯ ও ১০০ নিরনব্বুই ও একশত সূক্তের অন্তর্গত। সমুদায়ে ১৭ সতরটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক তাঁহাদের যুগলের বিরচিত। সোম দেবতার উদ্দেশে বৃহতী ও অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল।

অপ্ ও সরঃ।

অসিত ও দেবল এবং রেভ ও সুনূর ন্যায় ইঁহাদেরও উভয়ের উদ্যোগে ৯ নবম মণ্ডলের ১০৪ চতুরধিক শতম সূক্তের ৬ ছয়টি ঋক সোমের উদ্দেশে উষ্ণিক ছন্দে রচিত হয়। কোন কোন লোকের মতে উক্ত মন্ত্র ৬ ছয়টি নারদ ও পর্ব্বত নামক ২ দুই জন ঋষির বাক্য।

অপ্সার।

অপ্ ও সরঃ ঋষি-দ্বিয়ের বংশেই বোধ হয়, অপ্সারের জন্ম হইয়াছিল। তিনি কাশ্যপ-গোত্রীয়। কতকগুলি লোকের অনুমান, অপসার ঋষি, অপ ও সরঃ এই উভয় মহর্ষির কুলে সমুৎপন্ন। আনুমানিক যুক্তি অলীক বা অমূলক নয়।

অবৎসার।

অবৎসার কর্ত্তৃক ৯ নবম মণ্ডলের

৫৩ হইতে ৬০ ত্রিশপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত সঙ্কলিত হয়। সোম দেবতার স্তুতির কারণ গায়ত্রী ও পুরউষ্ণিক ছন্দে ৩২ বত্রিশটি মন্ত্র ঐ সূক্তে গ্রথিত আছে।

ভূতাংশ।

'১০ দশম মণ্ডলের ১০৬ ষষ্ঠাধিক শততম সূক্তের ১১ এগারটি ঋকে ত্রিষ্টুপ ছন্দে ভূতাংশ ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন।

বিবৃহা।

বিবৃহার প্রণীত মন্ত্র, ১০ দশম মণ্ডলের ১৬৩ ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে ৬ ছয়টি ঋকে অনুষ্টুপ ছন্দে নিবদ্ধ আছে। যক্ষ্মারোগ নিবারণার্থ ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত বচনগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। বিবৃহা ঋষি, কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাধির উপশমের নিমিত্ত যে ঋক গুলি প্রস্তুত করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"তোমার দুই নেত্র, দুই নাসিকা-ছিদ্র, শ্রুতি-যুগল, শির, মস্তিষ্ক, চিবুক, রসনা, এই সমুদয় অঙ্গ হইতে যক্ষ্মাকে (স্বনাম-খ্যাত পীড়াকে) বিদরিত করিতেছি। ১।

"তোমার গ্রীবাস্থ শিরা, স্নায়ু, অস্থি-সন্ধি, ভুজ-যুগল, স্কন্ধ-দ্বয়—এই সমস্ত অবয়ব হইতে, আমি রোগকে দূরীভূত করিতেছি। ২।

"তোমার ক্ষুদ্র নাড়ী, অন্ন-নাড়ী, হৃদয়-স্থল, বৃহদণ্ড, যকৃৎ, মুত্রাশয়াদি হইতে পীড়াকে তাড়াইয়া দিতেছি। ৩।

"তোমার জানু দ্বয়, উভয় উরু, পার্ষ্ণি-যুগল (গোড়ালি) যুগ্ম-পদ প্রান্ত, দুই নিতম্ব, কটি প্রদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে দূরীকৃত করিতেছি। ৪।

"মত্র-ত্যাগ কারী-প্রত্যঙ্গ, নখ, রোমাদি অপর সর্ব্বাবয়ব হইতেই রোগ দূরীভূত করিতেছি। ৫।

"তোমার সর্ব্বাঙ্গে—সন্ধি স্থল, লোম ইত্যাদি যেখানে—কোন রোগ জন্মিয়াছে, আমি তাহা বিদূরিত করিতেছি।" ৬।—ঋসং ১০ম। ১৬৩ সূক্ত।]

কাশ্যপ (শণ্ডিল) এবং শাণ্ডিল্য।

কাশ্যপ, মরীচির বংশ-সম্ভূত। অঙ্গিরা ঋষির কুল, ইহার মাতামহবংশ। কাশ্যপের জনক কশ্যপ ঋষি, কিরূপ অপরিমেয়-সামর্থ্যশালী ছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। নৈধ্রুব, কাশ্যপের মাতামহ। কাশ্যপের দ্বিতীয় বা প্রকৃত আখ্যা শণ্ডিল। শণ্ডিল এক জন প্রধান ঋষি ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৭৫। ভক্ত এত নত-মস্তক হইয়া গুরু-জনদিগকে নমস্কার করেন যে, নমস্ত ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পান।

২৭৬। সত্যেতে যাহার প্রাণ সদা থাকে মগ্ন, তাহার চিত্ত হয় না কোন ভয়ে ভগ্ন।

২৭৭। কি হইবে পিতা গো! আমার

এই অধম জীবনে; যদি না পারি থাকিতে সদা তব পবিত্র চরণে।

২৭৮। ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমে সদা মগ্ন যাহার প্রাণ; সেই করে ভোগ তাঁহার মুক্ত জীবনদান।

২৭৯। ভক্ত জানেন যে তিনি যাহা বলেন, তাহা তিনি সেই সর্ব্বসাক্ষীর সম্মুখেই বলেন। তিনি তন্নিমিত্ত আপন কথানুসারে কার্য্য না করিলে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হন। তিনি এই বিশ্বাসেরই জন্য আপনার অঙ্গীকার অনুসারে কার্য্য করিবার অভ্যাস করিতে বিশেষ যত্নশীল হন। অভ্যাসের ফল এতই মধুময় যে, যাহা বড় কঠিন বোধ হয়, তাহা তদ্গুণে সহজ হইয়া পড়ে। দয়াময় তাঁহার সন্তানগণকে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই দিয়াছেন।

২৮০। রোগ ও পাপ-হয় প্রাণেশ্বরের অবমাননার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ফল।

২৮১। সুদীর্ঘ প্রশস্ত ও গভীর জলপূর্ণ নদী প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরে সবেগে ও প্রায় নীরবে তদীয় প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভক্ত জীবনের প্রেমনদী স্থিরভাব ধারণ করিলেও তদভ্যন্তরে প্রেমের স্রোত নীরবে অথচ সবেগে বহিতে থাকে।

২৮২। শান্তি বিনা কেহ পারে না ভোগ করিতে প্রাণ নাথের বিমল, অনুপম, মঙ্গল পূর্ণ অভয় দর্শন, ও তাঁহার পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম মঙ্গল, পরম পবিত্রতা ও পরম শোভা। অশান্ত যাহার মন প্রাণ, সে দুর্ভাগা এ সকল নিত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া সদা হাহাকার রবে রোদন করে।

২৮৩। ঋষি জীবন স্থান, কাল ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। সকল দেশেও জাতিতে অল্পাধিক উহা দৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, মঙ্গল পূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার শরীর মনের সুস্থতা, নির্ম্মলতা ও তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি, আনন্দ, অমৃত, শান্তি মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভা ভোগ করেন, আর পরের নিত্যোন্নতি ও মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকেন, তিনিই ঋষি।

২৮৪। এই অনিত্য সংসারের নানা অনিত্য কার্য্য সাধন জন্য মানব ও মানবী বিভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য আকার ধারণ করে; কিন্তু তাহাদিগের নিত্য জীবনের গঠন একই প্রকার। অর্থাৎ তাহাতে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ নাই। সেই ভেদবিহীন জীবনের দিকে যে তাহার নয়ন মন সদাস্থির রাখিবার অভ্যাস করে, সেই পারে সত্যের জ্যোতি বারম্বার করিতে দর্শন। তাহারই ভেদাভেদ-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়; ফলতঃ শারীরিক জীবনাপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যাহার মন প্রাণ যতই অধিকতর পরিচালিত হয়, সে ততই সত্যের আলোকে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থান করিতে পারিয়া, ইহ ও পর জীবনের জীবনদ্বয়ের পবিত্রতা ও মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। এ সংসারে সকলই নিত্য, প্রাণের নিত্য চক্ষু দিয়া দেখিবার অভ্যাস করা বড়ই প্রয়োজন।

২৮৫। যাহাতে অনাদি, অনন্ত, সত্য-স্বরূপের জ্যোতি প্রতিভাত নাই, যাহা অসত্য বলিয়া অভিহিত, তাহাই পাপ।

২৮৬। মানুষ এতই স্বার্থপরতাধীন যে, সে তাহার জীবনের উচ্চতম কর্ম্ম ধর্ম্ম-সাধন অথবা তৎ প্রচার কালেও তদীয় অধীন হইয়া চলে। সে তোমার নিকট

কর্ত্তব্য পালন জন্য উপস্থিত হয় না; কিন্তু এই দুই কার্য্যের মধ্যে একটীতেও কিছু মাত্র সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনায়াসে আগমন করিবে। যিনি ঈদৃশ স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম পথে পদচারণা করিতে পারগ হন; তাঁহারই জীবনে যথার্থ ঔদার্য্য, প্রেম ও পবিত্রতা দৃষ্ট হয়। যিনি যত কর্ত্তব্য জ্ঞানা ধীন, তিনি তত স্বার্থ বিহীন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার ভক্তি প্রেমাদি উচ্চতর বৃত্তি সকল বিশুদ্ধতা লাভ করে।

২৮৭। পুত্রেরা যখন তাহাদিগের মৃত পিতা মাতার সদ্গতির জন্য ও তাঁহাদিগের প্রতি আপনাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তেজিত রাখিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তখন তাহারা তাঁহাদিগের জীবিতাবস্থায় সদাচরণে রত থাকিয়া নানা পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবার ফল লাভ হয়। সুতরাং সেই শ্রাদ্ধই অধিকতর শ্রেয়স্কর। অতএব পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে পুত্রগণের ঐরূপে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করাই অধিকতর কর্ত্তব্য।

২৮৮। যাঁহারা ভৃত্যদিগকে শিষ্য সম না দেখেন, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের ব্যবহার বিশুদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন।

২৮৯। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান, কাল, গ্রন্থ, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। যাহা যখন যেথানে যাহাতে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

২৯০। উন্নতিশীল মানব প্রাণের অনন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অনাদি, অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ বিনা, সৃষ্ট, ক্রমোন্নতি ও আপেক্ষিক নিত্যতা প্রাপ্ত কোন দেব বাচ্য জীবের সাধ্য নাই। মানবের অভ্রান্ত ও অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, ও পবিত্রতা দাতা, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই হইতে পারেন না।

২৯১। ব্রহ্মাণ্ডপতি যখন মানবের আধ্যাত্মিক জীবন নিত্য করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা পবিত্র করিতে বাধ্য। কারণ পবিত্রতা বিনা নিত্যতা হইতে পারে না। তিনি কখন কোন ব্যক্তিকে স্থায়ী পবিত্রতা দান করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

২৯২। সদাচরণ করিয়া তাহার গৌরব না করাই যথার্থ গৌরব।

২৯৩। আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা, অভ্রান্ত জ্ঞান, অপার প্রেম, ও অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার অধীন করাই এক মাত্র ধর্ম্মানুমোদিত যথার্থ স্বার্থ সাধন।

২৯৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ। ব্রাহ্ম মাত্রেই এই ধর্ম্মসারগ্রাহী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ যেন এই মহৎ ব্রত পালনে যাবজ্জীবন প্রাণগত যত্ন করিতে সমর্থ হন।

২৯৫। যতই হয় উন্নত মানবের অনন্ত উন্নতিশীল নিত্য জীবন, ততই সে পায় শোভনতমের সুন্দরতর সুন্দরতম দরশন।

২৯৬। আত্মন, যতই তুমি করিবে তোমার নিত্য উন্নতির পর উন্নতি লাভ, ততই তব হইবে ভোগ পবিত্রতমের গাঢ়তর গাঢ়তর সহবাস।

২৯৭। হে মঙ্গলময়, আমার, এই প্রার্থনা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা, আর চিন্তা, বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে ও নির্ব্বিশেষে তব পবিত্রতম চরণাধীন কর।

২৯৮। ব্রহ্ম দর্শন বিনা মানব জ্ঞানের তৃপ্তি নাই। যতক্ষণ জ্ঞানময়ের জ্যোতি মানব জ্ঞানে প্রতিভাত না হয় ও সেই প্রকাশিত জ্যোতিতে সে তাঁহার জ্ঞানময় দর্শন না পায়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞানের তৃপ্তি সাধন হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানব জ্ঞানের তৃপ্তি।

২৯৯। বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অর্থাৎ রজনী যোগে সুস্থ শরীরে ও মনে প্রতিমাসে উপযুক্ত কালে এক বারের অনধিক সংসর্গ করিলে, জীবন দেবভাবাপন্ন হয়। আর পাশব বৃত্তির উত্তেজনায় অবৈধ রূপে ঐ কার্য্য করিলে, জীবন পশুবৎ হয়।

৩০০। যে শক্তির বলে অটল ভাবে ও প্রাণপণে ধারণ করে মনপ্রাণে সত্যস্বরূপের নিত্য সত্যদান, তাহার নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার জীবন উন্নত হয়। বিশ্বাস রূপ জীবন্ত ও জলন্ত শক্তি ধারণ করিলে আত্মা অপরাজিত হয়।

৩০১। ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যূন তিন বৎসর কাল ধর্ম্ম সাধন করিবার পর ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মধুময় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। নতুবা বিষ উদ্গীরণ হইতে পারে।

৩০২। ব্রহ্মোপাসক জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দয়া করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে তিনি পরব্রহ্মের ও আপনার অবমাননা করিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন। তিনি যতই অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা সহকারে দয়ার কার্য্য করিবেন, ততই তিনি তাঁহার যোগ্য আচরণে সমর্থ হইবেন।

৩০৩। যাঁহার অভাব নাই, সেই সুখী, যাঁহার যে পরিমাণে অভাব অল্প, তাহার সেই পরিমাণে সুখ অধিক।

৩০৪। সাধক যতদিন না মঙ্গলময়ের কৃপায় তাঁহার সাধনা করিতে করিতে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ সত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আপ্তকাম হয়, ততদিন সে তাহার সুনিয়মিত ও সুশাসিত জীবনের সকল প্রকার অভাব মোচন জন্য মঙ্গল দাতার নিকট প্রার্থনা করিতে বাধ্য।

৩০৫। পবিত্রস্বরূপের পবিত্রতর চরণ ছাড়া হইলে তুমি নিশ্চয়ই অপবিত্র হইবে। মুহূর্ত্ত কালের জন্যও তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাস ত্যাগ করিও না।

৩০৬। সাধন বিনা লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত না হইয়া বিফল হয়।

৩০৬। ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদ কালাবধি যেরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা গুপ্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ ও ব্যক্তিগত। যাহাতে ব্রহ্ম সন্তানগণ মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ও মুক্তভাবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও কোন একবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে পরব্রহ্মের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তাহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা যেন ব্রাহ্মগণ বিস্মৃত না হন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

মনু-সংহিতানুসারে অরজস্কা স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় কি না ?

কন্যা কাহাকে বলে ? যে স্ত্রীর বিবাহ হয় নাই, সে কন্যা।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্যথাবিধি॥

মনু ৯। ৮৮

উৎকৃষ্ট, অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে অপ্রাপ্তা হইলেও যথাবিধি উক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান করিবেক।

যে অর্থে বর কন্যা এই শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত ভাষায় সেই অর্থে বর কন্যা শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিবাহের সম্বন্ধের কথা উঠিলেই বর কন্যা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

"অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং"—বিবাহ যোগ্য বয়স না হইলেও বালিকাকে কন্যা শব্দে অভিহিত করা যায়।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু ৯। ৮৯

কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকুক, তথাপি তাহাকে কদাপি গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না। সুতরাং ঋতুমতী না হইলে তাহাকেও কন্যা বলা যাইতে পারে।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥

মনু ৯। ৯০

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে, (পিতা তাহাকে সৎ পাত্রে সম্প্রদান করেন কি না)। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে স্বয়ং সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

এই স্থলে যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই, তাহাকে কুমারী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥

মনু ৯। ৯১

অদীয়মানা স্ত্রী স্বয়ং ভর্ত্তা বরণ করিলে, তাহাকে কোন দোষ স্পর্শ করে না, অথবা যাহাকে সে বরণ করে, সেও কোন প্রকারে দোষী হয় না।

এই অদীয়মানা আগতার্ত্তবা স্বয়ংবরা স্ত্রী কন্যা কি কুমারী শব্দের বাচ্য, এই শ্লোক হইতে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু বক্ষ্যমান শ্লোকে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনা স্যাদ্যদি তং হরেৎ॥

মনু ৯। ৯২

স্বয়ংবরা "কন্যা" পিতৃদত্ত কি মাতৃদত্ত কি ভ্রাতৃদত্ত কোন অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। তাহা গ্রহণ করিলে চৌর্য্য দোষে দোষী হইবে।

এখানে স্বয়ংবরা স্ত্রীকে কন্যা বলা হইয়াছে। ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অতিক্রম না করিলে স্বয়ংবরা হইতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী অনূঢ়া স্ত্রীও কন্যা শব্দের বাচ্য।

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥

মনু ৯।১৭২।

পিতৃগৃহে গোপনে কন্যার যে পুত্র হয়, তাহাকে উক্ত কন্যা বিবাহকারী ব্যক্তির "কানীন পুত্র" বলা যায়। "কৌমার পুত্র" এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই।

ঋতুমতী না হইলে গর্ভসঞ্চার হইয়া পুত্র জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী দূষিতা অনূঢ়া স্ত্রীও 'কন্যা' শব্দে, এবং তদবস্থোৎপন্ন সন্তান 'কানীন' শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, অবিবাহিতা স্ত্রী অনাগতার্ত্তবা হউক বা আগতার্ত্তবা হউক, তাহাকে 'কন্যা' বলা যায়।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া বরং আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সমর্পণ করিবে না, মনুর এই বিধি। ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকিলে কন্যার পাপ পথে পতিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া মনু লিখিয়াছেন।

যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়াৎ নরঃ॥
মনু ৮। ৩৬৪

যে ব্যক্তি অকামা কন্যাকে দূষিত করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সকামা কন্যাকে দূষিতা করিবে, তাহার প্রাণ বধ হইবে না, অন্য কোন দণ্ড হইবে। সকামা কন্যার সম্বন্ধে মনু লিখিতেছেন।

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যোবধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি॥
মনু ৮। ৩৬৬

অধম ব্যক্তি যদি সকামা উত্তম বর্ণা কন্যা দূষিতা করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যদি সবর্ণা সকামা কন্যাকে দূষিত করে, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সম্ভোগকারীর নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারেন।

সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যো গুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয় বিশোঃ সাহস্রোবৈ ভবেদ্দমঃ॥
মনু ৮। ৩৮৩

ব্রাহ্মণ, গোপনে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা সকামা কন্যা গমন করিলে, অথবা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সকামা শূদ্রা কন্যা গমন করিলে তাহার সহস্র গুণ দণ্ড হইবে।

তবে মনু এই ব্যবস্থা করিলেন যে, অকামা কন্যা সম্ভোগে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা সম্ভোগে যদি কন্যা সবর্ণা হয়, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সেবমান ব্যক্তির নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারিবেন।

যদি কন্যা উত্তম বর্ণা হয়, তবে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা অধমবর্ণা হইলে, সেবমান পুরুষের অর্থ দণ্ড হইবে।

এখন সকামা কন্যার দণ্ডের কথা হইতেছে।

কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপিদাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানন্তু সংযতাং বাসয়েৎ গৃহে॥
মনু ৮। ৩৬৫

যে সকামা কন্যা উৎকৃষ্টবর্ণ পুরুষের সহিত ভোগ করিবে, তাহার কোন দণ্ড হইবে না। আর যে কন্যা নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ গমন করিবে, তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া শাসন করিতে হইবে।

কন্যা অর্থাৎ অনূঢ়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যত প্রকার দোষ হইতে পারে, অষ্টম অধ্যায়ে তাহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া মনু একাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

রেতঃ সেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

মনু ১১।৫৯

ভগিন্যাদি স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা স্ত্রী, সখাপত্নী ও পুত্রবধূতে রেতঃপাত করিলে গুরুপত্নী গমন সমান পাপ হয়। গুরুপত্নী গমনে পাপের অতি গুরু শাস্তি প্রাণ দণ্ড।

অনেকে বলেন, এস্থলে কুমারী অর্থ অনাগর্ত্তবা স্ত্রীলোক। বিবাহ হউক আর না হউক, যে পর্য্যন্ত রজোদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী বলা যায়। আর রজোদর্শন হউক আর না হউক, যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কন্যা বলা যায়।

সকামা ও অকামা কন্যা সম্ভোগ করিবার দণ্ড বিবৃত করিয়া শাস্ত্রকার কুমারী সম্ভোগ অপরাধকে পুত্রবধূসম্ভোগ, ভগিনী সম্ভোগ, ও দুহিতৃ সম্ভোগ তুল্য বিধি দিয়াছেন। কন্যা সম্ভোগ করিলে সকল স্থানেই প্রাণ দণ্ড হয় না। অকামা কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু সকাম কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয় না, লঘুতর দণ্ড হয়। পুত্রবধূ সম্ভোগ করিলে অথবা ভগিনী সম্ভোগ করিলে কিম্বা কুমারী সম্ভোগ করিলে, ভগিনী, পুত্রবধূ ও কুমারী সকামাই হউক আর অকামাই হউক, অপরাধ প্রাণার্হ দণ্ড। শুধু তাহা নয়।

যোহকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।

মনু ৮।৩৬৪

যে পুরুষ অকাম কন্যা সংগম করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু ভগিনী সঙ্গম ও কুমারী সঙ্গমের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আরো দণ্ড আছে।

গুরুতল্পভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপাদয়োময়ে।:
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুদ্ধ্যতি॥

মনু ১১।১০৪

স্বয়ংবা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈঋর্তীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥

মনু ১১।১০৫

গুরুপত্নী-গমন পাপ সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া লৌহময় তপ্ত শয্যায় শয়ন করিবে এবং জ্বলন্ত লৌহময়ী প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। অথবা স্বয়ং শিশ্ন ও মুষ্ক ছেদন করিয়া অঞ্জলিতে স্থাপন পূর্ব্বক মরণ পর্য্যন্ত অমন্দগতিতে নৈঋত দিকে গমন করিবে।

অকামা কন্যা সম্ভোগ অপেক্ষাও ভগিনী সম্ভোগ বা কুমারী সম্ভোগের গুরুতর দণ্ড।

অবস্থাভেদে সকাম কন্যার সম্ভোগের দণ্ডের তারতম্য আছে, কিন্তু ভগিনী সম্ভোগ ও কুমারী সম্ভোগের দণ্ড, সকাম ও অকাম উভয় স্থানেই সদৃশ।

এই সকল কারণ হইতে স্পষ্ট অনুমিতি হইতেছে যে, কুমারী ও কন্যা শব্দ মনু সংহিতার একার্থবাচক নহে। বিশেষতঃ মনু লিখিয়াছেন।

ত্রীণিবর্ষাণ্যু দীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তুকালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনু ৯।৯০

কুমারী ঋতুমতী হইলেও, তিনবৎসর কাল অপেক্ষা করিবে।

যে স্ত্রীলোকের রজোদর্শন হয় নাই, তাহাকে এস্থলে কুমারী বলা হইয়াছে। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—

মনু ৯।৩

স্ত্রীলোকদিগকে পিতা কৌমারে, ভর্ত্তা যৌবনে, এবং পুত্রেরা বার্দ্ধক্যে রক্ষা করিবেক। স্ত্রীলোকেরা কখনই স্বতন্ত্রা অর্থাৎ অরক্ষিতা হইয়া রহিবেক না।

এস্থলে স্পষ্টতঃ যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব-কালকে কৌমার অর্থাৎ কুমারী-অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, যুবতী হইলে ভর্ত্তার রক্ষণে থাকিবে। ইতঃপূর্ব্বে অর্থাৎ দুহিতার কৌমার বয়সে পিতা রক্ষা করিবেন। এস্থলে যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকাল যে কৌমার, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। এবং যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীর রক্ষণভার স্বামীর কার্য্য নয়, তাহাও জানিতে পারিতেছি। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।

মনু ৯। ৪

যথা সময়ে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতার দোষ স্পর্শ হয়; এবং যথাকালে স্ত্রী গমন না করিলে স্বামী দোষ গ্রস্ত হয়েন। কন্যা সম্প্রদান করিবার উৎযুক্ত কাল কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা এখন বিচার করিব না।

"বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন পতিঃ।"

যথাকালে স্ত্রীগমন না করিলে পতির অপরাধ হয়। যে বয়সে স্ত্রীগমন করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি অতি শোচনীয় চিররোগ জন্মিতে পারে, তৎ সময়ে স্ত্রী সহবাস করিলে কখনই "যথাকাল স্ত্রীগ-মন করা হইল" এমন বলা যায় না।

অকালে স্ত্রীগমন করিবে না, ইহা মনুর স্পষ্ট ব্যবস্থা। কৌমারে পিতা রক্ষা করিবেন, এবং যৌবনে ভর্ত্তা রক্ষা করিবেন। সুতরাং স্ত্রীর যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন করা মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

বালিকাবিবাহ করিলেই অরজস্কা সহবাস করিতে হইবে, গর্ভাধান প্রথার এমন উদ্দেশ্য নয়। মনুর মতে অবস্থাভেদে অপ্রাপ্তা কন্যারও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে; কোন কোন অবস্থায় বিবাহ সময় উপস্থিত হইলেও কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ যথাবিধি॥

মনু ৯। ৮৮

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যা ঋতুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু ৯। ৮৯

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

মনু ৯। ৯৪

উৎকৃষ্ট অভিরূপ সদৃশ বর পাইলে কন্যা অপ্রাপ্তা হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে। কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবে না। ত্রিংশদ্-বর্ষীয় পুরুষ হৃদ্যা দ্বাদশবার্ষিকী কন্যা বিবাহ করিবে, এবং চতুর্বিংশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবে। রজোদর্শনের প্রাক্কালই বিবাহ সময়। কিন্তু অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্তকালে, এবং উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে রজোদর্শনের পরও বিবাহ হইতে পারে, এমন কি রজোদর্শনের পর যদি কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করে, তবে বর কি কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যংসাধিগচ্ছতি।

মনু ৯। ৯১

মনুর মতে অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি আছে। কিন্তু "অপ্রাপ্তা" বরের কুত্রাপি বিবাহ বিধি দৃষ্ট হয় না। মনু লিখিয়াছেন, চতুর্বিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। ন্যূনকল্পে বরের চতুর্বিংশ বর্ষ এবং কন্যার বয়স অষ্টম বর্ষ বিবাহ বয়স, ইহাই মনুর বিধি। কিন্তু যৌবনের পূর্ব্বে স্ত্রীর স্বামি-সহবাস নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তি মনুর শাস্ত্র মান্য করেন না, তাঁহাদের জন্য আমি লিখিতেছি না। অঙ্গিরা, স্পেন্সার প্রভৃতি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ঋষির শ্রীচরণে যাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু যাঁহারা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে চরিত্র গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সুবিধার্থ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। এই সকল শাস্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কন্যার অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বে, এবং বরের চতুর্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত নয়। বালিকা বিবাহ মানব শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু বালক বিবাহ মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। অবস্থা বিশেষে গোবধও শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু বালকের বিবাহ যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। রজোদর্শনের প্রাক্‌কালই কন্যার শাস্ত্রবিহিত বিবাহকাল। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে পিতা পুত্রীর বিবাহবিষয়ে অমনোযোগী বলিয়া দোষার্হ হইবেন; কিন্তু এই দোষভয়ে কদাপি গুণহীন বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না। মনু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ কন্যার কৌমার বয়সে পতি স্ত্রী সহবাস করিবেন না। কিন্তু যথাকালে অর্থাৎ স্ত্রী যৌবনপ্রাপ্ত হইলে স্বামী স্ত্রী সহবাস না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইবেন। মনু অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি দিয়াছেন; কিন্তু তেমনি কুমারী স্ত্রী সহবাস করিলে ভগিনী সহবাস ও পুত্রবধূ সহবাস তুল্য গুরু অপরাধ হয়, তাহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগিনী বা পুত্রবধূ সকামা হইলে অপরাধের লঘুতা হয় না; কুমারী স্ত্রী সহবাসেও তাহার সম্মতি আছে বলিয়া, দণ্ডের লঘুতা হয় না।*

চণ্ডালী সহবাস, কুমারী সহবাস, ভগিনী সহবাস, পুত্রবধূ সহবাস, এবং সখা-পত্নী সহবাস এবং গুরুপত্নী সহবাস শাস্ত্রকারের মতে অতি জঘন্য পাপাবহ কার্য্য। পুরাকালে এতাদৃশ পাপলিপ্ত পাষণ্ডের প্রাণদণ্ড হইত। চণ্ডালী সহবাসে এখন কাহারও কোন বিশেষ দণ্ড হয় না। কুমারী সহবাস তো ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যেই গণ্য। সখাপত্নী সহবাস যে জঘন্য কার্য্য, সে বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাকী রহিলেন ভগিনী, পুত্রবধূ, ও গুরুপত্নী। অধোগতির স্রোত যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতেছে, তাঁহারাও আর ৫০ বৎসর পর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তবে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় লোকের চেষ্টায় অধোগতির স্রোতঃ ফিরিতে পারে। রজস্বলা হইলে স্ত্রীর গর্ভাধান † এবং

* আমি মনু-সংহিতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যে প্রকৃত ব্যাখ্যা, যদি কাহারও তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত পাঠ করুন্।

† স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নহে; দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। অন্নপ্রাশন হইলে কি শিশুকে মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিতে হয়? না গর্ভাধান হইলেই স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার প্রতি বিচার না করিয়াই স্ত্রী সঙ্গম করিতে হয়? শিশু যদি স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্নের উপর নির্ভর করে, তবে আমাশয়াদি হইয়া আশু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। গর্ভাধানের পরই আশু গর্ভবতী হইয়া অস্মদ্দেশে অনেক স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব,মৃতবৎসাত্ব প্রাপ্ত এবং প্রথম প্রসব চেষ্টায় মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইতেছে।

ভগিনী সহবাস ও অরজস্কা স্ত্রী সহবাস যে মানব ধর্ম্মানুসারে প্রাণ দণ্ডের যোগ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, রাজা বিদেশী, বিশেষতঃ অপর ধর্ম্মাবলম্বী; সুতরাং দণ্ডের ভার রাজার উপর সমর্পণ না করিয়া আমরা স্বয়ং সমবেত চেষ্টায় কুমারী স্ত্রী সেবমান ব্যক্তির শাসন বিধান করিব, অথবা অনৃতু-মতীর বিবাহ রহিত করিব*। ব্রাহ্মণ সমাজ হউক, আর কায়স্থ সমাজ হউক, বাঙ্গালা দেশে হউক আর উৎকলে হউক, যদি সমবেত চেষ্টায় এই জঘন্য পাপাচার রহিত করিতে পারেন, অতি উত্তম কথা। নতুবা রাজা এই অপরাধের দণ্ড বিধান করুন। পৃথিবীতে সৎলোক নিতান্তই অল্প; সকলেই দণ্ড ভয়ে কুপথ হইতে নিবৃত্ত থাকেন; দণ্ড ভয় আছে, তাই পৃথিবীস্থ লোকেরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছে।

সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ ভোগায় কল্পতে॥
মনু ৭।২২।

লোক সকল দণ্ড দ্বারা জিত হয়, স্বতঃ শুচি লোক একান্তই দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সমস্ত জগৎ ভোগ করিতে সমর্থ।

যদি ন প্রণয়েদ্ রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেম্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন দুর্ব্বলান বলবত্তরাঃ॥
মনু ৭।২০।

রাজা অতন্দ্রিত হইয়া যদি দণ্ড যোগ্য ব্যক্তিদিগকে দণ্ড নির্দেশ না করেন, তবে বলবত্তর লোকেরা শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে ভাজা পোড়া করে।

মহর্ষি মনু যেন ভবিষ্যৎ দর্শনবলে বঙ্গ-দেশের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিয়াই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনৃতুমতী সহবাসে অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকের নিতান্ত কষ্টদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মিতেছে, প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইতেছে। শিশু বালিকা শ্রেণীর দুর্দশার একশেষ হইতেছে; কোথায় বালিকারা মাতার স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুখে গৃহকার্য্য শিক্ষা করিবে, না কোথায় অকালে স্বামী সহবাস করিতে শ্বশুর গৃহে আনীত হইয়া কত প্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে। অনেকে ইহজীবন ভাররহ বোধ করিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। বস্তুতঃ সবল ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জঘন্য কাম রিপুর* বশবর্ত্তী হইয়া শূলে মৎস্য ভাজিবার ন্যায় দুর্ব্বলা অসহায়া অনৃতুমতী বালিকা স্ত্রী-

* আর্য্য বঙ্গ-সম্মিলনী সভা বলিতেছেন, বালিকার ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ বন্ধ হউক।

* কালিদাস বলিয়াছেন "কামার্ত্তাহি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেত না চেতনেষু," কামার্ত্ত ব্যক্তিদের চেতন ও অচেতন বস্তুতে বৈলক্ষণ্য বিচার নাই, তবে কি আর তাহারা রজস্কা ও অরজস্কা বিচার করিয়া চলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায়? এজন্য মনু বিধি করিয়াছেন "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।"

দিগকে ভাজা পোড়া করিতেছেন। দণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ড না হইলে কীদৃশ অনিষ্ট রাশি উৎপন্ন হইতে পারে, বিংশতি বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা তাহার উদাহরণ স্থল হইয়াছে।

ইংরেজেরা বণিক বেশে অর্থের লোভে এই দেশে আগমন করিয়া ঘটনাচক্রে রাজত্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। কিন্তু বণিকের অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় রাজার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। পাছে অর্থ লাভে ব্যাঘাত ঘটে, এই চিন্তাই প্রবল। অর্থ লাভের জন্য তো রাজত্ব, এই যেন ইংরেজের মূল নীতি। কিন্তু শাস্ত্রকার মনুর ব্যবস্থা অন্যরূপ। রাজা স্বদেশীয় হউন, আর বিদেশীয় হউন, দণ্ড্যব্যক্তিকে দণ্ড বিতরণ করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। রাজা, যে কারণেই হউক, এই রাজকার্য্যে শৈথিল্য করিলে প্রজার তো মহাদুঃখ উপস্থিত হয়ই, রাজার রাজত্ব অল্প অল্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলের রক্ষা কার্য্য অবহেলা করিয়া প্রবল রোম রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছে, মহাপরাক্রমশালী সূর্য্য চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইয়াছে, অজেয় মোগল রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে। হে ইংরাজ রাজ, হিন্দুরা কদাচারী ও কুপথগামী হইয়া অধঃপাতে যাইলে তোমাদের রাজত্ব নিষ্কণ্টক ও চিরস্থায়ী হইবে, মনে করিও না।

> দণ্ডোহি সুমহৎ তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
> ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥
>
> মনু ৭।২৮

রাজদণ্ড সুমহৎ তেজঃস্বরূপ; অকৃতাত্মা রাজার নিকট, ইহা দুর্দ্ধর্ষ। এই সুমহৎ তেজঃ ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত রাজাকে সবান্ধবে বিনাশ করে।

এই যে দুর্ব্বলা অসহায়া বালিকাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাহার গণনা করিতেছেন। ইংরেজরাজ শিশু বালিকাদিগকে রক্ষা না করিয়া সমগ্র ভারতের নারীজাতির ঘৃণার পাত্র হইতেছেন। ফল এই হইবে যে, নারীজাতির শ্রদ্ধা হারাইয়া ইংরাজ রাজত্ব লোপ পাইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির অভিসম্পাতে হিন্দুর রাজত্ব লুপ্ত হইয়াছে। নারীজাতির অভিসম্পাতে মোগল রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষে এই প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হয়, এই সকল শিশু বালিকার অশ্রুপাতে সেই অধঃপাত সংঘটিত হইবে। ১৮২৯ সালের রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে "কখনও ধর্ম্ম ও মনুষ্য হইতে বিচলিত হইব না" বলিয়া * যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যখন ইংরাজ রাজ সেই পথ পরিত্যাগ করিবেন, তখন

> 'ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্'
>
> মনু ৭।২৮

"রাজধর্ম্ম হইতে বিচলিত নৃপ সবান্ধবে বিনাশ পাইবেক" মনুর এই অভিসম্পাৎ ইংরাজ রাজকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিবে। কি জর্ম্মনি, কি অষ্ট্রীয়া কোন রাজ্যই তখন কোনও প্রকার সহায়তা করিতে পারিবে না। কোথায় বা থাকিবে শাস্ত্রের কুটার্থকারী অবজ্ঞা সেবমান ব্যক্তির চীৎকার, আর কোথায় বা থাকিবে ইংরেজের অর্থলাভ চিন্তা! দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সবল ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা এই ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছেন, সর্ব্ব শক্তিময় পরম কারুণিক

* See the preamble of Regulation XVII of 1829.

পরমেশ্বরের আজ্ঞার নিয়মানুসারে তিনি বা তদ্বংশীয়েরা ঘটনার চক্রে পড়িয়া সত্বর রাজত্ব হারাইয়াছেন। সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্ব যুগে ঈশ্বরের এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে। সমুদ্রবারির লবণত্বও ধ্বংশ হইবে না, আর এই ঐশিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

আর হিন্দু সমাজস্থ লোকদিগকে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাক্য স্মরণ করাইয়া সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, "অনাগতার্ত্তবা বালিকা-গমন সোদরাগমন বা গুরুপত্নী গমনের ন্যায় অতি গুরুতর পাপাবহ এবং ঘোরতর অধঃপাতের হেতু। ঐ ভীষণ পাপের প্রথা যে হিন্দুসমাজে গুরুতর বলিয়া বিশ্বাস নাই এবং সেই জন্য যে হিন্দুর সন্তান পরম্পরার ঘোরতর অধঃপাত ঘটিতেছে, আরও ঘটিবে, তাহাত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকি।"

সামান্য দুঃখে কি কবি বলিয়াছেন,—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দুদুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।
বারেক ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?"
"ধিক হিন্দুকুলে হয়ে আর্য্যবংশ
নরকণ্ঠ-হার নারী কর ধ্বংশ।
ভুলে সদাচার দয়া সদাশয়
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে।"

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উৎকল, প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে এই পাপাবহ প্রথা দণ্ডদ্বারা নিবারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, শুধু কি বাঙ্গালী জাতি এতৎ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট রহিয়া স্বজাতির গৌরব দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন করিবেন?

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

প্রাচীন মহারাষ্ট্র। (১)

"A people that can feel no pride in the past in its history and literature looses the mainstay of its national character When Germany was in the very depth of its political degradation; it turned to its ancient literature and drew hope for the future, by the study of its past Something of the same kind is now passing in India."

Professor Max Mullar.

বর্ত্তমান-সময়ে অনেকেই ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কাহাকেও এ অভাব মোচনে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। হয়ত অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, একজনই সমগ্র ভারতের একটী সু-বৃহৎ ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা এই সুবিশাল ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া সংগ্রহ করা এক জনের সাধ্যাতীত। কারণ ভারতের এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে এত বিভিন্ন, এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের জাতিগত এবং ভাষাগত পার্থক্য এত অধিক যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন

অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আশাতীত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইলেও ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তৎপরে সেই সেই প্রদেশের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা সন্দেহ। আমাদের বিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আলোচিত ও সংগৃহীত হইলেই অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্য হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারত ইতিহাস লেখকের পথও অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা ভারতের ইতিহাসের অংশ বিশেষের—মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছে; এবং এ বিষয়ে যে দুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে যে আমরা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহার বিশেষ, সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমাদিগের বঙ্গ দেশের কোন কৃতবিদ্য মহোদয় এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন অগত্যা আমাদিগকেই এই গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে কাপ্তান জেমস্ গ্রাণ্ট ডাফ্ (Captain James Grant Duff) সাহেব মহোদয় প্রণীত History of the Marathas নামক গ্রন্থ ব্যতীত সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পদবাচ্য আর কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। উক্ত মহাত্মা প্রভূত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ (বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা) ব্যয় করিয়া সর্ব্ব প্রথম মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বসতি করেন, এবং কোন্ সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাদিগের কর্তৃক অধিকৃত হয়, সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ ব্যতীত মরাঠাগণ (মহারাষ্ট্রীয় জাতি) কে? কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে কোন্ কোন্ রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন? এবং তাঁহাদের বংশীয়গণের মধ্যেই বা এখন কোন্ কোন্ বংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যাদি বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তদীয় গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। এমন কি, আধুনিক কালের সুবিখ্যাত "ভোঁস্‌লে" "পবার" (প্রমার) "মহাড়ীক," "শিরকে" (সালকে বা চালুক্য) প্রভৃতি পঞ্চকুলের, ছত্রিশ কুলের ও ছিয়া-নব্বই কুলের মরাঠাগণ কোন্ বংশোদ্ভূত? কোন্ দেশীয়? এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ কুল পূর্ব্বদিকের রাজবংশ হইতে আসিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছে, ইত্যাদি অনায়াস-লভ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহও উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে যে সমস্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাচীন মরাঠী (মহারাষ্ট্রী) ও সংস্কৃত

ভাষায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্যাদি রচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তৎসমূহের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তদীয় গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা একে অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার উপর আবার অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণ। কারণ যে সকল ঘটনাবলীর উপর তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, দুঃখের বিষয় তাহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে *। মরাঠা জাতির চির শত্রু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াও গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি প্রকৃত ঘটনা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধের অন্য স্থলে তাহার বিশদরূপে সমালোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল। কিন্তু তাহার গ্রন্থে এই সমস্ত ত্রুটী বা দোষ পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয়, কষ্ট স্বীকার ও অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "মহারাষ্ট্রগণের সম্বন্ধে চারিটি উদগার," "গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব প্রণীত, মরাঠা জাতির ইতিহাসের প্রতিবাদ" ও "অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণ বা মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস" প্রধানতঃ এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হইল। প্রথম গ্রন্থখানি বোম্বে সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় কর্ত্তৃক মরাঠী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে মরাঠাগণের ও মরাঠী ভাষার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ও অতি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ দেবাস রাজ্যের দেওয়ান রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রণীত। গ্রন্থকার যখন পুনা কলেজের 'জুনিয়ার ষ্টুডেণ্ট', ছিলেন তখন "পুনা ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন" নামক ছাত্রদিগের বিতণ্ডা সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই গ্রন্থ তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র।* পুণে † ডেক্কান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, এম, এ, মহোদয় শেষোক্ত গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বম্বে গেজেটিয়ার' অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ নামক এক সুবৃহৎ ইংরাজি গ্রন্থ বোম্বের গবর্ণমেণ্ট খণ্ড খণ্ড প্রকাশ করিতেছেন। উক্ত গেজেটিয়ারের "মহারাষ্ট্র দেশের ইতিবৃত্ত" নামক অংশের জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকর মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত গেজেটিয়ার ক্রয় করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, বিবেচনায় সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তিনি উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। মরাঠী ভাষায়, কি ইংরাজি ভাষাতেও মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশের

* "A Review of Captain James Grant Duff's History of the Marathas" by Raw Bahadar Nilkantha Janardan Kertani, Late Asst. Guardian and Tutor to H. H. The Nawab of Jawrah, &c. &c.

* গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "I was very young and raw when I penned them. * * * (Though) there is nothing really objectionable in it."

† ইহার বাঙ্গালা উচ্চারণ পুণা।

ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত কেহ লিখিতে পারেন নাই। কারণ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলস্ এবং উক্ত সোসাইটির কলিকাতা ও বোম্বে ব্রাঞ্চের (শাখার) জর্নেলস (ইতিবৃত্ত), ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়েরী ও অন্যান্য বহুবিধ ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে ও সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি গ্রন্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সত্য ও আবশ্যকীয় উপাদন সমূহ সংগ্রহ করা অতি কঠিন ব্যাপার। আবার উক্ত সংগৃহীত সত্য সকল একত্রিত করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করা ততোধিক কঠিন কার্য্য। ডাক্তার ভাণ্ডারকর অদম্য উৎসাহ ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা উহা সম্পন্ন করিয়া, মহারাষ্ট্রবাসীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইতিহাসপ্রিয় ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠকগণ দেখিবেন, এ গ্রন্থে এমন একটিও কথার উল্লেখ নাই, যাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকগণের ভাগ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইবেনা বলিয়া নারায়ণ বিষ্ণু রাপট মহোদয় সরল মরাঠী ভাষায় ইহার অবিকল অনুবাদ করিয়া মহারাষ্ট্র-বাসী জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন সম্বন্ধে আমরা রাপঠ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশেরও অতি প্রাচীন কালের ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রস্তরলিপি ও তাম্র শাসনাদির সাহায্যে এবং আধুনিক প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় ও যত্নে সকল প্রদেশেরই প্রাচীন ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশেও প্রস্তর লিপি, প্রাচীন মুদ্রা, দান-পত্র ও তাম্রশাসনাদি অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে প্রাচীন কালের অনেক ঐতিহাসিক সত্য কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্ব-প্রথম মহাত্মা বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকর মহোদয় প্রস্তরলিপি ও তাম্র-শাসনাদি পাঠ করতঃ তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেন। তৎপরে বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ রাও পণ্ডিত, কাশী নাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, ও ভগবান লাল পণ্ডিত প্রভৃতি মহোদয়গণ তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণের অধ্যবসায় ও যত্নেই আজ আমরা মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন কালের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি। এই সকল মনস্বী পুরুষগণের পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার ফল আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

উৎকল-ভ্রমণ।

পুরীর তীর্থের কথা।

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চক্রতীর্থ। গত বারে ভুল ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ী বলা হইয়াছে। জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ীর নাম গুণ্ডীচাবাড়ী। তারপর দিন প্রাতে গুণ্ডীচাবাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নরসিংহ-মন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় জগন্নাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডীচাদেবীর নামে গুণ্ডীচাবাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। গুণ্ডীচাবাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। ভোগ প্রস্তুতের গৃহগুলি ভিন্ন আর সমস্তই ইষ্টকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছবি বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাণ্ডা সমভিব্যাহারে যাত্রীগণ গুণ্ডীচাবাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক। অশ্লীল ছবিগুলি পাণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল; "এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন।" এইরূপ কথা শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না! তাহাদের পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে অবাক হইতে হয়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেই খানেই যাত্রীদিগকে "এই খানে কিছু ছড়াও" বলিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। পয়সা প্রদানের এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এতদ্ভিন্ন প্রধান পাণ্ডাদেরপ্রাপ্য—সে ত স্বতন্ত্র কথা। কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন। গুণ্ডীচাবাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। গুণ্ডীচাবাড়ী এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানকার বহুদের দেবীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কল্কি অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন দর্শনে গেলাম। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে এই পুকুরের নাম হইয়াছে। গুজরাটের যাত্রিকগণ জলে যখন মুরকির মোয়া ভাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক পাণ্ডা বিকট চিৎকার করিয়া নানারূপ সম্বোধনে কূর্ম্ম অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কূর্ম্মগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পাণ্ডা মন্ত্র পড়িতে লাগিল "মৎস্য কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর, জনার্দ্দন ইত্যাদি"। যাত্রিকগণ এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র।—একটী প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইষ্টক দ্বারা তীর বাঁধা। শুনা যায়, ইহার মধ্যে কুম্ভীর আছে। এই পুকুরের মধ্যেস্থলে একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী মেলা হয়, তাহাকে